বর্ধমান মহাবীর

গণেশ লালওয়ানী

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৬৭

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীযামিনীভূষণ উকিল
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
ইন্দ্র দুগার

ভূমিকা

জৈনদের চব্বিশজন তীর্থংকরের শেষ তীর্থংকর বর্ধমান মহাবীর খৃষ্টজন্মের ৫৯৯ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন।

যদিও মহাবীর ও ভগবান বুদ্ধ সমসাময়িক ছিলেন এবং যদিও জৈনধর্ম বাঙ্‌লার আদি ধর্ম তবুও তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন আজ পর্যন্ত বাঙ্‌লা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। ভগবান বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আমরা যতটা জানি ভগবান মহাবীর বা জৈনধর্ম সম্পর্কে তার শতাংশের একাংশও জানি না।

এর নানা কারণের মধ্যে একটি কারণ এও মনে হয় যে জৈনধর্মকে আমরা এতদিন পশ্চিম ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের ধর্ম বলেই মনে করে এসেছি কিন্তু তা নয়। জৈনধর্ম বাঙ্‌লার আদি ধর্ম। আর্য পরিধির সীমা অতিক্রম করে যে ধর্ম ঐতিহাসিককালে বাঙ্‌লায় প্রথম অনুপ্রবেশ লাভ করে সে ধর্ম জৈনধর্ম। ভগবান মহাবীর একাধিকবার বাঙ্‌লাদেশে এসেছিলেন ও নিজের ধর্মমত প্রচার করেছিলেন, যদিও গোড়ার দিকে এখানকার অধিবাসীরা তাঁকে বিরূপ সংবর্ধনা জানিয়েছিল তবু তিনি শেষপর্যন্ত তাদের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নামের সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত 'বর্ধমান', 'বীরভূম', মানভূম', 'সিংভূম'আদি স্থাননাম হতে। অনুমান করা শক্ত নয় যে এক সময়ে এই অঞ্চলে ঘন জৈন বসতি ছিল। এর সমর্থন কেবলমাত্র হিউয়েন সাঙ্‌ প্রমুখ চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বিবরণ বা প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন থেকেই পাওয়া যায় তা নয়, এখনো এখানে সেই প্রাচীন জৈন জাতির বংশধরেরা বাস করেন যাঁদের সরাক বলে অভিহিত করা হয়। সরাক জৈন 'শ্রাবক' (গৃহী উপাসক) শব্দের অপভ্রংশ।

কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলেই নয়, জৈনধর্ম ক্রমশঃ উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গেও ছড়িয়ে পড়ে। ভদ্রবাহু রচিত 'কল্পসূত্রে' জৈন সম্প্রদায়ের যে বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে চারটি শাখা ছিল বাঙ্‌লাদেশের চারটি জনপদের সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত। যথা: তাম্রলিপ্তিয়া, কোটিবর্ষিয়া, পুণ্ড্রবর্ধনিয়া ও দাসী খর্বটিয়া। তাম্রলিপ্ত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক শহর, প্রাচীন কোটিবর্ষ দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধন বগুড়ার নিকটস্থ মহাস্থানগড়। খর্বট বা কর্বট তাম্রলিপ্তের নিকটস্থ একটি শহর। ভদ্রবাহু সম্পর্কে বলা হয় তিনি বাঙালী ছিলেন। জন্মস্থান কোটিবর্ষ। ভদ্রবাহু স্বামীর জৈন সম্প্রদায়ে বিশেষ মান্যতা রয়েছে কারণ তিনি ছিলেন চতুর্দশ পূর্বধর অন্তিম শ্রুত-কেবলী।

তাই বাঙ্‌লা ভাষায় বর্ধমান মহাবীরের জীবন কথা লেখবার ইচ্ছা বহুদিন থেকেই ছিল। কাজও আরম্ভ করি। সে আজ ষোল বছর আগের কথা। তখন কেবলমাত্র পূর্বাশ্রম ও সাধকজীবন লেখা হয়, তীর্থংকর জীবন নয়। সেই অপূর্ণ লেখা 'ভারতের সাধকে'র লেখক শ্রীশঙ্করনাথ রায় তাঁর 'হিমাদ্রি' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। তারপর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আমার লিখিত জৈন কথানক সংগ্রহ 'অতিমুক্ত' প্রকাশিত হয়। সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পড়ে প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও সদাস্নেহশীল শ্রদ্ধেয় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অযাচিতভাবে আমায় এক পত্র দেন। তাতে লেখেন—"আপনার এই ক্ষুদ্র কিন্তু অতিসুন্দরভাবে প্রাঞ্জল বাংলায় লিখিত 'অতিমুক্ত' বইখানি বোধহয় রসোত্তীর্ণ জৈন উপাখ্যান সাহিত্যকে বিদগ্ধ-জন-সমাজে পরিচিত করিয়া দিবার প্রথম প্রয়াস। এইরূপ আরও—অন্ততঃ আবও কতকগুলি বই আপনার কাছ থেকে আমরা চাই। আপনি প্রথমেই এইরূপ উপাখ্যানধর্মী একখানি 'মহাবীর চরিত' আমাদের দান করুন।"···সুনীতিবাবুর এই উৎসাহবাণী আমায় অসমাপ্ত লেখাটি পূর্ণ করবার প্রেরণা দেয়; কিন্তু তীর্থংকর জীবন লেখা হয় তারও দু'বছর পর 'শ্রমণ' পত্রিকার তাগিদে। শ্রমণে ১৯১৯ এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বইটি প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ থেকে ৮০ নিশ্চয়ই খুব দীর্ঘ সময় নয় কিন্তু তার মধ্যে একে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা সম্ভব হয় নি। হয় ত আজও সম্ভব হত না যদি না বন্ধুবর শ্রীতুলসী দাস এর প্রকাশের জন্য আগ্রহী হয়ে করুণা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতেন এবং যদি না বামাচরণবাবু সাগ্রহে এর প্রকাশের ভার গ্রহণ করতেন। তাই এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমি তাঁদের উভয়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী।

আশা করি এই গ্রন্থ বর্ধমান মহাবীরের জীবন ও জৈনধর্ম সম্বন্ধে বাঙালী পাঠককে আগ্রহী করবে।

গণেশ লালওয়ানী

পূর্বাশ্রম

সেকালে সে সময়ে ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুর বলে এক জনপদ ছিল। সেই জনপদের নায়কের নাম ছিল সিদ্ধার্থ।

সিদ্ধার্থ ছিলেন কাশ্যপগোত্রীয় জ্ঞাত-ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরে বিশেষ করে এই জ্ঞাত ক্ষত্রিয়দেরই বাস। সেজন্য নিজের অধিকারে সিদ্ধার্থ ছিলেন সর্বাধিকারী। তাঁর এই সর্বাধিকারত্বের জন্য সকলে তাঁকে রাজা বলে ডাকে।

সিদ্ধার্থের রাণীর নাম ছিল ত্রিশলা। ত্রিশলা ছিলেন বৈশালীর রাজাধিরাজ শ্রীমন্ মহারাজ চেটকের বোন, বাশিষ্ঠগোত্রীয়া ক্ষত্রিয়াণী।

তখন বৈশালী ছিল বিদেহের রাজধানী। মর্ত্যের অমরাবতী। হৈহয় বংশীয় জৈন রাজাদের শাসনে তার সমৃদ্ধির শেষ ছিল না।

আর সিদ্ধার্থ? তিনিও ছিলেন শ্রীপার্শ্বনাথ শ্রমণ পরম্পরার একজন শ্রমণোপাসক জৈন।

এই ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরের পূবদিকে ছিল ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুর। ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুরের নায়ক ছিলেন কোডালগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ঋষভদত্ত। ঋষভদত্তের স্ত্রীর নাম ছিল দেবানন্দা।

দেবানন্দা ছিলেন জালন্ধরগোত্রীয়া ব্রাহ্মণী।

এঁরাও ছিলেন শ্রীপার্শ্বনাথ শাসনানুযায়ী শ্রমণোপাসক।

•

সেদিন আষাঢ় শুক্লা ষষ্ঠী। মধ্যরাতে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছেন দেবানন্দা। দেখছেন: হস্তী, বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, সূর্য, ধ্বজ, কলস, সরোবর, সমুদ্র, দেববিমান, রত্ন ও নির্ধূম অগ্নি। একটার পর একটা। স্বপ্ন নয়, যেন প্রত্যক্ষ দেখছেন।

স্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলেন দেবানন্দা। ঘরের ভিতর তখন অন্ধকার। বাইরে আলোর ছায়ায় জড়িত বনবীথি। কোথাও কিছু নেই, কিন্তু এতক্ষণ কি দেখলেন তিনি? দেখলেন একটা দিব্য

আলো যেন প্রবেশ করল তাঁর কুক্ষীতে। সে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল সব কিছু—সে আলো এমনি উজ্জ্বল। ঠিক যেন মধ্যাহ্ন সূর্য অথচ দাহহীন।

স্বামীকে তুলে সব কথা খুলে বললেন দেবানন্দা। বললেন, ধারাপাতে নীপের বনে যেমন শিহরণ জাগে, সেই শিহরণ আমার সর্বাঙ্গে। সেই এক আনন্দের পরিপ্লাবন।

শুনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন ঋষভদত্ত। তারপর দেবানন্দার আনন্দিত মুখের দিকে চেয়ে বললেন, দেবানন্দা তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ, সে স্বপ্ন ভাগ্যবতী রমণীরাই দেখে থাকে। এতে আমাদের বেদ-বেদাঙ্গ-পারঙ্গত পুত্র হবে বলেই আমার মনে হয়। শুধু তাই নয়, আজ হতে আমাদের সর্ববিধ উন্নতি।

অঞ্জলিবদ্ধ হাত কপালে ঠেকিয়ে দেবানন্দা মনে মনে প্রণাম করলেন ভগবান পার্শ্বকে। তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, দেবানুপ্রিয়, তোমার কথাই যেন সত্য হয়।

দেবানন্দার স্বপ্ন দেখবার পর ছয় পক্ষকালও অতীত হয়নি।

রাত তখন নিশুতি। শুয়ে শুয়ে আবার স্বপ্ন দেখছেন দেবানন্দা। এবারে হস্তী, বৃষ নয়। দেখছেন, যে আলো তাঁর কুক্ষীতে প্রবেশ করেছিল, সেই আলো বেরিয়ে এসে ঘূর্ণি হাওয়ার মত পাক খেতে লাগল। তারপর তীরের বেগে ছুটে গেল ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুর জনপদের দিকে। দেবানন্দা আরো দেখলেন, সে আলো ঘুরতে ঘুরতে ছেয়ে ফেলল ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলাকে।

ত্রিশলা চুরি করে নিয়ে গেল আমার স্বপ্ন—বলে স্বপ্নের মধ্যেই চীৎকার দিয়ে উঠলেন দেবানন্দা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে গেল ঋষভদত্তেরও। কি হল—বলে সাড়া দিয়ে তিনি উঠে বসলেন।

কি বিশ্রী স্বপ্ন—বলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন দেবানন্দা।

প্রদীপের আলোয় দেবানন্দার মুখখানা তুলে ধরলেন ঋষভদত্ত।

দেখলেন দেবানন্দার মুখে সেদিন হতে যে দিব্যকান্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেই কান্তি আজ সহসাই যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। এ দেবানন্দা সেই দেবানন্দা নয়, পূর্বের দেবানন্দা।

ঋষভদত্তের বুক থেকে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস উঠে এসেছিল। কিন্তু দেবানন্দার মুখের দিকে চেয়ে সেই দীর্ঘনিশ্বাস তিনি নিজের মধ্যেই চেপে গেলেন। তারপর.নিজের হাতে কাপড়ের খুঁট দিয়ে দেবানন্দার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, দেবানন্দা, এমন আমাদের কি ভাগ্য যে সর্বজ্ঞ আমাদের ঘরে আসবেন। তবু তিনি যে আসছেন আমাদের সময়ে আমাদের এই পৃথিবীতে সেজন্য আনন্দ কর। তিনি যে অমৃত দেবেন জনে জনে সে অমৃত হতে আমরাও বঞ্চিত হব না।

তারপর অনেককাল পরের কথা। জ্ঞাতপুত্র সেদিন এসেছেন ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুরে। সর্বজ্ঞ হবার পর সেই তাঁর প্রথম সেখানে আসা। তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর কথা শুনবার জন্য দলে দলে মানুষ এসেছে। বর্ধমানকে দেখা মাত্র দেবানন্দার বুকের কাপড় স্তনদুগ্ধে ভিজে উঠেছে। চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু উদ্গত হয়ে কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে। দেবানন্দার সেই স্থিতি, সেই ভাবান্তর চোখে পড়েছে আর্য ইন্দ্রভূতি গৌতমের। সে নিয়ে তাই তিনি প্রশ্ন করলেন, ভদন্ত, আর্যা দেবানন্দার এই ভাবান্তরের কারণ কি?

সেই প্রশ্ন শুনে দেবানন্দার দিকে সুস্মিত দৃষ্টি প্রসারিত করে বললেন বর্ধমান, দেবানন্দা আমার মা। দেবানন্দার গর্ভেই আমি প্রথম এসেছিলাম। তারপর—

তারপর সেই যেদিন প্রণত নামক স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে সে দেবানন্দার গর্ভে প্রথম প্রবেশ করল, যেদিন আকাশে মাটিতে সর্বত্র একটা আনন্দের কলরোল ছড়িয়ে পড়ল সেদিন সৌধর্ম দেবলোকেও ইন্দ্রের আসন একটুখানি নড়ে উঠল। তার কারণ অনুসন্ধান করতে

গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন পৃথিবীতে তীর্থংকরের অবতরণ হয়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! কোনো ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে না হয়ে, ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভে। কিন্তু ক্ষত্রিয় গৃহের রাজ্যশ্রী, সম্পদ ও বিপুল বৈভব ছাড়া ত কখনো তীর্থংকরের জন্ম হয় না। তবে বর্ধমানের বেলায় কেন তার ব্যতিক্রম হল?

সেকথা ভাবতে গিয়ে ইন্দ্রের চোখের সামনে বর্ধমানের এক পূর্ব জন্মের ঘটনা ফুটে উঠল। সে জন্মে সে প্রথম চক্রবর্তী ভরতের পুত্র ও প্রথম তীর্থংকর ভগবান ঋষভদেবের পৌত্ররূপে ইক্ষ্বাকুকুলে জন্ম গ্রহণ করেছিল। সে জন্মে তার নাম ছিল মরীচি।

মরীচি তখন শ্রমণ ধর্ম পালনে অসমর্থ হয়ে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেসব দিনের একটি দিন। ভরত একদিন তাকে এসে প্রণাম করলেন। বললেন, মরীচি, আমি তোমার এই পরিব্রাজকত্বকে প্রণাম করছি না, প্রণাম করছি অন্তিম তীর্থংকরকে। কারণ, ভগবান এই মাত্র তোমার সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে তুমি এই ভরত ক্ষেত্রে ত্রিপৃষ্ঠ নামে প্রথম বাসুদেব, মহাবিদেহে প্রিয়মিত্র নামে চক্রবর্তী ও পরিশেষে এই ভারতবর্ষে বর্ধমান-মহাবীর নামে এই অবসর্পিণীর শেষ তীর্থংকর হবে।

সেকথা শুনে মরীচি আনন্দে নৃত্য করে উঠল। বলল, আমি বাসুদেব হব। চক্রবর্তী হব। তীর্থংকর হব। আর আমার কী চাই! বাসুদেবে আমি প্রথম, চক্রবর্তীতে আমার পিতা, তীর্থংকরে আমার পিতামহ। উত্তম আমার কুল।

মরীচির সেই কুলগর্বের জন্যই বর্ধমান আজ হীনকুলে জন্ম গ্রহণ করতে চলেছে।

কিন্তু তাই বা কেন? যখন তীর্থংকর ক্ষত্রিয়কুল ছাড়া অন্যকুলে জন্মগ্রহণ করেনি তখন বর্ধমানও করবে না।

ইন্দ্র তখন ডাক দিলেন তাঁর অনুচর হরিনৈগমেষীকে। বললেন, তীর্থংকরের গর্ভ দেবানন্দার কুক্ষী হতে অপসারিত করে ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলার গর্ভে রেখে এসো ও ত্রিশলার গর্ভ দেবানন্দার কুক্ষীতে।

হরিণৈগমেষী ইন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য করে দেবানন্দার গর্ভ ত্রিশলার কুক্ষীতে রেখে এল ও ত্রিশলার গর্ভ দেবানন্দার কুক্ষীতে।

তাই যখন দেবানন্দা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন, তখন স্বপ্ন দেখছিলেন রাণী ত্রিশলাও। সেই স্বপ্ন যা দেবানন্দা প্রথম দেখেছিলেন। হস্তী, বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, সূর্য, ধ্বজ, কলস, সরোবর, সমুদ্র, দেববিমান, রত্ন ও নির্ধূম অগ্নি।

আশ্বিনের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর রাত। তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে নিকষ কালো অন্ধকারে। বাতাসে পাতার মর্মর। এছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। কিন্তু সেই স্বপ্ন দেখে সহসাই ঘুম ভেঙে গেল ত্রিশলারও। কি অদ্ভুত স্বপ্ন! তারপর তিনি যেমন ছিলেন তেমনি চলে এলেন রাজা সিদ্ধার্থের কাছে।

শুনছ, ওগো, শোন—

ত্রিশলার ডাকে সাড়া দিয়ে শয্যার ওপর উঠে বসলেন সিদ্ধার্থ। চোখে তখনো তাঁর ঘুমের জড়তা। বললেন, কি হয়েছে ত্রিশলা? এমন অসময়ে, এভাবে?

প্রথমেই তাঁকে আশ্বস্ত করে নিয়ে পাশে বসে একটি একটি করে স্বপ্নের কথা খুলে বললেন ত্রিশলা। বললেন, কি আশ্চর্য স্বপ্ন! এমন স্বপ্ন কেউ কী কখনো দেখেছে?

নিশ্চয়ই দেখেছে। তীর্থংকর ও চক্রবর্তীর মা'রাই দেখে থাকেন। ঋষভদেবের মা দেখেছেন, ভরতের মা। কিন্তু সিদ্ধার্থের অতশত জানা নেই। তবু তাঁর মনে হল স্বপ্নগুলো শুভ। শুভ, তা নইলে কী কেউ কখনো দেববিমান দেখে না রত্ন, না ধূমহীন অগ্নিশিখা! তাই ত্রিশলার উদ্ভাসিত মুখের দিকে চেয়ে বললেন সিদ্ধার্থ, আমার কি মনে হয় জানো ত্রিশলা, এই স্বপ্ন দর্শনের ফল আমাদের অর্থ লাভ, ভোগ লাভ, পুত্র লাভ, সুখ লাভ, রাজ্য লাভ। তোমার গর্ভে কুলদীপ পুত্র এসেছে।

সেকথা শুনে লজ্জায় ঈষৎ আনত করলেন ত্রিশলা মুখখানা।

তবুও, বললেন সিদ্ধার্থ, কাল সকালে নৈমিত্তিকদের ডেকে পাঠাব। তাদের মুখেই শোনা যাবে বিশদভাবে স্বপ্ন ফল। কি বল?

আমিও তাই বলি—বললেন ত্রিশলা।

ত্রিশলা কিন্তু তখন তখনি উঠে গেলেন না। সেইখানে বসে রইলেন সোনার দাঁড়ে যেখানে সুগন্ধি বর্তিকা জ্বলছিল তার দিকে চেয়ে। ঘরে তারই মৃদু গন্ধ।

এমনিভাবে কতক্ষণ কেটে যেত কে জানে। কিন্তু সহসা সিদ্ধার্থ ত্রিশলার পিঠে হাত রেখে বললেন, তুমি না হয় আজ এখানেই শোও, রাত আর বেশী নেই। তোমার ঘরে নাই বা ফিরে গেলে।

সিদ্ধার্থ ভাবছিলেন, ত্রিশলা হয়ত স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছেন, তাই নিজের ঘরে ফিরে যেতে চান না।

না, তা নয় বলে একটুখানি সরে বসলেন ত্রিশলা। বললেন, একটা অপূর্ব অনুভূতির মত মনে হচ্ছে আমার, মনে হচ্ছে আমি যেন মধ্যাহ্ন সূর্যকে গর্ভে ধরেছি। আমার সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে তারই জ্যোতি চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মধ্যাহ্ন সূর্যের অথচ দাহ নেই। চাঁদের মত শীতল, যেন চন্দন রসে ভেজানো।

সিদ্ধার্থ কিছু বুঝতে পারলেন না। তাই বিস্মিতের মত ত্রিশলার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বললেন, আশ্চর্য!

ত্রিশলা তারপর নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্তু সে রাত্রে তিনি আর ঘুমুলেন না। স্বপ্ন রক্ষার জন্য জাগরিকা দিয়ে উষার আলোর প্রতীক্ষা করে সমস্ত রাত পালঙ্কে বসে কাটিয়ে দিলেন।

তারপর ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে পূবের আকাশ যখন ফরসা হয়ে এল ত্রিশলা তখন উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আস্থান-মণ্ডপে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে গেলেন।

ওদিকে ততক্ষণ যামঘোষী দুন্দুভীর শব্দে সিদ্ধার্থেরও ঘুম ভেঙে গেছে। তিনিও শয্যা ত্যাগ করে নৈমিত্তিকদের ডাকবার আদেশ দিয়ে ব্যায়ামশালে প্রবেশ করেছেন। আজ একটু সকাল সকালই

স্নান করে নিতে হবে। স্বপ্নফল জানবার আগ্রহ তাঁকেও ত্বরান্বিত করেছে।

তারপর দিনের প্রথম যাম উত্তীর্ণ হবার আগেই আস্থান মণ্ডপে সভা বসল। সিদ্ধার্থ স্নানান্তে আমোদি মালতী কুসুমের মালা গলায় ঝুলিয়ে পরিজন পরিবৃত হয়ে সিংহাসনে এসে বসলেন। তাঁকে ঘিরে বসল তন্ত্রপালক, তলবর ও মাণ্ডবিকেরা। ভদ্রাসনে যবনিকার অন্তরালে বসলেন ত্রিশলা সপরিকরে। রাজার ঠিক সামনে ঈষৎ উঁচু বেদীর ওপর নৈমিত্তিকদের আসন। তাঁরাও রাজার দ্বারা সম্মানিত হয়ে আসন গ্রহণ করেছেন। স্বপ্নের ফল জানবার আগ্রহ এখন ত্রিশলা ও সিদ্ধার্থেরই নয়, সকলের। সকলের দৃষ্টি তাই নৈমিত্তিকদের ওপর।

নৈমিত্তিকেরা ততক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কূট সেই বিচার। শাস্ত্রে যে বাহাত্তর রকম স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে তার লক্ষণ ও ফলাফল বিচার। বাহাত্তর রকম স্বপ্নের মধ্যে বিয়াল্লিশটি সামান্য ফলদায়ী। বাকী তিরিশটি উত্তম ফলদায়ী। এরকম স্বপ্ন ভাগ্যবতী রমণীরাই দেখে থাকেন। জাতক গর্ভে এলে ভাবী তীর্থংকর বা চক্রবর্তীর মা দেখে থাকেন চৌদ্দটি, বাসুদেবের মা সাতটি, বলদেবের মা চারটি, মাণ্ডলিক• দেশাধিপতির মা একটি। মহারাণী যখন চৌদ্দটি স্বপ্ন দেখেছেন তখন অচিরেই যে তিনি সর্বজ্ঞ তীর্থংকর বা চক্রবর্তী রাজার জন্ম দেবেন তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু হস্তী দর্শনের কি ফল?

জাতক পরচক্র দমন করবে, নয়ত ষড়রিপু।

বৃষ?

বৃষের মত সংসার ভার বহন করবে, নয়ত সংযম ভার।

সিংহ?

পরম শত্রুও তাকে দেখে ভীত হবে, ভাব বৈরী নির্জিত হবে।

লক্ষ্মী?

জাতক লক্ষ্মীবান হবে।

পুষ্পমালা ?

জাতকের যশঃসৌরভ বহুদূর বিস্তৃত হবে।

চন্দ্র ?

জাতক সকলের সন্তাপ হরণ করবে, বিশ্বকে আনন্দিত করবে।

সূর্য ?

জাতক মহা তেজস্বী হবে।

ধ্বজ ?

বংশ জাতকের দ্বারা কীর্তিমান হবে।

কলস ?

জাতক পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করবে।

সরোবর ?

সুরাসুর নর সকলের সেব্য হবে, জাতকের ভাবধারায় সকলে অবগাহন করবে।

সমুদ্র ?

সমুদ্রের মত জাতক রত্নাকর হবে, গম্ভীর হবে।

দেববিমান ?

জাতক বৈমানিক দেবতাদের দ্বারাও পূজিত হবে।

রত্ন ?

জাতক প্রভূত রত্নের অধিকারী হবে, বা জ্ঞান রত্নের।

নির্ধূম অগ্নি ?

দীপশিখার মত দীপ্যমান হবে, অন্তর মালিন্যকে দগ্ধ করবে।

কিন্তু জাতক রাজচক্রবর্তী হবে, না ধর্মচক্রবর্তী ? সে সম্পর্কে এখুনি নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে এতে করে আর রাজ্যের সর্বাঙ্গীন শ্রী, সম্পদ ও সমৃদ্ধি সূচিত হচ্ছে।

এতক্ষণ একটা অধীর আগ্রহ নিয়ে রাজসভা নিস্তব্ধ হয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নদর্শনের ফলাফল শুনবার পর চারদিকে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সে কলরব ক্রমে এত তীব্র হয়ে উঠল যে

কঞ্চুকিরা বেত্রাস্ফালন করেও তা শান্ত করতে পারল না। সিদ্ধার্থ তাদের দুরবস্থা দেখে হাসতে হাসতে তাদের নিবৃত্ত করে প্রচুর দান-দক্ষিণা দিয়ে নৈমিত্তিকদের বিদায় দিলেন। তারপর সেদিনের মত সভা বিসর্জিত হল।

সভা বিসর্জনের পর সিদ্ধার্থ ত্রিশলার কক্ষে এলেন। ত্রিশলা তখন সেখানে মর্মর পীঠিকার ওপর বসে তাঁরই প্রতীক্ষা করছিলেন। সিদ্ধার্থকে আসতে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ঘরে নিয়ে এলেন। তারপর রাজ-আভরণ খুলতে খুলতে বললেন, আর্যপুত্র, আজ আমার কী আনন্দ।

সিদ্ধার্থ ত্রিশলার আনন্দিত মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর তাঁকে দু'হাতে নিজের বুকের কাছে টেনে নিলেন। বললেন, ত্রিশলা, তোমাকে পেয়ে এতদিনে আমিও ধন্য হলাম।

সেকথা শুনে ত্রিশলার মুখে একটা সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। ত্রিশলা কোনো কথা না বলে স্বামীর বুকে মুখ রাখলেন।

ত্রিশলা এমনিতেই রূপসী। কিন্তু এত রূপ বোধ হয় তাঁর কোনো কালেই ছিল না। কারণ এ ত পার্থিব রূপ নয়, অপার্থিব। ঠিক সূর্যোদয়ের আগের আরক্তিম আকাশের রূপ।

সেই রূপ অহরহ দেখেও তৃপ্তি হয় না। হয় না তাই সিদ্ধার্থ চেয়ে থাকেন ত্রিশলার মুখের দিকে। যতই দেখেন ততই দেখবার বাসনা জাগে। সিদ্ধার্থ মনে মনে ভাবেন জাতকের আসবার সম্ভাবনাতেই কি ওর দেহে বিশ্বের লাবণ্যবারিধি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

বোধ হয় সখীরাও সেই কথাই ভাবে। ভাবে বলেই তাদের কত সাবধান বাণী, কত অযাচিত উপদেশ : সখি, মন্দ মন্দ হাঁটবি। ধীরে ধীরে কথা বলবি। কোপ কখনো করবি না। মাটিতে কখনো শুবি না।

ত্রিশলা তাদের কথা মেনে চলেন। তাদের উৎকণ্ঠায় আনন্দিত হন।

কিন্তু এত সাবধান-সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন অঘটন ঘটল।

ত্রিশলা সেদিন শুয়েছিলেন ইন্দুকান্ত-মণি পালঙ্কের ওপর অর্ধশয়ান। গর্ভের সঞ্চালনজাত যন্ত্রণায় তিনি ছিলেন একটু অস্থির। পাশে দাঁড়িয়ে বীজন করছিল চামরগ্রাহিণী। হঠাৎ তাঁর মনে হল গর্ভের সঞ্চালন যেন বন্ধ হয়ে গেছে। তবে কি—তাঁর গর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে? ত্রিশলা সে কথা মনে করতেই তাঁর মনে হল তাঁর পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেছে। তিনি দুঃখার্তা হয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, হায় আমার কী সর্বনাশ হল?

কি আর সর্বনাশ হবে? সখীরা ভাবল দেবী কোনো অমঙ্গল আশঙ্কায় দুঃখার্তা হয়েছেন, নয়ত যন্ত্রণায় অস্থির। তাই তারা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে উঠল, স্বামিনি, অমঙ্গল চিন্তা শান্ত কর। গর্ভের কুশলতার কথা মনে করে নিজের কষ্টের কথা ভুলে যাও।

গর্ভের যদি কুশল তবে আর আমার দুঃখ কী? বলে মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন ত্রিশলা।

তখন চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। সখীরা কেউ বা বাটিতে করে চন্দনপঙ্ক নিয়ে এল, কেউ বা ভৃঙ্গারে করে সুরভী শীতল জল। কেউ বা জলের ছিটা দিয়ে ত্রিশলার মুখ মুছিয়ে দিল কেউ বা শিথিল করে ধুইয়ে দিল তাঁর ঘন কালো চুল।

ত্রিশলার মূর্ছা ভঙ্গ হল।

ত্রিশলা যেখানে শুয়েছিলেন সেখানে মাথার ওপর মন্দাকিনীর শুভ্র ফেনার মত দুকূল-বিতান। সেই বিতানের দিকে অর্থহারা দৃষ্টি মেলে নিজের মনের মধ্যেই যেন বলে উঠলেন ত্রিশলা—দৈবকর্তৃক সর্বস্বাপহরণে আমি দুঃখিতা। জীবনে আর আমার কাজ কী?

বলতে বলতে ত্রিশলা আবার মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। গর্ভের অকুশল সংবাদ ততক্ষণে সবখানে প্রচারিত হয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে

নগরীতে উৎসব ও নাটকাদি। মন্ত্রী ও অমাত্যরা হয়ে পড়েছেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দৈবের কী প্রতিকার করবেন তাঁরা। পায়ের চলবার শক্তি নেই তবু এসেছেন ভবনদ্বারে। পুরবাসীরাও সেখানে সমবেত হয়েছে বিশদ জানবার জন্য। যে পুরী একটু আগেই আনন্দোচ্ছল ছিল সেই পুরী শোকের মতই এখন ম্রিয়মাণ, শ্রীহীন, শূন্য।

গর্ভের সঞ্চালনে মায়ের অস্থির ভাব দেখেই না স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বর্ধমান। ভেবেছিল ওতে যদি মায়ের কষ্টের খানিকটা লাঘব হয়। কিন্তু ত্রিশলা গর্ভের ওই স্থির হয়ে যাওয়াকেই ভাবলেন নষ্ট হয়ে যাওয়া। তাই তাঁর এই আর্তি। বর্ধমান দেখল সেই আর্তি। হায়! যে সন্তান এখনো জন্ম গ্রহণ করেনি, যাকে চোখেও দেখেন নি তিনি এখনো, তার জন্য তাঁর একি ব্যাকুলতা! কিন্তু বর্ধমান সেই ব্যাকুলতাকে ছোট করে দেখল না। বরং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল। আমার জন্য যখন মা'র এই কষ্ট তখন তাঁর বেঁচে থাকতে তাঁকে কষ্ট দিয়ে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব না।

তালবৃন্তের ব্যজন দিয়ে সখীরা আবার ত্রিশলার সংজ্ঞা ফিরিয়ে এনেছে।

সিদ্ধার্থ তখন ত্রিশলার হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে বসেছেন। না, না, ত্রিশলা, এ কখনো হতে পারে না। শোননি নৈমিত্তিকদের ভবিষ্যদ্বাণী। তাই মন হতে অকারণ আশঙ্কাকে দূর করে দাও। এমনি যদি অঘটন ঘটবে তবে কেন হবে সবখানে উন্নতি? ওর আসবার সূচনাতেই না আমাদের বল, শ্রী ও সম্পদ।

দলিতাঞ্জন চোখ ছাপিয়ে ত্রিশলার জল ঝরে পড়ল। তিনি সিদ্ধার্থের হাত চেপে ধরলেন। বললেন, সত্যি বলছ?

সত্যি বলছি, ত্রিশলা।

হ্যাঁ সত্যি, এই যে গর্ভ সঞ্চালিত হয়েছে। ধন্য আমি, পুণ্য আমি,

শ্লাঘ্য আমার জীবন। চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হাসি ফুটে উঠল আবার ত্রিশলার মুখে। তিনি সিদ্ধার্থের হাত ছেড়ে দিলেন। বললেন, ব্যাধ ভয়ে ভীতা হরিণীর মত আমার মন। কিন্তু না, আর ভয় রাখব না।

ভয় রাখবেনও বা তিনি কি করে? কারণ যে আসছে সে নির্ভয় করতেই আসছে এই পৃথিবীকে।

আশ্বিনের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর পর এল চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশী, খৃষ্ট জন্মের ঠিক ৫৯৯ বছর আগে। ত্রিশলা বসেছিলেন অলিন্দে। এমন সময় প্রসববেদনা উঠল। প্রসববেদনা উঠতেই তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রসবঘরে ঢুকলেন।

তারপর দেখতে দেখতে প্রসব হয়ে গেল। এতটুকু কষ্ট হল না। ঘরে তখন গাঢ় চন্দনের গন্ধ উঠেছে। ঘরের মণিদীপের আলো অলৌকিক একটা জ্যোতিতে যেন আরো প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

আর বাইরে? বাইরে তখন ত্রয়োদশীর প্রায় পূর্ণাবয়ব চাঁদ মাথার ওপর উঠে এসেছে। মেঘহীন আকাশে কেবল তারই নির্মল শুভ্রতা। কোথাও এতটুকু আবরণ নেই। সেই শুভ্রতায় অদৃশ্য হয়ে গেছে তারার ঝাঁক। ধপ্‌ধপ্‌ করছে মাঠ, ঘাট, বাট।

হস্তোত্তরা উত্তরা-ফাল্গুনীর যোগে এল নবজাতক, এল মহাজীবন।

সিদ্ধার্থ বিশ্রামাগারে ছিলেন। পরিচারিকা প্রিয়ভাষিতা সেই আনন্দসংবাদ তাঁর কাছে বহন করে নিয়ে এল।

সিদ্ধার্থ কণ্ঠ হতে সাতনলী হার খুলে পুরস্কৃত করলেন প্রিয়-ভাষিতাকে। তারপর উঠে গেলেন নবজাতককে দেখবার জন্য।

শুধু সিদ্ধার্থ-ই নন, নবজাতককে দেখবার জন্য এসেছেন আরও অনেকে। মন্ত্রী এসেছেন, এসেছেন সামন্ত নৃপতিরা আর পুরজন। আরও আগে অলক্ষ্যে এসেছিলেন দেবনিকায় সহ দেবরাজ ইন্দ্র।

দেবরাজ অবস্বাপিনী নিদ্রায় সবাইকে নিদ্রিত করে নবজাতককে তুলে নিয়ে গেলেন মেরুশিখরে তার স্নানাভিষেকের জন্য।

কিন্তু যখন সপ্তসিন্ধুর জলে দেবতারা তাকে অভিষিঞ্চিত করতে যাবেন তখন হঠাৎ দেবরাজ ইন্দ্রেরও মনে হল—পারবে কি এই শিশু সপ্তসিন্ধুর জলধারা সহ্য করতে ?

কিন্তু অমূলক তাঁর মনের আশঙ্কা, অকারণ সেই ভ্রান্তি। বর্ধমানও জানতে পেরেছে দেবরাজের মনোভাব। তাই তাঁর ভ্রান্তি দূর করবার জন্য সে বাঁ পায়ের অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে একটুখানি চাপ দিতেই থরথর করে কেঁপে উঠল মেরুপর্বত, শিলা খসে পড়ল ঝুরঝুর করে, উদ্বেলিত হয়ে উঠল উদধি। ইন্দ্র তখন বুঝতে পারলেন বর্ধমান কি অপরিমিত বল, বীর্য ও শারীরিক শক্তির অধিকারী।

অভিষেকের পর আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে এলেন নবজাতককে দেবতারা।

সিদ্ধার্থ চেয়ে দেখছেন নবজাতককে। কি দেখছেন ? দেখছেন কচি সূর্যের রঙ নবজাতকের। যেন সূর্যোদয় হচ্ছে।

মন্ত্রীও দেখলেন। দেখলেন আকাশে যেমন সূর্যকিরণ প্রসৃত হয় তেমনি সেই প্রভা সবখানে প্রসৃত হয়ে গেল।

মন্ত্রী সিদ্ধার্থের দিকে চেয়ে বললেন, দেব, কি নাম রাখা হবে জাতকের ?

কি আবার নাম ? হেসে বললেন সিদ্ধার্থ। ও যেদিন হতে এসেছে সেদিন হতে লক্ষ্মীর চঞ্চলা অপবাদ ঘুচেছে। যাদের জয় করা হয়নি এমন সব সামন্ত নৃপতিরা আনুগত্য জানিয়ে গেছে নিজে হতে। আমার মন বলছে অকারণ লব্ধ নয় এই ঋদ্ধি। তাই যখন ওর জন্য ধন, ধান্য, কোষ ও কোষ্ঠাগার, বল, পরিজন ও রাজ্যসীমার বিস্তৃতি ভুখন ও বর্ধমান।

তাই হয় দিনের দিন নবজাতকের নাম রাখা হল বর্ধমান।

সিদ্ধার্থের মনে আনন্দের সীমা নেই। রাজকোষ উন্মুক্ত করে

দিয়েছেন, বন্দীদের করেছেন বন্ধনমুক্ত। ঘোষণা করেছেন যার যা প্রয়োজন বিপণি হতে সংগ্রহ করে নিয়ে যাক—রাজকোষ হতে অর্থ দেওয়া হবে, যেন আনন্দের দিনে কারু কোথাও কোনো চাওয়া না থাকে।

বর্ধমান রাজকীয় বৈভবের মধ্যে বড় হয়ে উঠছে।

কুমার নন্দীবর্ধন অগ্রজত্বের অধিকারে যদিও পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তবু বর্ধমান সকলের প্রিয় হয়েছে। সে চক্রবর্তী রাজা হবে না তীর্থংকর তার জন্য নয় কারণ সে কথা কেই বা সব সময় মনে করে রাখে, প্রিয় হয়েছে তার রূপ ও লাবণ্যের জন্য, তার অনুপম স্বভাব ও চারিত্রের জন্য। বর্ধমানের রূপ দলিত মনঃশীলার মত। আর লাবণ্য আম্রমঞ্জরীর মকরন্দের মত যা পায়ে পায়ে ঝরে পড়ে। তাই তাকে ভালো না বেসে পারা যায় না।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য তার চোখ। আকর্ণ বিস্তৃত, টানা-টানা। যেন ধ্যানীর চোখ। তাই মুহূর্তের অদর্শন বিচ্ছেদ ব্যথার মত। ত্রিশলা তাই সর্বদাই বর্ধমানকে চোখে চোখে রেখেছেন। মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করেন না।

এমনি দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস। বর্ধমান ক্রমশই বড় হয়ে ওঠে।

সৌধর্ম দেবসভায় সেদিন ইন্দ্র বর্ধমানের বলের প্রশংসা করেছিলেন, তার সাহস ও ধৈর্যের। বালক হলে কি হয়, বর্ধমান তেজে সূর্য, প্রতাপে বহ্নি। তাকে পরাস্ত করে এমন ক্ষমতা দেবতাদেরও নেই। না, ইন্দ্রেরও না। কিন্তু সে কথা বিশ্বাস হল না একজন দেবতার। তিনি ভাবলেন বর্ধমানের এত কি শক্তি। তিনি বর্ধমানের শক্তি পরীক্ষা করতে এলেন।

বর্ধমানের বয়স তখন সাত। সাত ঠিক নয়, সাত পেরিয়ে আটে সে পা দিয়েছে। নূতন কৈশোর।

বর্ধমানের অনেক সঙ্গী। সমবয়সী তারা প্রায় সকলেই। খেলা করে তারা সিদ্ধার্থের প্রমোদ উদ্যানে সকালে বিকালে আমলকী খেলা, তিন্দুসক খেলা।

সেই উদ্যানে কতদিনের কত প্রাচীন গাছ। শ্বেত পুষ্পের সম্ভারে সাদা হয়ে থাকে তাদের শিখর। মনে হয় সূর্যাশ্বের মুখ হতে গলে পড়েছে শুভ্র ফেনা। আর কত যে লতামণ্ডপ—যেখানে কেবলি ঝরে থাকে পীত মঞ্জরীর পুঞ্জ। বাতাসে বনের সুবাস ভাসে।

সেই উদ্যানের মাঝখানে সুবৃহৎ এক সরোবর। পদ্মের মধু ভাসা তার জল। কত যে মরাল সেখানে খেলা করে লীলাভরে। সদ্য ফোটা পদ্মের মতই তাদের গায়ের রঙ। ভ্রমরেরা ফুলগুলির ওপর ছায়া ফেলে গুনগুন করে।

এ হেন প্রমোদ বনে সরোবরের ধারে ধারে তমাল বনের বীথিতে বীথিতে ছেলেরা খেলে বেড়ায়, দোল খায় গাছের ডালে উঠে।

সেদিনও ছেলেরা খেলা খেলছিল। আমলকী খেলা। সরোবরের পশ্চিম তীরে ন্যগ্রোধ গাছের শিখরে উঠে যে সকলের আগে নেমে আসবে সে সকলের পিঠে চড়বে।

ছেলেরা ছুটে গিয়ে গাছে উঠতে যাবে কিন্তু দেখে গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে রয়েছে একটা সাপ। ভয়ে সকলেই পেছনে হটে এসেছে কিন্তু বর্ধমান? সে ভয়ে পেছিয়ে যায়নি, সে এগিয়ে গিয়ে সাপটাকে ধরতে গেছে।

বর্ধমানের কাণ্ড দেখে উৎকণ্ঠায় ছেলেদের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। বর্ধমানের কী হবে? দেবী কি বলবেন? সে কথা তারা ভাবছে।

কিন্তু বর্ধমান ততক্ষণে সাপটিকে লেজ দিয়ে ধরে ঝটকা মেরে দূরে ফেলে দিয়ে তরতর করে গাছে উঠে পড়েছে।

সেই সাপ আর কেউ নয়, ইন্দ্রের কথা যার বিশ্বাস হয়নি সেই দেবতা।

ছেলেরা নিশ্বাস রুদ্ধ করে এতক্ষণ বর্ধমানের কাণ্ড দেখছিল।

শিখরে গিয়ে গাছ হতে আবার নেবে এল তখন তাদের সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সবাই তাকে ঘিরে কোলাহল করতে লাগল কে তাকে আগে পিঠে নেবে।

সেই দেবতাও ততক্ষণে বালক হয়ে বালকদের সঙ্গে মিশে গেছে। বর্ধমানকে পিঠে তুলে নিয়েছে। নিয়ে এক ছুট।

কিন্তু কোথায় নিয়ে এসেছে সে তাকে। সরোবরের ধার দিয়ে, ঘন বনের মধ্য দিয়ে—এ যে অরণ্য।

অরণ্য! কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্য ছেলেটি ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। ক্রমে অরণ্যের সব চাইতে উঁচু গাছের দৈর্ঘ্যকেও সে ছাড়িয়ে গেছে। বর্ধমানকে কি সে আকাশ হতে মাটিতে ফেলে দেবে।

কিন্তু তাতে ভয় পাবার ছেলে বর্ধমান নয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যার বাঁ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সামান্য চাপে মেরুপর্বত কেঁপে উঠেছিল সে পাবে পিশাচরূপী দেবতাকে ভয়? বর্ধমান তার পিঠে বসেই তার ওপর চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ছোট হয়ে গেল।

দেবতাটি তখন স্বরূপ ধরে বর্ধমানের সামনে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, বর্ধমান, ইন্দ্র তোমার সাহস, বল, বীর্য ও ধৈর্যের প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করিনি। তাই তোমাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। কিন্তু দেখছি তিনি যা বলেছিলেন তা সম্পূর্ণ সত্য। একটুও অত্যুক্তি নয়। তুমি বীর নও, মহাবীর।

সত্যিই বর্ধমান মহাবীর। কারণ নিজেকে পেতে গেলে চাই এমনি বল, ধৈর্য ও সাহস। যার এ তিনটি নেই সে নিজেকে খুঁজে পাবে কি করে? যুদ্ধে হাজার লক্ষ মানুষকে জয় করা এমন কিছু শক্ত নয় কিন্তু নিজেকে জয় করা? যে পারে সেই মহাবীর।

যখন ত্রিশলা সমস্ত শুনলেন তখন ভয় খেয়ে গেলেন। ভাবলেন, বর্ধমানকে এভাবে আর ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হবে না। এবারে তাকে লেখশালে দিতে হবে।

মহাবীর

ক্ষত্রিয় কুণ্ডপুর, লছবাড়, পালযুগ

শুনে সিদ্ধার্থ বললেন, বেশ ত। তাতে আমার আর কি অমত।
তবে ওর কিছু শিখবার আছে বলে মনে হয় না। দেখনি ওর চোখের দীপ্তি। ওর যা জ্ঞান আমাদের সকলের জ্ঞান একত্র করলেও সেখানে পৌঁছবে না। ও ত জ্ঞানী নয়, বিজ্ঞানী।

জ্ঞানে সত্যের একটি দিকের প্রতিভাস হয়, বিজ্ঞানে সমস্ত দিকের। বিজ্ঞান তাই বিশিষ্ট জ্ঞান। তত্ত্বকে যথার্থ রূপে জানা।

সেই জানার জন্যই অনেকান্ত।

ত্রিশলা এর জবাব দিলেন না। কিন্তু অলক্ষ্যে তাঁর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল। বিজ্ঞানী বলেই তাঁর যত ভয়। ও যদি আর দশ জনের মত হত।

শেষে ত্রিশলার তাগিদেই লেখশালে যেতে হল বর্ধমানকে।

কিন্তু বর্ধমানের লেখশালে যাওয়া যেন আম গাছে আম্র-পল্লব টাঙানো, সরস্বতীকে শিক্ষা দেওয়া, চাঁদকে ধবল করা, সমুদ্রে লবণ নিক্ষেপ।

কিন্তু মানুষের মন কিছুতেই সেকথা বুঝতে চায় না।

বর্ধমান গুরুগৃহে এসেছে। বসেছে আর আর বালকদের সঙ্গে। আজ হতে শুরু হবে তার বিদ্যাভ্যাস।

সহসা বিদ্যামন্দিরের দ্বারে আবির্ভাব হল এক ব্রাহ্মণের। তপ্ত সোনার মত তাঁর গায়ের রঙ। মুখে একটা দিব্য বিভা। শ্রদ্ধা হয় প্রথম দর্শনেই।

আচার্য পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তাঁকে ভেতরে এনে বসালেন। ব্রাহ্মণের চোখ পড়েছে গম্ভীরাকৃতি বর্ধমানের ওপর। তিনি বার বার তার দিকে চেয়ে দেখছেন। তারপর একসময় জিজ্ঞাসাই করে বসলেন, কে ওই সৌম্যদর্শন বালক ?

রাজপুত্র বর্ধমান, বললেন আচার্য। আজই এসেছে লেখশালে।

বেশ! বেশ! কিন্তু দু'একটি প্রশ্ন করতে পারি কি আমি বর্ধমানকে? বিনয় বিনম্র ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, বলে উঠলেন আচার্য। বয়সের তুলনায় ও স্বভাবতই একটু গম্ভীর। তারপর বর্ধমানের দিকে চেয়ে বললেন, সৌম্য, অভ্যাগত অতিথির প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দাও।

শুনে ব্রাহ্মণ একটু হাসলেন। তারপর বর্ধমানের দিকে চেয়ে বললেন, বর্ধমান, বয়সে নবীন হলেও তুমি জ্ঞানে প্রৌঢ়। তবু বয়সের অধিকারে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারি আমি নিশ্চয়ই। আচ্ছা বলত, সংজ্ঞা সূত্রের যথার্থ অর্থ কী?

ব্যাকরণের প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্ন ত নয়। আচার্যের মনের সংশয়ের এক একটির উন্মোচন। চকিত আচার্য আরও চকিত হলেন যখন বর্ধমান তার নির্ভুল জবাব দিল। সংজ্ঞা সূত্রের যে সেই অর্থ হতে পারে তা তাঁর নিজেরই জানা ছিল না।

কিন্তু সেই একটি প্রশ্নই নয়, প্রশ্নের পর প্রশ্ন আর তার নির্ভুল সমাধান।

সংজ্ঞা সূত্রের।

পরিভাষা সূত্রের।

বিধি সূত্রের।

নিয়ম সূত্রের।

প্রতিষেধ সূত্রের।

অধিকার সূত্রের।

অতিদেশ সূত্রের।

অনুবাদ সূত্রের।

বিভাষা সূত্রের।

ব্রাহ্মণ তখন বিদায় নিয়েছেন। আর আচার্য? তিনি এতই অভিভূত হয়ে গেছেন যে আসন ছেড়ে উঠে এসে পুলকভরা চোখে তিনি বর্ধমানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। আর বলছেন, তাত, তুমি আমার বিদ্যায় নিতে এসেছ সে কেবল আমার সম্মান দিতে। তোমার

কণ্ঠে সরস্বতী, তোমাকে কিছু শিক্ষা দেই, তেমন আমার বিদ্যা নেই। বরং তুমিই আমায় শিক্ষা দিতে পার।

ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধরে এসেছিলেন 'ও কিছু শিখল না' সকলের এই মূঢ়তা ভাঙবার জন্য। যে তিনটি জ্ঞানের অধিকারী, মতি, শ্রুত ও অবধিজ্ঞান, তাকে কিনা সাধারণ পড়ুয়ার মত লেখশালে প্রেরণ করা?

মতিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান, যেমন করে আমরা সকলে জানি। শ্রুতজ্ঞান গুরুমুখে বা শাস্ত্রপাঠে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অবধিজ্ঞান একটা সীমার মধ্যে বস্তুসত্তার জ্ঞান। তীর্থংকর এই তিনটি জ্ঞান অধিগত করেই জন্মগ্রহণ করেন।

বর্ধমান ইন্দ্রের প্রশ্নের জবাবে মুখে মুখে সে জবাব দিয়েছিল তার নাম হল ঐন্দ্র ব্যাকরণ।

বর্ধমান তাই যেদিন লেখশালে গেল, সেই দিনই আবার ঘরে ফিরে এল। সমস্ত শুনে সিদ্ধার্থ ত্রিশলাকে বললেন, কেমন আমি বলিনি?

ত্রিশলা মুখে বললেন বটে আমার হার হয়েছে কিন্তু মনে কাঁটার মত বিঁধে রইল বর্ধমান কিছুই শিখল না।

আবার সেই অবাধ জীবন, নির্বাধ মুক্তি। বনের ছায়ায় সরোবরের তীরে অলস সময়ক্ষেপ। অন্যান্য রাজকুমারদের মত তার বিলাস-ব্যসনে মন নেই, না মৃগয়ায়। তার ভেতরে ভেতরে চলেছে যেন কিসের এক অনুধ্যান, কি এক সর্বগ্রাসী ভাবনা। ত্রিশলা কতদিন তাকে আবিষ্কার করেছেন ধ্যানে—শিথিল যখন তার দেহবন্ধ। আর অনিশ্চিত আশঙ্কায় ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। এ ত রাজচক্রবর্তীদের লক্ষণ নয়। শৌর্য আছে অথচ শৌর্যের প্রকাশ নেই। সর্বগুণান্বিত অথচ গুণহীন।

এমনি করে আট বছর আরও কেটে গেল।

বর্ধমান এখন পা দিয়েছে ষোলয়।

বর্ধমানের প্রথম যৌবন। যৌবনই এখন বক্ষে এনে দিয়েছে বিশালতা। উরুতে পুষ্টি, কণ্ঠস্বরে মাধুর্য।

ত্রিশলা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন বর্ধমানের শরীরের। ভাবলেন, এইত সময়। কোনরকমে যদি তিনি একবার বেঁধে দিতে পারেন বর্ধমানকে উত্তমা বধূর আঁচলে তবে তাঁর আর ভয় নেই।

মেয়েও দেখে রেখেছেন ত্রিশলা। মহাসামন্ত সমরবীরের মেয়ে যশোদা—মেয়ে ত নয়, যেন লক্ষ্মীর প্রতিমা।

যেদিন প্রথম দেখেছিলেন তিনি তাকে উৎসবে সেদিন হতেই বরণ করে নিয়েছেন মনে মনে।

বর্ধমানের তুলনা হয় না। কিন্তু যশোদাও কিছু কম নয়। কারণ যেদিন তার জন্ম হয় সেদিন শত্রু এসেছিল তার পিতৃরাজ্য আক্রমণ করতে। সমরবীর তাকে পরাস্তই করেন নি, চুলের মুঠি ধরে খড়্গ তুলেছিলেন কাটবার জন্য। কিন্তু শেষমুহূর্তে দয়াপরবশ হয়ে ছেড়ে দিলেন। এতে সমরবীরের যশ আরও বিস্তৃত হল। তাই সমরবীর মেয়ের নাম দিলেন যশোদা। গণৎকারেরা গণনা করে বলেছিল, এই মেয়ের তার সঙ্গে বিয়ে হবে যার বুকে শ্রীবৎস চিহ্ন।

ত্রিশলা যশোদার কথা মনে রেখেই স্বামীকে একদিন বললেন, দুর্লভদর্শন ছেলের মুখ ত দেখেছি, এবারে একটি ফুটফুটে বউয়ের মুখ দেখতে চাই।

সেকথা শুনে সিদ্ধার্থ বললেন, ত্রিশলা, তাতে কি আমার অসাধ। যেদিন হতে ওর কপোলে শ্মশ্রুরেখা দেখা দিয়েছে সেদিন হতে আমারও সে কথা মনে হয়েছে। কিন্তু সে ইচ্ছা কি আমাদের পূর্ণ হবে?

হবে হবে, হেসে বললেন ত্রিশলা। এমন মেয়েকে দেখে রেখেছি যাকে দেখলে ও আর না করতে পারবে না। দেখনি তুমি সমরবীরের মেয়ে যশোদাকে?

হ্যাঁ দেখেছি। হাজারের মধ্যে একটি। শতদলের মধ্যে সহস্রদল। কিন্তু বর্ধমান কী রাজী হবে?

ত্রিশলা বললেন, সে ভার থাক আমার ওপর। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

ত্রিশলাই একদিন বললেন বর্ধমানকে।

ত্রিশলার ভয় ছিল ওকে রাজী করাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে তাঁকে, হয়ত যশোদাকেই এনে হাজির করে দিতে হবে ওর সামনে। কিন্তু কিছুরই প্রয়োজন হল না। বর্ধমান মেয়েটিকে দেখতেও চাইল না। সম্মতি দিয়ে দিল। তুমি যখন বলছ, তুমি যখন দেখেছ, তখন তার ওপর বলবার কি আছে, দেখবার কি আছে ?

কিন্তু যে শুনল সেই আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ তার সংসারে অনাসক্তির কথা সকলেরই জানা। সংসারই ত ভববন্ধনের কারণ আর ভোগরাগের। ত্রিশলাও কম আশ্চর্য হন নি। কিন্তু না, যখন সম্মতি পাওয়া গেছে তখন আর বিলম্ব নয়।

কিন্তু আশ্চর্যের কি ছিল এতে! মা'র কথা বর্ধমান শুনবে সেই ত স্বাভাবিক। কারণ সংসারে মা'র মত গুরু কে ? সংযোগে গুরু। সংসারে যিনি যুক্ত করে দেন সকলের সঙ্গে। তাছাড়া মা'র সেই আর্তির কথা আজও মনে আছে বর্ধমানের—যেদিন মা'র কষ্ট হচ্ছে বলে গর্ভের মধ্যে সে স্থির হয়ে গিয়েছিল। তাই ত আজও সে প্রব্রজ্যা নেয় নি, মা'র কষ্ট হবে বলে।

তাই এক শুভদিনে বর্ধমানের সঙ্গে যশোদার বিয়ে হয়ে গেল।

ত্রিশলার এখন বর্ধমানের দিকে চেয়ে দেখবার অবসর নেই। তাঁর সমস্ত সময় কেড়ে নিয়েছে যশোদা। মেয়ে ত নয়, যেন শুভ্রতার একটা প্রতিমূর্তি। ত্রিশলার এখন সমস্ত সময়ের ভাবনা কিসে সে সুখে থাকে, কিসে তার আনন্দ।

আর বর্ধমান ? বর্ধমান সংসারধর্ম পালন করে যেমন আর দশজন করে থাকে। তবে বিশেষ আছে।

কিন্তু বিশেষটা কারু চোখে পড়ে না। না পড়বারই কথা।

তাই তারা ভাবে ততদিনই ঔদাসীন্য যতদিন না ঘরে বউ আসে।

কিন্তু তা নয়। বর্ধমান আজন্ম উদাসীন। কোন কিছুতে যেমন তার অনুরাগ নেই, তেমনি বিরাগ। সে বীতরাগ।

কে বীতরাগ ?

চক্ষুগ্রাহ্য রূপ। রূপ তাই চোখের বিষয়। এই রূপের প্রতি যে আসক্তি সেই আসক্তিই অনুরাগের কারণ। যে বিরক্তি তাই বিরাগের। কিন্তু যার রূপে আসক্তিও নেই, বিরক্তিও না; এ দুয়ের যে অতীত, সে বীতরাগ।

বিরাগও কিছু নয়। কিছু ভালো না লাগা মানেই কিছু ভালো লাগা। যেমন আলো আর ছায়া। আলো আছে ত ছায়াও আছে। বিরাগ আছে ত রাগও। সেই ত বন্ধন।

বন্ধন নেই তার যে বীতরাগ। যার আলোও নেই, ছায়াও নেই; যার ভালোও নেই; মন্দও নেই; যার আসক্তি নেই, বিরক্তিও নেই; যে নির্দ্বন্দ্ব।

বিতরাগী অনেকটা পদ্মপাতার মত। জলে যদিও থাকে তবু গায়ে জল মাখে না।

সংসার করেও তাই বর্ধমান সংসার করে না। যদিও তার একটি ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে।

মেয়েটি রূপ পেয়েছে মা ও বাপের দু'জনেরই। যেন এক রাশ জ্যোৎস্না। ত্রিশলা তাই তাকে সব সময় কোলে করে রয়েছেন। বারবার বলছেন মেয়েটি কি অনবদ্যা, কি প্রিয়দর্শনা।

সেই হতে মেয়েটির নাম হল অনবদ্যা, প্রিয়দর্শনা।

বর্ধমানের জন্মের পর আটাশ বছর কেটে গেছে—দীর্ঘ আটাশ বছর। যদিও মনে হয় সে যেন কালকের কথা।

কিন্তু আর সংসারে থাকা চলে না সে কথা বুঝতে পেরেছেন সিদ্ধার্থ। তাঁর কানের কাছের চুলগুলো যে সব পাকতে আরম্ভ

করেছে। জরা এসেছে এ তারই সমন। জীবনে অনেক ভোগই ত করেছেন এখন ভোগ বিরতি। তাই একদিন ডেকে বললেন ত্রিশলাকে, এবার সংসার হতে বিদায় নিতে হয়, কি বল ?

কি আর বলবেন ত্রিশলা। মনের মধ্যে একবার প্রিয়দর্শনায় মুখখানা ফুটে উঠল। কিন্তু তখনি মনে হল তাঁদের অনেক বয়স হয়েছে। এখন সময় হয়েছে সংসারের জাল-জঞ্জাল হতে সরে যাবার। তাই ধীরে ধীরে বললেন, তোমার যা মত আমারও সেই মত।

শুনে সিদ্ধার্থ খুশী হলেন।

তারপর রাজ্যভার নন্দীবর্ধনের হাতে তুলে দিয়ে সব কিছু হতে নিজেদের বিশ্লিষ্ট করে নিলেন। সংসারের ভার বহন করবার পর বহন করতে হয় সংযম ভার।

সংযম ভারই বহন করতে শুরু করলেন এখন রাজা সিদ্ধার্থ, রাণী ত্রিশলা। কঠিন তপশ্চর্যায় ক্ষয় করলেন জন্ম জন্ম সঞ্চিত কর্মমল। শেষে অনশনে মৃত্যু বরণ করলেন।

তাঁদের মহাপ্রয়াণের খবর দেওয়া হল বর্ধমানকে। বর্ধমান সে খবর ধীরভাবেই গ্রহণ করল। তারপর চেয়ে দেখল আকাশের দিকে। দেখল আকাশের নিঃসীম আলোয় যেন সব কিছু তার অবারিত হয়ে গেছে।

বর্ধমান ধীরে ধীরে এসে বসল সেই সরোবরের ধারে যেখানে ছোট-বেলায় সে খেলে বেড়াত তমালবনের ছায়ায় ছায়ায়।

ঝুরঝুর করে ঝরছে তখন গাছের পাতা, হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খেয়ে। ঝরছে আর উড়ে এসে পড়ছে তার গায়ে, মাটিতে, সেই দীঘির জলে। কি জানি কি ভাবছিল সে ? তবে অনেক কাল পরে বলেছিল সে গৌতমকে, যেমন করে ঝরছে গাছের পাতা কাল বশে জীর্ণ হয়ে তেমনি মানুষের জীবন। আয়ুশেষে এও ঝরে পড়বে। তাই চুপ করে বসে থেকো না, চেষ্টা কর অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছবার। সময় নষ্ট করবার মত সময় কি তোমার আছে ? সময়ং গোয়ম মা

পমায়এ। গৌতম মুহূর্তমাত্র সময়ও নষ্ট করো না। বোধ হয় সেই কথাই ভাবছিল বর্ধমান। আর কি তার চুপ করে বসে থাকলে চলে না সময় নষ্ট করবার মত সময় তার আছে? পৃথিবী যে তার নূতন জন্মের জন্য প্রতীক্ষা করে রয়েছে—সেই শুভলগ্ন কি আজও আসে নি?

ওদিকে নন্দীবর্ধন খুঁজে বেড়াচ্ছেন বর্ধমানকে সবখানে। বর্ধমান সম্পর্কে নন্দীবর্ধনের মনে অকারণ একটা আশঙ্কা রয়েছে।

নন্দীবর্ধন তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেইখানে এসে পড়লেন। দেখলেন তার দেহস্থিতি। তার দেহটাই যেন পড়ে রয়েছে, সে নেই।

কোথায় তখন বর্ধমান?

বর্ধমান তখন চলেছে সেই পথ ধরে যে পথ অনাদ্যন্ত। যে পথ গেছে ঘরের পাশ দিয়ে, কাঁটা বনের মধ্যে দিয়ে, জোয়ার খেতের বুক চিরে, পাহাড় বনের কোল ঘেঁষে—

বর্ধমান কি স্বপ্ন দেখছিল?

স্বপ্ন নয়, তার ভবিষ্যৎ জীবনের আলেখ্য। যে অন্তঃবিহীন পথ তাকে অতিক্রম করতে হবে সেই পথ। নন্দীবর্ধনের ডাকে বর্ধমানের সংবিৎ ফিরে এল। দেখল সামনে দাঁড়িয়ে নন্দীবর্ধন।

বর্ধমান উঠে দাঁড়াল, বলল, দাদা অনুমতি দাও, আমি প্রব্রজ্যা নেব।

প্রব্রজ্যা! এই আশঙ্কাই ছিল নন্দীবর্ধনের মনে। চোখের উদ্গত অশ্রু দমন করে নিয়ে বললেন নন্দীবর্ধন, তুমি প্রব্রজ্যা নেবে সে আমরা জানি। বাধাও দেব না তাতে। কারণ তুমি সাধারণ নও আমাদের মত, তুমি অসাধারণ। তবু তার কি এত তাড়া? একে বাবা-মা'র এই শোক, তারপর যদি তুমি চলে যাও—

শেষের দিকে কেমন যেন ভারী শোনাল নন্দীবর্ধনের কণ্ঠস্বর। আর কিছুদিন কি থেকে যেতে পার না?

নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল বর্ধমান, কতদিন?

বেশী নয়, দু'বছর।

দু'বছর। আচ্ছা তাই। তবে আমার জন্য কিছু আরম্ভ সমারম্ভ করো না।

তার মানে সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী হল বর্ধমান।

সংবর আর নির্জরা।

সংবর নূতন কর্মপ্রবাহকে নিরোধ করা, নির্জরা জন্মজন্মার্জিত কর্মমল ক্ষয় করা। বর্ধমান যেমন নূতন কর্মপ্রবাহকে নিরোধ করবে তেমনি ক্ষয় করবে পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত কর্মকে।

বর্ধমানের আহারে বিহারে সংযম হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত সে ব্রহ্মচর্যে। এ সামান্য ব্রহ্মচর্য নয়, এ সর্বদা সর্বথা ব্রহ্মচর্য—শুধু মাত্র আত্মাতেই স্থিতি। চারদিকে যে রূপ ও রসের প্রলোভন ছড়ানো কোনোটাতেই তার মন নেই। কর্মরজঃ কি করে তাই তাকে লিপ্ত করবে?

তাই দানে যেমন অভয় দান, ধ্যানে পরম শুক্ল ধ্যান, জ্ঞানে পরম কেবল জ্ঞান, লেশ্যায় পরম শুক্ল লেশ্যা, তেমনি নিয়মে এই ব্রহ্মচর্য। পরম বিশুদ্ধি, নির্মম নির্মলতা।

যঃ ন সঞ্চই কিঞ্চন। যে কিছুই সঞ্চয় করে না।

তার দুঃখ নেই যার মোহ নেই। তার মোহ নেই যার তৃষ্ণা নেই, তার তৃষ্ণা নেই যার লোভ নেই। তার লোভ নেই যে অকিঞ্চন।

যে অকিঞ্চন সে কিছু সঞ্চয় করে না। তাই তার পরিগ্রহ কোথায়?

এই অকিঞ্চন হবার জন্য বর্ধমান নিজের বলে যা কিছু ছিল সব দান করে দিল। বসন, ভূষণ, রত্ন, অলঙ্কার, ধন, ভূমি সব। শেষের এক বছর বর্ধমান কল্পতরু হয়ে সে সমস্ত দান করল।

তারপর অগ্রহায়ণ মাস এল। এল অগ্রহায়ণ মাসের বহু প্রতীক্ষিত কৃষ্ণা দশমী। অভিনিষ্ক্রমণের সঙ্কল্প নিয়ে দিনের তৃতীয় প্রহরে চন্দ্রপ্রভা পাল্কীতে করে বেরিয়ে এল বর্ধমান রাজভবন হতে। সঙ্গে এল যত আত্মীয়-স্বজন, চতুরঙ্গ সেনা ও পৌরজন।

আকাশে চলেছেন দেবতারা, অভিষেকের সময় অলক্ষ্য হতে অভিষেক করেছেন ইন্দ্র। এখন তাঁর ডান দিক রক্ষা করে চলেছেন। রব উঠেছে :

জয় জয় নন্দা
জয় জয় ভদ্দা-র।

ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরের বাইরে জ্ঞাতষণ্ডবন উদ্যান। ক্ষত্রিয় কুণ্ডপুরের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা করে বর্ধমানকে সেইদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাদ্যভাণ্ড সহকারে। ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরে এত বড় শোভাযাত্রা এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। নন্দীবর্ধন এই মহা-অভিনিষ্ক্রমণকে স্মরণীয় করবার জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

তারপর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সেই শোভাযাত্রা এসে থামল অশোক গাছের নীচে। বর্ধমান তখন পাল্কী হতে বেরিয়ে এল। তারপর একে একে খুলে ফেলল তার দেহের সমস্ত আভরণ—অঙ্গদ, কিরীট, কেয়ূর। এক কুলবৃদ্ধা সেগুলো তুলে নিয়ে বলল, কুমার, তোমাকে উপদেশ দেই এমন সাধ্য কী? কারণ তুমি সকল জ্ঞানে জ্ঞানী। তবুও স্নেহের অনুরোধে তোমাকে দু'একটি কথা বলি। পুত্র, তুমি তীব্রগতিতে পথ অতিক্রম করবে, তোমার গৌরবের দিকে লক্ষ্য রাখবে। ক্ষুরধারের মত নিশিত এই পথ। প্রমাদহীন হয়ে মহাব্রত পালন করবে। জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্র দিয়ে ইন্দ্রিয়কে সর্বদা বশীভূত রাখবে ও সমস্ত রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও নিজের সঙ্কল্প হতে চ্যুত হবে না। কঠোর তপস্যা দ্বারা রাগ ও দ্বেষকে নির্জিত করবে ও উত্তম ধ্যানের দ্বারা মোক্ষপদ লাভ করবে।

কুলবৃদ্ধার উপদেশ শেষ হলে বর্ধমান পাঁচবারে নিজের হাতে মুঠোয় করে তুলল মাথার চুল। তারপর একখানা দেবদূষ্য বস্ত্র কাঁধে ফেলে মনে মনে বলল, সব্বং মে অকরণিজ্জং পাবকম্মং। আজ থেকে সমস্ত পাপকর্ম আমার পক্ষে অকৃত্য।

তখন চন্দ্রের উত্তরা-ফাল্গুনী নক্ষত্রের যোগ, বেলা চতুর্থ প্রহর। গাছের ছায়া পড়েছে পূবের দিকে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে শেষ

বেলাকার সোনালী রোদ এসে পড়েছে বর্ধমানের মুখের ওপর। সৌম্য প্রদীপ্ত সেই মুখ।

যশোদা কী আড়ালে চোখের জল ফেলেছিল? কে জানে? যশোদার কথা কোথাও লেখা হয় নি। আর প্রিয়দর্শনা?

বর্ধমানের অধিগত ছিল মতি, শ্রুত ও অবধিজ্ঞান। কিন্তু যে মুহূর্তে সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করল সেই মুহূর্তেই সে অধিগত করল মনঃ-পর্যায় জ্ঞান।

মনঃপর্যায় জ্ঞানে জানা যায় পশুপক্ষী ও মানুষের অন্তর্গূঢ় মনোভাবকেও।

প্রব্রজ্যা

॥ ১ ॥

বর্ধমান সেই জ্ঞান লাভ করে কমরী গ্রামের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

নন্দীবর্ধন ও আত্মীয় পরিজনেরা আরও কিছু দূর তাঁর অনুগমন করলেন। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে ঘরে ফিরে গেলেন।

তাঁরা ফিরে যেতেই বর্ধমান তাঁর পায়ের গতি আরও দ্রুত করে দিলেন। তারপর সন্ধ্যার মুখে মুখে এসে পৌঁছলেন কমরী গ্রামের বাহির সীমায়। সূর্য অস্ত যেতে তখন মুহূর্ত মাত্র বাকী।

বর্ধমান প্রব্রজ্যা নেবার সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যে পর্যন্ত না তাঁর দেহবোধ সম্পূর্ণ লুপ্ত হচ্ছে, যে পর্যন্ত না তিনি কেবল জ্ঞান লাভ করছেন সে পর্যন্ত তিনি শরীরকে শরীর বলে মনে করবেন না। সমস্ত রকম দুঃখ কষ্ট—তা দৈব সৃষ্টই হোক বা মানুষের কৃত অদীন মনে গ্রহণ করবেন। মনে কোন উদ্বেগ ভাবই আসতে দেবেন না।

বর্ধমান তাই গ্রামে প্রবেশ করবার ইচ্ছা করলেন না। সেইখানেই পথ হতে নেমে দাঁড়ালেন তারপর এক গাছের তলায় নাসাগ্র দৃষ্টি অবলম্বন করে কায়োৎসর্গ ধ্যানে স্থিত হলেন।

বর্ধমান যেখানে ধ্যানে স্থিত হলেন সেখানে খানিক আগে এক গোপ তার বলদ দুটো ছেড়ে দিয়ে গ্রামের দিকে গিয়েছিল। ভেবেছিল এই ভরসন্ধ্যায় কেইবা তার বলদ দুটো চুরি করবে। গ্রাম হতে ফিরে এসে সেখান হতেই তাদের সঙ্গে নিয়ে সে ঘরে ফিরবে কিন্তু খানিকবাদে যখন সে তার কাজ শেষ করে ফিরে এল, তখন দেখল সেখানে বলদ নেই।

হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল বর্ধমানের ওপর। ভাবল, বর্ধমান হয়ত দেখে থাকবেন তার বলদ দুটোকে। তাই সে তাঁর কাছে গিয়ে বলল, দেবার্য, আপনি কি আমার বলদ দুটো দেখেছেন?

বর্ধমান সেই প্রশ্নের কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না। সেই প্রশ্ন তাঁর কানেই যায়নি। বর্ধমান তখন ধ্যানের গভীরতায় ডুবে গিয়েছিলেন।

প্রত্যয়ের একতানতাই ধ্যান।

যখন সমস্ত প্রত্যয় মেলে একটি প্রত্যয়ে, আত্মসম্বীতিতে, তখন বাইরের বোধ থাকে না।

গোপ বর্ধমানকে নিরুত্তর দেখে ভাবল, তবে হয়ত বর্ধমান দেখেননি। তাই সে আতিপাতি চারদিকে তাদের খুঁজে বেড়াল।

সমস্ত রাত ধরে সে বন-বাদাড় খুঁজে বেড়াল। কিন্তু কোথাও তাদের দেখতে পেল না। তারপর ভোরের দিকে যখন ক্লান্ত হয়ে যেখানে সে প্রথম তাদের ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল সেখানে সে ফিরে এল তখন দেখল বর্ধমান যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর তার বলদ দুটো বর্ধমানের পায়ের কাছে বসে জাবর কাটছে।

এ অবস্থায় কার না রাগ হয়। গোপেরও রাগ হল। ভাবল, সমস্ত জেনে শুনেও বর্ধমান তাকে শীতের সেই অন্ধকার রাতে বনবাদাড়ে ঘুরিয়ে মেরেছেন। সে তখন তার হাতের পাঁচন বেড়ী নিয়ে বর্ধমানকে মারতে ছুটল। মারবে বলে সে পাঁচন বেড়ী তুলেও ছিল কিন্তু সহসা কেমন করে তার হাত দুটো মাঝপথে আটকে গেল।

তার হাতও যেই আটকাল, বর্ধমানেরও সেই ধ্যান ভাঙল। দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে দেবরাজ ইন্দ্র।

ইন্দ্র বললেন, দেবার্য, আপনার প্রাক্তন কর্মের জন্য বারো বছর ধরে আপনার ওপর এরকম ইতরের উৎপাত চলবে। আপনি যদি চান ত আমি আপনাকে এভাবে রক্ষা করি।

সেকথা শুনে বর্ধমান একটু হাসলেন। বললেন, দেবরাজ, ভাবী অর্হৎ নিজের উত্তম, বল, বীর্য ও পুরুষার্থ ছাড়া কবে কোথায় কেবল জ্ঞান লাভ করেছে?

সেকথা শুনে মনে মনে তাঁকে সাধুবাদ দিয়ে ইন্দ্র অন্তর্হিত হলেন।

পুবের আকাশ তখন বেশ ফরসা হয়ে এসেছে। বর্ধমান তাই প্রতিক্রমণ করে পথে উঠে এলেন।

কমরীগ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছেন বর্ধমান। লোকেদের তখন সবে ঘুম ভেঙেছে। কেউবা দোরের আগল খুলছে, কেউবা দোকানের ঝাঁপ। ওরই মধ্যে এক ঝলক তারা দেখে নেয় বর্ধমানকে, তরুণকান্তি কুমার-প্রব্রজিতকে।

ঘাট হতে জল নিয়ে যাবার পথে মেয়েরাও থমকে দাঁড়ায়। ছুটে যায় তাদের চোখের দৃষ্টি মধুলোভী ভ্রমরের মত। অমন স্বর্ণকান্তি দেহ আর পদ্মপলাশ চোখ মেয়েরা কি না দেখে পারে? কিন্তু শুধু রূপ নয়। বর্ধমানের গায়ে কাল যে লেপন করা হয়েছিল হরিচন্দন—কি তার সৌরভ। লোভীর মত ভ্রমরগুলোও তাই ছুটে চলেছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু বর্ধমানের কোনো দিকেই চোখ নেই। ছুটে চলেছেন তিনি যেন জ্যাভ্রষ্ট তীর। মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি এগিয়ে চলেছেন কমরীগ্রাম অতিক্রম করে মোরাক সন্নিবেশের দিকে।

দিনের প্রথম যাম তখন উত্তীর্ণ হয়েছে। মোরাকের পথে বর্ধমান এসেছেন কোল্লাগে।

ব্রাহ্মণ বহুল বসেছিলেন ঘরের দাওয়ায়। হঠাৎ তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল বর্ধমানের ওপর। দেখলেন দেহের সেকী দিব্য বিভা—হিরণ্ময়ী যেন তপতী, দীপের যেন শিখা।

বহুল অনিমেষ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখলেন আর ভাবলেন। কি ভাবলেন কে জানে? কিন্তু কী তাঁর সৌভাগ্য যে বর্ধমান তাঁর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর ভিক্ষার ভঙ্গীতে তাঁর হাত দুটো প্রসারিত করে দিলেন। যেন চাইলেন আহার ভিক্ষা।

বহুল তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ছুটে গেলেন। তারপর পায়েসের

বাটিতে করে পরমান্ন নিয়ে এলেন। দিলেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। বর্ধমান সেই অন্ন গ্রহণ করলেন। সেই তাঁর প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ।

বর্ধমান তারপর আর কোথাও থামেননি। সোজা বেরিয়ে গেলেন মোরাকের দিকে।

দিনের সূর্য মাথার ওপর গড়িয়ে গেল। শীতের বেলা পড়ে আসতেও আবার সময় লাগল না। তাই যখন সন্ধ্যা হয় হয় তখন তিনি এসে পৌঁছলেন মোরাকের কাছাকাছি।

মোরাক সন্নিবেশের বাইরে ছিল দুইজ্জন্তদের আশ্রম। এই আশ্রমের যিনি কুলপতি তিনি ছিলেন রাজা সিদ্ধার্থের মিত্র। তাই বর্ধমানেরও পরিচিত। বর্ধমানকে তাই অভাবিতভাবে সেখানে আসতে দেখে তিনি তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন আশ্রমপদে। তারপর তখন তখনি ছেড়ে দিলেন না। তাই বর্ধমানের সেই রাত্রি কাটল দুইজ্জন্তদের আশ্রমে।

কুলপতি পরদিন সকালেও তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইলেন না। বললেন, তাত, এই আশ্রমেই থাক কিছুকাল। তোমার পিতা ছিলেন আমার মিত্র। তাই এই আশ্রমকে অন্যের বলে মনে কোরো না।

প্রব্রজ্যা নিয়ে একদিনের বেশী একখানে থাকতে নেই। তাই বর্ধমান থাকতে পারলেন না সেই আশ্রমপদে। তবে কুলপতির আগ্রহাতিশয্যে সামনের বর্ষাবাস সেখানেই ব্যতীত করবেন বলে তিনি বিদায় নিলেন।

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে প্রথম বর্ষাবাস দুইজ্জন্ত আশ্রমে যাপন করতে এসেও ছিলেন বর্ধমান। কিন্তু এক পক্ষও গেল না। তার আগেই সেই আশ্রমপদ পরিত্যাগ করে বর্ধমানকে চলে যেতে হল।

আশ্রমপদে লতায় পাতায় ছাওয়া পর্ণকুটিরে থাকেন আশ্রমবাসীরা। এমনি এক পর্ণকুটির দিয়েছেন কুলপতি বর্ধমানকে থাকবার জন্য। কিন্তু বর্ধমান ঘরে থেকেও থাকেন না। তাঁর অধিকাংশ সময়

ব্যতীত হয় ধ্যানে নয়ত আত্মানুচিন্তনে। তাই ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের কথা তাঁর মনেই আসে না। আর সেই অবসরে কুটিরে ছাওয়া বিচালি লতাপাতা গাই বাছুরে খেয়ে যায়।

বর্ধমান এসবের খবর রাখেন না। কিন্তু আশ্রমবাসীদের এদিকে চোখ আছে। তাঁরা ভাবেন বর্ধমানের এ ইচ্ছাকৃত অবহেলা। অপরের আশ্রম—তাই। এ নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করেন।

শেষে সেকথা কুলপতিরও কানে ওঠে। তিনি একদিন তাই বর্ধমানকে ডেকে ভর্ৎসনা করে বললেন, সৌম্য, পাখিরাও যে নীড় বাঁধে তাকে তারা সযত্নে রক্ষা করে আর তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে নিজের কুটির রক্ষা করতে পার না?

সেকথা শুনে বর্ধমান ভাবতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন তিনি কুটির রক্ষা করবেন না আত্মানুধ্যান। যোগক্রিয়ায় বিদেহানুভূতি লাভ করবেন না গাইবাছুর তাড়িয়ে গার্হস্থ ধর্ম পালন।

গার্হস্থ ধর্মই যদি পালন করবেন তবে তিনি কেন শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন?

তাছাড়া এতো পরিগ্রহ।

পরিগ্রহ ত কেবলমাত্র বস্তু সঞ্চয়ই নয়, এই মমত্ববোধ। বিষয়ে মমতা।

জ্ঞানীর আত্মদেহেই মমতা থাকে না, বিষয়ে ত দূরের।

কুটিরের প্রতি যদি মমতা না থাকে তবে গাইবাছুর তাড়িয়ে কুটির রক্ষা করবেন কি করে? তাই মমত্ব হতেই কি বৈরের উদ্ভব হচ্ছে না? বৈর হতে হিংসার? অথচ—

না, পরিগ্রহ তিনি করতে পারেন না। মমত্ব তাঁর থাকলে চলে না।

এঁরা আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী। এঁরা সংসার ছেড়ে এসেছেন। কিন্তু সত্যি কী সংসার এঁদের ছেড়েছে? তাই আশ্রমবাসী হয়েও এঁরা বিষয়চিন্তা করেন। বিষয়ে মমত্ব পরিত্যাগ করেন নি।

বর্ধমান মনস্থির করে ফেললেন। বর্ষাবাসের এক পক্ষকাল অতীত না হতেই তাই সে আশ্রমপদ পরিত্যাগ করে গেলেন। আর যাই হোক অহিংসাকে তিনি পরিত্যাগ করতে পারবেন না।

পরিগ্রহ ত হিংসাকেই পুষ্ট করে।

বর্ধমান তাই সেখান হতে চলে গেলেন। আর যাবার সময় মনে মনে সঙ্কল্প করে গেলেন :

যেখানে কারু অপ্রীতির কারণ হই সেখানে থাকব না।

নিরন্ত ধ্যানে নিরত থাকব।

অধিকাংশ সময় মৌনাবলম্বনে কাটাব।

করতলে ভিক্ষা গ্রহণ করব।

গৃহস্থের বিনয় করব না।

তখন বর্ষা ঋতু। মেঘের দল ভেসে চলেছে হিম শিখরে। পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত তারই শ্যাম ছায়া। শ্যামল হয়েছে আরও বনশ্রী। কিন্তু পথ বলতে আর কিছু নেই। সমস্তই জলমগ্ন।

সেই জলমগ্ন পথেই এসেছেন বর্ধমান অস্থিক গ্রামে। আশ্রয় নিয়েছেন গ্রামের বাইরের শূলপাণি যক্ষায়তনে।

এই গ্রামের অস্থিক নামের এক ইতিহাস আছে। কারণ এর নাম আগে অস্থিক ছিল না। ছিল বর্ধমানপুর। কি করে সেই নামের পরিবর্তন ঘটল তার সঙ্গে সেই ইতিহাস জড়িত। শূলপাণি যক্ষায়তনেরও।

সে অনেককাল আগের কথা। কৌশাম্বীর এক শ্রেষ্ঠী ধনবাহ বেরিয়েছেন বাণিজ্য করতে। বাণিজ্যের পথে তিনি এসেছেন বর্ধমানপুর।

সেকালে বর্ধমানপুরে প্রবেশ করতে গেলে বেগবতী নদী পার হতে হত। নদী অবশ্য নামেই বেগবতী কিন্তু এমনিতে ক্ষীণতোয়া। তাই এক বর্ষাকাল ছাড়া বালিয়াড়ি ভেঙে গাড়ী পারে নেওয়া যেত।

কিন্তু সেভাবে মালবোঝাই গাড়ী পারে নেওয়া ছিল কষ্টকর। একমাত্র হৃষ্টপুষ্ট বলদই সেই গাড়ী টানতে পারত। সব বলদে নয়।

শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে পাঁচশ'টি মাল বোঝাই গাড়ী ছিল। কিন্তু পাঁচশ'টি বলদের মধ্যে একটি বলদই ছিল হৃষ্টপুষ্ট। সেই বলদকে দিয়েই তিনি তাই তাঁর সমস্ত গাড়ী পারে নিলেন।

গাড়ী সমস্তই পারে এল। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে সেই বলদটি রক্ত বমন করতে করতে সেইখানেই পড়ে গেল।

শ্রেষ্ঠী দুঃখিত হলেন। কিন্তু তাঁর যাবার তাড়া ছিল। তাই ইচ্ছা থাকলেও সেখানে থেকে বলদটির শুশ্রূষা করতে পারলেন না। গ্রামের লোক ডেকে তাদের হাতে অর্থ দিয়ে বলদটির পরিচর্যা করতে বলে গেলেন।

কিন্তু শ্রেষ্ঠীও যেই চলে গেলেন, গ্রামবাসীরাও সেই অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে যে যার মত ঘরে ফিরে গেল। বলদটির শুশ্রূষা করা ত দূরের, দু'মুঠো ঘাস কি জল পর্যন্ত কেউ দিল না। ফলে বলদটি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে রক্ত বমন করতে করতে সেইখানেই মারা গেল। মরে সে শূলপাণি যক্ষ হল।

শূলপাণি যখন তার নিজের অস্থি নদীর ধারে অসংস্কৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখল তখন তার ক্রোধ হল ও গ্রামবাসীদের বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা মনে করে তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা করল। শূলপাণির কোপে গ্রামে মহামারী দেখা দিল। বহু লোক মারা গেল। বহু লোক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু পালিয়েও যক্ষের হাত হতে নিস্তার ছিল না। যক্ষ তাদের পেছনে ধাওয়া করে কারু পা ধরে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কাউকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে ডলে মারল। গ্রামবাসীরা তখন ভীত হয়ে সে কে ও কেন উপদ্রব করছে সে কথা জিজ্ঞাসা করল।

যক্ষ তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, তোমরা যেমন শ্রেষ্ঠী প্রদত্ত অর্থ আত্মসাৎ করে ঘাস কি জল পর্যন্ত না 'দিয়ে তিলে তিলে আমায় হত্যা করলে এখন তার প্রতিফল ভোগ কর।

গ্রামের লোক তখন কেঁদে পড়ল। বলল, অপরাধ ত আর সকলেই করেনি। তাছাড়া ভুলের শাস্তি তাদের যথেষ্ট হয়েছে। এখন কি হলে সে শান্ত হয়।

সেকথা শুনে যক্ষ একটু নরম হল। বলল, আমি তখনি শান্ত হব যখন তোমরা আমার হাড় একত্রিত করে মাটিতে পুঁতে তার ওপর একটা চৈত্য তুলে দেবে ও সেই চৈত্যে বলদের ওপর বসা এক যক্ষমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে রোজ আমার পুজো করবে।

গ্রামবাসীদের অন্য উপায়ান্তর ছিল না। তাই তারা যক্ষের কথা স্বীকার করে নিয়ে চৈত্য প্রতিষ্ঠা ও মূর্তি স্থাপনা করে একজন পূজারী নিযুক্ত করে দিল।

সেই থেকে বর্ধমানপুরের নাম হল অস্থিক গ্রাম। গ্রামে এখন আর অবশ্য শূলপাণি উপদ্রব করে না। তবে রাত্রে এখনো তার অট্টহাসি শোনা যায়। সে কি হাসি! সেই হাসি রাত্রির নিস্তব্ধতাকে চিরে খানখান করে দেয়। তাই ভয়ে রাত্রে এদিকে কেউ আসে না।

সেই যক্ষায়তনে শুধু আশ্রয় নেওয়াই নয়, বর্ধমান সেইখানেই রাত্রিবাস করবেন স্থির করলেন। এমনকি বর্ষাবাসও। গ্রামের লোক অবশ্য তাঁকে থাকবার অনুমতি দিয়েছে তবে সাবধানও করে দিয়েছে—কেন এখানে থেকে অকারণে প্রাণ দেওয়া। তার চাইতে গ্রামে চলুন। সেখানে থাকবার জায়গার অভাব কী?

কিন্তু বর্ধমান বললেন, না, তার কিছু প্রয়োজন নেই। তাঁর কোনো ভয়ও নেই। তিনি শুধু সেখানে থাকবার অনুমতি চান।

তারপরও বর্ধমান যখন চৈত্যের ভেতরে গিয়ে এক কোণে কায়োৎসর্গ ধ্যানে দাঁড়াতে যাবেন তখনো চৈত্যের পূজারী তাঁকে আবার সাবধান করে দিলে। কিন্তু বর্ধমান তার কথাও কানে নিলেন না। শুধু একটুখানি হাসলেন। কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না।

বর্ধমানের হঠকারিতায় শূলপাণির ভয়ানক রাগ হয়েছে। ভাবছে একি ধরনের ধৃষ্ট মানুষ! গ্রামের লোক কত নিষেধ করল, পূজারী

কত অনুরোধ করল। তবু কারো কথা কানে নিল না। এইখানেই রয়ে গেল। আচ্ছা দেখা যাবে এর কত সাহস।

রাত তখন নিশুতি। সহসা শূলপাণির অট্টহাসিতে গ্রামবাসীদের ঘুম ভেঙে গেল। শূলপাণির অট্টহাসির সঙ্গে তারা অনেক দিনই পরিচিত। কিন্তু এমন অট্টহাসি তারাও কখনো শোনেনি। ভয়ে তারা শয্যার ওপর উঠে বসে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগল। শিশুরা মায়ের বুকে আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল।

সকলেই তখন ভাবছে কেন তারা সেই চৈত্যে বর্ধমানকে থাকবার অনুমতি দিয়েছিল।

কিন্তু বর্ধমান তেমনি নির্বিকার। সেই অট্টহাসিতেও তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল না।

শূলপাণি বর্ধমানকে সামান্য মানুষ ভেবেছিল। ভেবেছিল তার সেই অট্টহাসিতেই বর্ধমানের হয়ে যাবে। কিন্তু সে যখন দেখল বর্ধমান যেমন ধ্যানে দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি ধ্যানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তখন সে ক্রোধে অন্ধ হয়ে হাতী হয়ে শুঁড় দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করল।

পিশাচ হয়ে নখ ও দাঁত দিয়ে তাঁকে ক্ষত বিক্ষত করল।

মারী হয়ে শরীরে রোগ যন্ত্রণার সৃষ্টি করল।

বর্ধমান অবিচলিত ধৈর্যে সেই সমস্ত উপদ্রব সহ্য করলেন।

সহ্য করলেন তাই তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল না।

এই সহ্য করার নামই তিতিক্ষা।

যাঁর তিতিক্ষা আছে তিনি কোনো কিছুতেই বা কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হন না। সমস্ত কিছু অদীনমনে সহ্য করেন।

তিতিক্ষায় বর্ধমান মারী ভয় জয় করলেন।

শূলপাণি পরাজিত হয়ে শান্ত হয়ে গেল।

পরদিন সকালে গ্রামবাসীরা বর্ধমানকে দেখতে এসেছে। বর্ধমানকে দেখবে সে আশা তাদের ছিল না। কিন্তু তারা একি

দেখল। দেখল যেখানে ছিল ভয় সেখানে এখন শান্তি। যেখানে প্রতিহিংসার ক্রূরতা সেখানে সীমাহীন ঔদার্য। যেখানে মূঢ়তার দম্ভ সেখানে স্নিগ্ধতার অপরিমেয় সৌন্দর্য। আরও দেখল—বর্ধমানের পায়ের কাছে শান্ত হয়ে যাওয়া শূলপাণির পূজার্ঘ্য।

গ্রামবাসীরা আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। অনেকদিনের ভয় আজ তাদের কেটে গেল। বলল, এ খুব ভালো হয়েছে যে আত্মিক শক্তিতে দেবার্য শূলপাণি যক্ষকে শান্ত করে দিয়েছেন।

এবারে বর্ধমানকে ঘিরে বসেছে গ্রামবাসীরা। বর্ধমান ধ্যানে তাঁর যে সমস্ত দিব্য দর্শন হয়েছে তার কথা বলছেন। বলছেন :

যেন দেখলাম নিজের হাতে পিশাচকে হত্যা করলাম।

একটা শ্বেতপক্ষী আমার সেবা করছে।

আমাকে সেবা করতে এল একটা চিত্র কোকিল।

একছড়া সুগন্ধি ফুলের মালা।

গোবর্গ আমার সেবা করতে এল।

সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মবন।

সমুদ্রকে আমি যেন অতিক্রম করছি।

উদীয়মান সূর্যের কিরণ যেন প্রসারিত হচ্ছে।

নিজের অন্ত্র দিয়ে আমি যেন মানুষোত্তর পর্বত জড়াচ্ছি।

মেরু পর্বতে আমি উঠে বসেছি।

আশ্চর্য দর্শন। কিন্তু এসবের অর্থ কী? গ্রামবাসীরা কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু বুঝতে পেরেছে নৈমিত্তিক উৎপল। উৎপলও এসেছে যক্ষায়তনের পূজারী ইন্দ্রবর্মা ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে।

উৎপল বলল :

দেবার্য পিশাচকে হত্যা করছেন এর অর্থ হল তিনি মোহনীয় কর্মের নাশ করবেন অচিরেই।

আত্মার আবরণসমূহের মধ্যে মোহ বা মোহনীয় কর্মের আবরণই প্রধান যা জড় ও চেতনের বিভেদকে অনুভব করতে দেয় না ও

আত্মার নিজের স্বভাবের প্রতি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে পরবস্তুতে অহংকারের উদ্ভব করায়।

শ্বেতপক্ষী অর্থাৎ শুক্লধ্যান।

ধ্যান চার প্রকারের। আর্ত, রৌদ্র, ধর্ম ও শুক্ল। আর্ত ও রৌদ্র সংসারী মানুষের ধ্যান। প্রিয় বস্তুকে পাবার ও অপ্রিয় বস্তুকে পরিহার করবার যে ইচ্ছা তা আর্তধ্যান। অন্তকে কষ্ট দেবার, অন্তের জিনিস অপহরণ করবার যে বাসনা তা রৌদ্রধ্যান। সদ্‌চিন্তা সদ্-ভাবনা ধর্মধ্যান। এমন কি আত্মচিন্তাও। শব্দ ও অর্থের অতীত যা রূপাতীত তাতে নিঃশেষে সমাহিত হওয়া শুক্লধ্যান।

চিত্রকোকিল। বিবিধ জ্ঞানময় দ্বাদশাঙ্গ শ্রুতের নিরূপণ করবেন দেবার্য।

গোবর্গ অর্থাৎ শ্রমণ, শ্রমণী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা রূপ সঙ্ঘ।

শ্রমণ ও শ্রমণী সাধু ও সাধ্বী। শ্রাবক ও শ্রাবিকা গৃহস্থ ভক্ত শিষ্য ও শিষ্যা। এঁরাও দেবার্যের সেবা করবেন।

সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মবন। চার রকম দেব সম্প্রদায় দেবার্যের সেবায় উপস্থিত থাকবেন।

ভবনপতি, ব্যন্তর, জ্যোতিষ্ক ও বৈমানিক এই চার ভাগে দেব সম্প্রদায় বিভক্ত। এঁদের মধ্যে বৈমানিক দেবতারাই অধিক শক্তিশালী ও দীর্ঘায়ু।

সমুদ্রকে অতিক্রম করা। দেবার্য সংসার সমুদ্র অতিক্রম করবেন।

উদীয়মান সূর্যের কিরণ প্রসারিত হচ্ছে অর্থাৎ দেবার্য অচিরেই কেবলজ্ঞান লাভ করবেন।

নিজের অন্ত্র দিয়ে মানুষোত্তর পর্বত জড়ানো। দেবার্যের নির্মল যশোরাশি স্বর্গ মর্ত পাতাল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হবে।

মেরু পর্বতে আরোহণ। দেবার্য ধর্ম প্রজ্ঞাপনা করবেন।

এই পর্যন্ত বলে উৎপল থামল। তারপর বর্ধমানের দিকে চেয়ে বলল, দেবার্য, একছড়া সুগন্ধি ফুলের মালা তার তাৎপর্য আমি বুঝতে পারিনি। যদি আপনি বুঝিয়ে দেন।

বর্ধমান বললেন, আমি সর্ব বিরতি ও দেশবিরতি দুই রকম ধর্মই নিরূপিত করব।

সর্ব বিরতি সর্বদা সমস্ত রকমের ত্যাগ—সাধুধর্ম। দেশ বিরতি একটা সীমার মধ্যে আংশিকভাবে ত্যাগ যা গৃহীর জন্য।

বর্ধমান এর পর তাঁর প্রব্রজ্যা জীবনের প্রথম চাতুর্মাস্য পক্ষান্তরে আহার গ্রহণ করে শূলপাণি যক্ষায়তনেই ব্যতীত করলেন।

॥ ২ ॥

চাতুর্মাস্য শেষ হতেই বর্ধমান শূলপাণি যক্ষায়তন পরিত্যাগ করে বাচালার পথ নিলেন।

পথে অবশ্য মোরাক সন্নিবেশে ছিলেন কয়েকদিন।

মোরাকে থাকেন অচ্ছন্দকেরা।

অচ্ছন্দকেরা মন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্বাসী। মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে তাঁরা লোকের উপকার করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

শূলপাণিকে শান্ত করবার জন্য বর্ধমানের আত্মিক শক্তির খ্যাতি তখন চারিদিকে। তাই লোক অচ্ছন্দকদের কাছে না গিয়ে তাঁর কাছে আসে।

এতে অচ্ছন্দকদের রাগ হয়। তাঁরা ভাবেন বর্ধমান তাঁদের জীবিকায় হস্তক্ষেপ করছেন। বর্ধমান আরও বেশী মন্ত্র-তন্ত্র জানেন।

বর্ধমান যদিও জনসমাগম চান না তবু মন্ত্র-তন্ত্রও তিনি কিছু জানেন না। বর্ধমানের আর কিছু হয় নি। তিনি শুধু ক্রোধকে জয় করেছেন।

ক্রোধ জয়ে কী হয়?

ক্ষান্তি।

ক্ষান্তিতে কী হয়?

নিবৃত্তি। তিনি দুঃখকে জয় করেন।

ক্ষমায় হয় প্রহ্লাদ, চিত্তের প্রসন্নতা, সর্বজন মৈত্রী।

সমস্ত কিছুতে তখন ভাব বিশুদ্ধি হয়। ভাব বিশুদ্ধিতে নির্ভয় হয়।

বর্ধমান নির্ভয়। তাই ভয় তাঁর কাছে থাকে না। আপনা হতেই পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায়।

কিন্তু তঁকে পরাস্ত করতে এলেন অচ্ছন্দকেরা।

বর্ধমানের সামনে একখণ্ড কুশ মাটির ওপর রেখে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, এই কুশ দ্বিখণ্ডিত হবে কিনা?

বর্ধমানের মনঃপর্যায় জ্ঞান হয়েছিল প্রব্রজ্যা নেবার সময়ই। তাই তিনি তাঁদের মনোগত ভাব বুঝতে পেরে বললেন, না।

অচ্ছন্দকেরা তখন কুশটিকে দ্বিখণ্ডিত করতে গেলেন। কিন্তু পারলেন না। পরাস্ত হয়ে তখন তাঁরা পালিয়ে গেলেন।

তাঁরা পালিয়ে গেলেন কিন্তু বর্ধমানও সেখানে আর রইলেন না। কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যেখানে কারু অসুবিধার কারণ হই সেখানে থাকব না। তাছাড়া জনসমাগম। জনসমাগম ত ধ্যান-ধারণার অন্তরায়।

বর্ধমান তাই মোরাক পরিত্যাগ করে বাচালার দিকে চলে গেলেন।

বাচালা তখন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর বাচালা ও দক্ষিণ বাচালা। এই দুই বাচালার মধ্যে স্বর্ণ বালুকা ও রৌপ্য বালুকানদী।

বর্ধমান যখন দক্ষিণ বাচালা হয়ে উত্তর বাচালার দিকে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর কাঁধের ওপর যে দেবদূষ্য কাপড়ের আধখানা ফেলা ছিল গাছের কাঁটায় আটকে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

আধখানা?

হ্যাঁ, আধখানা। কারণ সেই কাপড়ের আধখানা ছিঁড়ে তিনি তার আগেই দান করে ছিলেন কুণ্ডগ্রামের সোমকে।

সোম বর্ধমানের পিতা সিদ্ধার্থের মিত্র ছিলেন। কিন্তু মহাদরিদ্র ছিলেন। বর্ধমান যখন কল্পতরু হয়ে ধন দান করলেন তখন তিনি

ঘরে ছিলেন না, ধনার্জনের আশায় অন্যত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তারপর যখন ধনার্জনে নিরাশ হয়ে রিক্ত হাতে ঘরে ফিরে এলেন তখন তাঁর ব্রাহ্মণী তাঁকে ভৎসনা করে বললেন, তুমি কি অভাগা! ঘরের আঙিনায় যখন গঙ্গা প্রকটিত হল তখন তুমি কিনা গিয়ে বসে রইলে দূর বিদেশে। এখনো কিছু সময় আছে। বর্ধমান প্রব্রজ্যা নিতে গেছেন। তুমি তাঁর কাছে যাও। তিনি হয়ত এখনো কিছু ধন তোমায় দান করতে পারেন।

সোম তখন হন্তদন্ত হয়ে জ্ঞাতখণ্ড উদ্যানের দিকে ছুটে গেলেন।

কিন্তু বর্ধমান তখন প্রব্রজ্যা নিয়ে কমরী গ্রামের দিকে বেরিয়ে গেছেন।

সোম তখন তাঁর পিছু ধাওয়া করে পথের মাঝখানে ধরে তাঁকে তাঁর আবেদন জানালেন।

কিন্তু বর্ধমান তখন তাঁকে আর কী দিতে পারেন?

কিছুক্ষণ তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি তাঁকে বললেন, সোম, আমি নিজেই এখন অকিঞ্চন। তাই তোমায় আর কি দিতে পারি? তবু এই নাও বলে কাঁধে ফেলা দেবদূষ্য কাপড়ের আধখানা ছিঁড়ে তাঁকে দান করলেন।

সোম সেই আধখানা কাপড় নিয়ে তুন্নবায়ের কাছে এলেন।

সোমের হাতে সেই বহুমূল্য কাপড় দেখে তুন্নবায় আশ্চর্যান্বিত হল ও সোম সেই কাপড় কোথায় পেয়েছেন জিজ্ঞাসা করল।

সোম সমস্ত কথা খুলে বললেন। কিভাবে সে কাপড় পেয়েছেন তা বিবৃত করলেন।

তুন্নবায় সমস্ত শুনে সোমকে বর্ধমানের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াতে বলল, যখন সেই আধখানা কাপড় তাঁর কাঁধ হতে মাটিতে পড়ে যাবে তখন তিনি যেন তা তুলে নেন। বর্ধমান নিস্পৃহ হবার জন্য সেদিকে আর ফিরে চাইবেন না। সেই আধখানা কাপড় জুড়ে দিলে এই সম্পূর্ণ কাপড়ের মূল্য দাঁড়াবে এক লক্ষ কার্যাপণ। তবে কথা রইল সেই অর্থের অর্ধেক তাঁর, অর্ধেক ওর।

তাই হবে বলে তুন্নবায়ের কথা স্বীকার করে নিয়ে সোম সেই হতে বর্ধমানের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

তারপর সেই আধখানা কাপড় মহাবীরের কাঁধ হতে গাছের কাঁটায় আটকে গিয়ে যখন মাটিতে পড়ে গেল, যখন নিস্পৃহ হবার জন্য বর্ধমান তা আর তুলে নিলেন না, তখন সোম তা তুলে নিয়ে তুন্নবায়ের কাছে নিয়ে এলেন। তুন্নবায় সেই কাপড় দুটো জুড়ে দিলে তিনি তা নিয়ে বর্ধমানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দীবর্ধনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

নন্দীবর্ধন সমস্ত শুনে এক লক্ষ কার্ষাপণ দিয়ে সেই কাপড় ক্রয় করে নিলেন।

বর্ধমান তাই সেদিন হতে সম্পূর্ণ নির্বস্ত্র হলেন।

সেকালে উত্তর বাচালায় যাবার দুটো পথ ছিল। একটা কনকখল আশ্রমপদের ভেতর দিয়ে অন্যটি আশ্রমপদের বাইরে দিয়ে। বাইরের পথটি একটু ঘুর হয় তবু সেই পথেই লোক যাতায়াত করে কারণ আশ্রমপদের মধ্যে দিয়ে যে পথ সে পথ নিরাপদ নয়। সেই পথকে বিপদসঙ্কুল করে রেখেছে দৃষ্টিবিষ এক সাপ। যার দৃষ্টিতেই জীব ভস্ম হয়; দংশনের অপেক্ষা রাখে না। আজ পর্যন্ত তাই সেই পথ দিয়ে প্রাণ নিয়ে কেউ যেতে পারে নি।

কিন্তু বর্ধমানের ভাববিশুদ্ধি হয়েছে। তাই তাঁর কাছে সব পথই সমান। সাপ যতই ক্রূর হোক না কেন তাঁর মনে কোনো ক্রূরতা নেই। তবে সাপ তাঁর আর কী করবে?

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং বৈরত্যাগঃ। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হলে বৈর ত্যাগ হয়। বৈর যদি না থাকে তবে তাঁর ক্ষতিই বা সে করবে কেন?

বর্ধমান তাই আশ্রমপদের মধ্যে দিয়ে যাবার জন্য সেদিকে পা বাড়ালেন।

তাঁকে ওদিকে যেতে দেখে গোপবালকেরা, যারা ওখানে গাই-বাছুর চরাতে এসেছিল, নিষেধ করল। দৃষ্টিবিষ সাপের কথা বলে

তাঁকে নিরস্ত করতে চাইল। বলল, ভালো হয় যদি তিনি বাইরের পথ দিয়ে যান।

কিন্তু বর্ধমান সে পথ হতে নিবৃত্ত হলেন না। শুধু হেসে বললেন, আমার কোনো ভয় নেই।

খানিক হেঁটে বর্ধমান সেই আশ্রমপদের কাছাকাছি এসে গেলেন। দেখলেন যে বিভীষিকার সৃষ্টি করে রেখেছে সেখানে সেই দৃষ্টিবিষ সাপ। আশ্রমপদের কাছাকাছি গাছে পাতা নেই, মাটিতে ঘাস নেই, আকাশে পাখির আনাগোনা নেই—না, কোথাও প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই।

বর্ধমান তখন সেই পথ ছেড়ে আশ্রমপদের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

তারপর সেই অনেককালের কুটিরের ভাঙা দাওয়ায় বসে কায়োৎসর্গ ধ্যানে স্থির হলেন।

দৃষ্টিবিষ সাপটি তখন সেখানে ছিল না, কিছু দূরে ছিল। কিন্তু আশ্রমপদে মানুষ এসেছে সে খবর সে পেয়ে গেল বাতাসে মুহূর্তেই। তাই সে তাড়াতাড়ি আশ্রমপদে ফিরে এল। দৃষ্টি প্রসারিত করে বর্ধমানের দিকে চেয়ে দেখল। এ পথে মানুষ এসেছে তাইতেই তার বিস্ময়ের সীমা নেই। তারপর যখন সে দেখল তার দৃষ্টিপথে পড়েও সে ভস্ম হয়ে গেল না তখন সে আরও আশ্চর্য হয়ে গেল।

সাপটি এতে পরাভূত হয়েছে মনে করে আরও ক্রুদ্ধ হল। ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে দংশন করল।

কিন্তু সে কি দেখল ?

দেখল রক্তের পরিবর্তে সেই ক্ষতস্থান হতে দুগ্ধধারা বেরিয়ে এল।

এতে সে আরও আশ্চর্য, আরও ক্রুদ্ধ হল ও বার কয়েক আরও তাঁর পায়ে দংশন করে দূরে সরে গেল। ভাবল, পাছে বর্ধমান তার গায়ের ওপর এসে পড়েন।

কিন্তু বর্ধমান পড়ে গেলেন না। ধ্যানে যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন—নিশ্চল, নিস্পন্দ। বিষের কোনো প্রতিক্রিয়াই তাঁর শরীরে দেখা গেল না।

সাপটি তখন এক দৃষ্টে বর্ধমানের দিকে তাকিয়ে কি ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে যেন শুনতে পেল বর্ধমান তাকে ডাক দিয়ে বলছেন, উবসম ভো চণ্ডকোসিয়া—হে চণ্ড কৌশিক, শান্ত হও, শান্ত হও।

'চণ্ডকৌশিক' এই নামটি তার কানে যেতেই তার মনে হল এ নামটি যেন তার খুবই পরিচিত। এ নামটি কোথায় যেন সে শুনেছে। তখন তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল এ নাম তারই নাম। তার পূর্বজন্মের নাম। সে জন্মে এই আশ্রমপদের কুলপতির পুত্র হয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছিল। তারপর সে নিজেও কুলপতি হয়েছিল। কিন্তু সে ভারী কোপন-স্বভাব ছিল। সেই স্বভাবের জন্য সবাই তাকে কৌশিক না বলে চণ্ডকৌশিক বলে ডাকত।

আগের জন্মের কথা মনে পড়াতে তার মনে পড়ে গেল তারও আগের আর এক জন্মের কথা। সে জন্মে সে ব্রাহ্মণ ছিল ও খুব দরিদ্র ছিল। তার বাড়ি ছিল কৌশিক নগরে। সেজন্মে তার নাম ছিল গোভদ্র।

কৌশিকের স্মৃতির দরজা যেন খুলে গেছে। সে দেখছে তাঁর স্ত্রী সুভদ্রা যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, দেখ আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছি, যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তখন অনেক অর্থের প্রয়োজন হবে। তুমি কিছু অর্থার্জনের চেষ্টা দেখ। তারপর তাকে নিরুত্তর দেখে একটু থেমে বলছে, এখানে ত অনেক শ্রেষ্ঠী রয়েছেন্ তাঁদের কাছে গিয়ে চাও না, তাঁরা তোমাকে কিছু অর্থ দিতে পারেন।

প্রত্যুত্তরে সে এবারে বলল, সে আমি পারব না। চাইতে আমার লজ্জা করে।

সুভদ্রা তখন বলল, যদি চাইতে লজ্জা করে তবে বারাণসী যাও। সেখানে ধনী তীর্থযাত্রীরা ধর্মার্থে অর্থ দান করেন। তুমি সেখানে অযাচিতভাবে অর্থ পেয়ে যাবে।

সে তখন বলল, সে অনেক দূর। যাব বললেই ত যাওয়া যায় না।

সেকথা শুনে সুভদ্রার রাগ হল। বলল, তবে ঘরে বসে থাকলেই কি কেউ তোমাকে এসে পায়ে ধরে অর্থ দিয়ে যাবে?

না, তা যাবে না। তাই শেষপর্যন্ত সে গিয়েছিল বারাণসী। অর্থও পেয়েছিল। কিন্তু যখন সে দেশে ফিরে এল তখন তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, সন্তানেরও। সূতিকা রোগে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল।

গোভদ্র তখন সংসারে বিরক্ত হয়ে শ্রমণ হয়ে গেল।

তারপর অনেক দিন পরের কথা। সেদিন তিন দিনের উপবাসের পর সে ভিক্ষা নিয়ে শিষ্যসহ উপাশ্রয়ে ফিরে আসছিল। প্রমাদবশে হোক বা অনবধানতার জন্য তার পায়ের তলায় একটি ব্যাঙ কেমন করে এসে মরে গেল। সেদিকে সে লক্ষ্য করেও করল না। শিষ্য সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রতিক্রমণ করতে বললে, সে প্রতিক্রমণ না করে ক্রুদ্ধ হয়ে পথের ধারে পড়ে থাকা মরা অন্য ব্যাঙেদের দিকে দেখিয়ে শিষ্যকে বলল, বল, তবে এসব ব্যাঙও আমিই মেরেছি।

শিষ্য ভৎর্সিত হয়ে তখনকার মত চুপ করে গেল। ভাবল সন্ধ্যাবেলায় তার গুরু প্রতিদিনের নিয়মিত প্রতিক্রমণের সময় অনবধানকৃত এই পাপেরও আলোচনা করে নেবেন।

সন্ধ্যাবেলাতেও যখন সে এই পাপের প্রতিক্রমণ করল না এবং শিষ্য যখন সেকথা আর একবার মনে করিয়ে দিল তখন সে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল ও শিষ্যকে মারবার জন্য যষ্টি নিয়ে তার পেছনে তাড়া করল। ক্রোধে অন্ধ হওয়ায় সামনের পাথরের থাম তার চোখে পড়ল না। সেই থামের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগায় সেইখানেই তার মৃত্যু হল। মরার সময় তার মনে ক্রোধ ছিল তাই পরজন্মে সে কোপন-স্বভাব নিয়েই জন্ম গ্রহণ করল।

কৌশিক জন্মেও তার অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। সেও এক কাহিনী।

কৌশিক সেদিন গভীর বনে কাঠ কাটতে গেছে। তার অনুপস্থিতিতে সেদিন তার তপোবনে শ্বেতাম্বীর রাজপুত্ররা এসেছে। তারা সেদিন সমস্ত দিন তার তপোবনে গাছের ফুল ছিঁড়ে খেলা করেছে।

অথচ এই আশ্রমপদ কৌশিকের খুব প্রিয় ছিল। ফুল তোলা, পাতা ছেঁড়া ত দূরের, সে কাউকে তার গাছে হাত পর্যন্ত দিতে দিত না।

কৌশিক তাই আশ্রমপদে ফিরে এসেই ফুল ছেঁড়া, পাতা ছেঁড়া দেখেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। রাজপুত্ররা তখনো ফিরে যায় নি। আশ্রমপদের আর এক প্রান্তে খেলা করছিল। কৌশিক তাই দেখে কাঠের বোঝা ফেলে দিয়ে কুড়োল নিয়ে তাদের কাটতে ছুটল।

রাজপুত্ররা তাকে আসতে দেখে ভয় পেয়ে ছুট দিল আর সে এক গভীর গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে নিজের কুড়োলের ঘায়ে নিজের মাথাটি ফাটিয়ে ফেলল। সেইখানে সেইভাবে তার মৃত্যু হল।

তার সেই ক্রূরতার জন্য কৌশিক এবার দৃষ্টিবিষ সাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এবং এই আশ্রমপদ তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলে সে এই আশ্রমপদকে যক্ষের মত আগলে রয়েছে।

চণ্ডকৌশিক তখন ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তার চোখের সামনের কালো পর্দাটা যেন সরে গেল। প্রজ্ঞার আলোকে তখন সে দেখতে পেল যে ক্রূরতার জন্য তার এই অধোগতি সেই ক্রূরতাকে সে আজও পরিত্যাগ করেনি। তখন তার বর্ধমানের কথা মনে হল, 'উবসম ভো চণ্ডকোসিয়া—হে চণ্ডকৌশিক, শান্ত হও, শান্ত হও।' না, সে এবার শান্ত হবে। ক্রোধ পরিহার করবে। কোপনতাকে পরিত্যাগ করবে। অধোগতিকে উর্ধ্বগতিতে পরিণত করবে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। তার যে চোখের দৃষ্টিতে জীব ভস্ম হয়, গাছপালা পুড়ে ছাই হয়, সে চোখ সে আর খুলবে না, সেই চোখের দৃষ্টিতে কারু দিকে সে আর চেয়ে দেখবে না।

চণ্ডকৌশিক তখন পরিশুদ্ধ মন নিয়ে বর্ধমানকে প্রণাম করে তার বিবরের মধ্যে যে মুখ ঢোকাল সে মুখ আর সে বার করল না। এমনকি যখন আশপাশের গ্রামের লোক তার এই পরিবর্তনে তাকে দেবতাজ্ঞানে তার গায়ে এসে ঘী ও মধু লেপন করতে লাগল,

তখনো না। সেই মিষ্টান্নের গন্ধে, ঘী ও মধুর সৌরভে দলে দলে পিঁপড়ে এল, তার দেহকে খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল, তখনো না। সেই অসহ্য বেদনা সহ্য করে নিজের পূর্বসঞ্চিত কর্ম ক্ষয় করে এভাবে দিব্য ভাবনায় সে দিব্যগতি লাভ করল।

আর বর্ধমান? তার দেহান্ত পর্যন্ত সেইখানে অপেক্ষা করে উত্তর বাচালার পথ নিলেন।

উত্তর বাচালা হতে বর্ধমান এলেন সেয়বিয়া অর্থাৎ শ্বেতাম্বী। কেকয়ের রাজধানী।

শ্বেতাম্বীতে তখন রাজত্ব করেন রাজা প্রদেশী।

প্রদেশী প্রথম জীবনে নাস্তিক ছিলেন। পরে ভগবান পার্শ্বনাথের পরম্পরাগত শিষ্য কেশীকুমারের সম্পর্কে এসে আস্তিক বা আত্মায় বিশ্বাসী হন।

তাই প্রদেশী যখন বর্ধমানের আসার খবর পেলেন তখন সপরিবারে এলেন তাঁর বন্দনা করতে।

ফলে প্রদেশীর অধীনস্থ রাজ-পুরুষেরাও তাঁর ওখানে যাতায়াত শুরু করলেন। বর্ধমান তাই সেখানে অবস্থান করতে ইচ্ছে করলেন না। সেখান হতে চলে গেলেন সুরভিপুর, সুরভিপুর হতে রাজগৃহ।

রাজগৃহের সঙ্গে কারু পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। মগধের রাজধানী রাজগৃহ। কিন্তু সুরভিপুর হতে রাজগৃহে যেতে হলে গঙ্গা নদী অতিক্রম করতে হয়। বর্ধমান তাই খেয়া ঘাটে এলেন। তারপর সিদ্ধদত্তের নৌকায় উঠে বসলেন।

নৌকায় আরও অনেক যাত্রী ছিল। তার মধ্যে ছিল নৈমিত্তিক খেমিল।

মাঝিরা যখন নৌকো খুলে দিয়েছে, নৌকো যখন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে, তখন ডান দিক হতে সহসা চীৎকার দিয়ে উঠল এক উলূক।

সেই চীৎকার শুনে খেমিল বলে উঠল, এই চীৎকারে নৌকো-ডুবি ও এতগুলি প্রাণীর জীবনহানির আশঙ্কা সূচিত হচ্ছে। মাঝি, নৌকো শীগ্‌গির কূলে নাও।

কিন্তু মাঝি নৌকো কূলে নিল না। প্রবল স্রোতে নৌকো ততক্ষণে কূল হতে অনেক দূরে এসে পড়েছে।

তবে উপায় ?

উপায় একমাত্র ভগবান।

হঠাৎ খেমিলের চোখ গিয়ে পড়ল বর্ধমানের ওপর।

যাত্রীরা উলূকের ডাক কেউ শুনে ছিল, কেউ শোনে নি। কিন্তু খেমিলের কথা সকলেই শুনেছিল। তাই সেই নিয়ে তারা মাঝিদের সঙ্গে বচসা করতে শুরু করল। কিন্তু খেমিল এবার তাদের সবাইকে থামিয়ে দিল। তারপর বর্ধমানের দিকে চেয়ে বলল, উনি যখন সঙ্গে রয়েছেন তখন আমাদের কিছুরই আশঙ্কা নেই। ঝড় উঠবে নিশ্চয়ই তবে নৌকো-ডুবি হবে না।

খেমিলের কথাই সত্যি হল। যে একখণ্ড মেঘ আকাশের পশ্চিম প্রান্তে পড়ে ছিল তা দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলল। সোঁ-সোঁ করে ঝড় উঠল। নদীর জল কালো হল। তার পরমুহূর্তেই প্রলয় ঘটে গেল। ঝড়ের সে কি বেগ আর জলের গর্জন! মাঝিরা নৌকো সামাল দিতে পারল না। প্রবল হাওয়ায়, জলের বেগে তা কুটোর মত ভেসে গেল।

নৌকোয় আবার কোলাহল উঠল। কেউ খেমিলের দোষ দিল ত কেউ মাঝিদের। প্রাণের আশঙ্কায় সকলে কেমন যেন অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

আর বর্ধমান ?

বর্ধমান সেই কোলাহল ও চীৎকারের মধ্যে এক কোণে যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে রইলেন। যেন কোথাও কিছু হয় নি। ঝড় ওঠে নি। নদী প্রমত্ত হয় নি, জীবনের আশঙ্কা দেখা দেয় নি। তন্ময় উদ্গত।

সে অনেককাল আগের কথা। বর্ধমানের ইহজীবনের নয় বহু জন্ম পূর্বের কথা। সে জন্মে বর্ধমান রাজগৃহের রাজা বিশ্বনন্দীর ভাই বিশাখভূতির পুত্র বিশ্বভূতি রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

বিশ্বভূতি যখন যৌবনপ্রাপ্ত হলেন তখন রাজগৃহের বাইরে পুষ্পকরণ্ডক নামে যে উদ্যান ছিল সেই উদ্যানে অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে প্রায়ই বিহার করতে আসতেন। কিন্তু বিশ্বভূতির সেই ঐশ্বর্য, সেই সুখভোগ রাণী মদনলেখার দাসীদের চক্ষুঃশূল হল। তাই তারা একদিন মহাদেবীর কাছে গিয়ে নিবেদন করল, দেবী, যদিও রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী কুমার বিশাখনন্দী তবু কুমার বিশ্বভূতি পুষ্পকরণ্ডক বনের যে সুখ ও বৈভব ভোগ করছেন তার তুলনায় আপনার পুত্রের সুখ ও বৈভব কিছুই নয়। আপনার পুত্র নামেই যুবরাজ, বাস্তবে বিশ্বভূতিই যৌবরাজত্ব ভোগ করছেন।

দাসীদের কথা মদনলেখার মনে নিল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন বিশ্বভূতিকে যেমন করে হোক পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান হতে বার করতে হবে ও সেই উদ্যানে বিশাখনন্দীর প্রবেশের উপায় করে দিতে হবে।

রাণী মদনলেখা সেকথা রাজা বিশ্বনন্দীকে বললেন। কিন্তু রাজা সেকথা স্বীকার করলেন না। বললেন, আমাদের এই কুলনিয়ম। একবার যদি কেউ পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে প্রবেশ করে তবে যতক্ষণ না সে নিজে হতে বার হয়ে আসে ততক্ষণ তাকে বাইরে আসতে বলা যাবে না বা অন্যে সেই বনে প্রবেশ করতে পারবে না। সীতান্তে কুমার বিশ্বভূতি যখন সেই উদ্যানে প্রবেশ করেছে তখন কুমার বিশাখনন্দীকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না সে নিজে উদ্যান হতে বার হয়ে আসে।

কিন্তু মদনলেখা এতে সন্তুষ্ট হলেন না। বিশ্বনন্দীর ওপর চাপ দেবার জন্য তিনি কোপগৃহে প্রবেশ করলেন।

বিশ্বনন্দী উভয় সঙ্কটে পড়ে মন্ত্রীদের শরণাপন্ন হলেন।

মন্ত্রীরা সমস্ত দিক বিবেচনা করে বিশ্বনন্দীকে এই উপদেশ দিল।

বলল, মহারাজ, সীমান্ত হতে দূত বিদ্রোহের মিথ্যা সংবাদ নিয়ে আসুক। আপনি তখন বিদ্রোহ দমনের জন্য যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করুন। কুমার বিশ্বভূতি যুদ্ধোদ্যমের সংবাদ পেয়ে কিছুতেই পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে বসে থাকবে না। সে বিদ্রোহ দমনে প্রস্থান করলে কুমার বিশাখনন্দী উদ্যানে প্রবেশ করবে। এতে উভয় দিক রক্ষা হবে।

রাজার এ পরামর্শ মনঃপূত হল। দূত মন্ত্রীদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে সীমান্ত হতে বিদ্রোহের সংবাদ নিয়ে এল। রাজা সেই সংবাদের ভিত্তিতে বিদ্রোহ দমনের জন্য যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করলেন।

পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানের নিভৃতে যেখানে বাইরের কোনো শব্দই প্রবেশ করে না, যেখানে পুর-সুন্দরীদের কলহাস্যে ও নূপুর নিক্বণের ধারাবর্ষী তরল প্রবাহে বিশ্বভূতির চিত্ত লগ্ন হয়ে থাকে সেখানে সহসা রণভেরীর বজ্রনির্ঘোষ একটু যেন উচ্চকিত হয়েই ভেঙে পড়ল। কুমার বিশ্বভূতি সুখতন্দ্রা হতে সহসা জাগ্রত হয়ে তাম্বূলকরঙ্ক-বাহিনীকে পাশে সরিয়ে দিয়ে পুষ্পকরণ্ডক বনের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। পৌরজনদের জিজ্ঞাসা করলেন, ও কিসের শব্দ। উত্তর পেলেন, মহারাজ বিশ্বনন্দী সীমান্তের বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধ যাত্রা করছেন।

বিশ্বভূতি ভীরু বা দুর্বল ছিলেন না। তাই তখনি জ্যেষ্ঠতাত বিশ্বনন্দীর কাছে গিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করে নিজে সেই সৈন্য বাহিনীর কর্তৃত্ব নিয়ে বিদ্রোহ দমনে গমন করলেন।

কিন্তু বিশ্বভূতি সীমান্ত অবধি এসেও কোথাও কোনো বিদ্রোহের চিহ্ন দেখতে পেলেন না। তখন প্রতিনিবৃত্ত হয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

বিশ্বভূতি রাজধানীতে ফিরে এসেই আবার পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে প্রবেশ করতে গেলেন। কিন্তু এবারে প্রহরীরা তাঁকে বাধা দিল। বলল, কুমার বিশাখনন্দী অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে এখন উদ্যানের ভেতরে রয়েছেন।

বিশ্বভূতি তখন বুঝতে পারলেন, এই বিদ্রোহ, এই যুদ্ধোদ্যম এ সমস্তই তাঁকে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান হতে বার করবার জন্য যাতে বিশাখনন্দী সেই উদ্যানে প্রবেশ করতে পারে। ক্রোধে তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ও কপিত্থ গাছে মুষ্ট্যাঘাত করে প্রহরীদের বলে উঠলেন, কপিত্থ ফলে যেমন গাছের তলায় মাটি আবৃত হয়ে গেছে তেমনি আমি তোমাদের মুণ্ডে এই মাটি আবৃত করে দিতাম কিন্তু জ্যেষ্ঠতাতের গৌরব করি বলে তোমরা রক্ষা পেয়ে গেলে।

এই ঘটনায় কুমার বিশ্বভূতির সংসারের প্রতি কেমন যেন বিতৃষ্ণা এসে গেল। তিনি তখন সংসার পরিত্যাগ করে স্থবির আর্যসংভূতের কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

রাজা বিশ্বনন্দী কুমারের সংসার পরিত্যাগে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর ক্ষমা যাচনা করলেন ও পরে নিজেও শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

তারপর অনেককাল পরের কথা। কুমার বিশাখনন্দী মথুরায় এসেছেন সেখানকার রাজকন্যাকে বিবাহ করবার জন্য।

সংযোগবশতই মুনি বিশ্বভূতিও তখন মথুরাতেই অবস্থান করছিলেন। তিনি সেদিন একমাসের উপবাসের পর ভিক্ষা নিয়ে উপাশ্রয়ে ফিরছিলেন সেই পথ দিয়ে যে পথের ধারে বিশাখনন্দীর স্কন্ধাবার পড়েছিল।

বিশাখনন্দী কিন্তু বিশ্বভূতিকে প্রথমে চিনতে পারেননি কারণ তাঁর শরীর অনেক কৃশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর এক অনুচর তাঁকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, কুমার, দেখুন দেখুন, ওই বিশ্বভূতি।

বিশ্বভূতির প্রতি বিশাখনন্দীর মনে একটা জাতক্রোধ ছিল। তাই বিশ্বভূতির নাম কানে যেতেই সরোষে যেই ওদিকে তাকাতে যাবেন তেমনি দেখতে পেলেন এক নবপ্রসূতা গাভী শৃঙ্গপ্রহারে বিশ্বভূতিকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। সেই দৃশ্য দেখে তিনি উচ্চহাস্য করে সেখান হতেই বলে উঠলেন, বিশ্বভূতি, কপিত্থগাছে মুষ্ট্যাঘাত করে কপিত্থ ফল ঝরাবার মত শক্তি এখন তোমার কোথায় গেল?

সেই কটূক্তি বিশ্বভূতির কানে গেল। তিনি ফিরে চাইতেই তাঁর

দৃষ্টি বিশাখনন্দীর ওপর পতিত হল। তিনি একমাস অনাহারে ছিলেন তাই স্বভাবতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তার ওপর নবপ্রসূতা গাভীকে পাশ কাটাতে গিয়েই তিনি তার শৃঙ্গপ্রহারে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে তিনি নির্বীর্য হয়ে গেছেন। বিশ্বভূতি তখন সেই গাভীকে শৃঙ্গ দিয়ে ধরে মাথার ওপর চক্রের মত ঘোরাতে ঘোরাতে বিশাখনন্দীকে ডাক দিয়ে বললেন, বিশাখ-নন্দী, দুর্বল সিংহের বলও কখনো শৃগাল লঙ্ঘন করতে পারে না।

বিশ্বভূতি সেখান হতে প্রতিনিবৃত্ত হলেন। মনে মনে বললেন, এই দুরাত্মা এখনো আমার প্রতি ক্রোধপরায়ণ। সংযম ও ব্রহ্মচর্যে আমি যদি কোনো শ্রেয় লাভ করে থাকি তবে আমি যেন পরজন্মে অমিত বলের অধিকারী হই।

বিশ্বভূতি এই সঙ্কল্পের জন্য কখনো পশ্চাত্তাপ করেন নি। তাই মৃত্যুর পর পোতনপুরে রাজা প্রজাপতির পুত্র ত্রিপৃষ্ঠ বাসুদেব হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

বিশাখনন্দীও তাঁর ক্রূর প্রবৃত্তি ও পরিহাসের জন্য পরজন্মে সিংহ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

পূর্ব শত্রুতার জন্য ত্রিপৃষ্ঠ এই সিংহকে নিরস্ত্র অবস্থায় একক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নিহত করলেন।

বিশাখনন্দী সিংহদেহ পরিত্যাগ করবার পর সুদংষ্ট্র নামে বায়ু-দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

নৌকো যখন মাঝগঙ্গায় এল তখন সুদংষ্ট্রের দৃষ্টি বর্ধমানের ওপর পতিত হল।

ত্রিপৃষ্ঠ জন্মে বর্ধমান তাঁকে হত্যা করেছিলেন সে কথা মনে হওয়ায় প্রতিশোধ নেবার বাসনায় তিনি নদীতে ঝড় তুলে দিলেন।

কিন্তু সেই ঝড় বর্ধমানকে একটুও বিচলিত করতে পারল না। বায়ু-দেবতা সুদংষ্ট্রের তাণ্ডব বর্ধমানের মেরুর মত ধৈর্যের কাছে পরাস্ত হয়ে শান্ত হয়ে গেল।

খেমিলের প্রথম কথার মত তাই দ্বিতীয় কথাও সত্যি হল। নৌকো কূলে এসে লাগল। নূতন জীবন লাভ করে যাত্রীরাও কূলে নেমে যে যার মত ঘরে চলে গেল।

বর্ধমান সকলের শেষে নামলেন। নেমে থাম্বুকের পথ নিলেন।

বর্ধমানের চলে যাবার পরেই নদী সৈকতে এল সামুদ্রিক শাস্ত্রী পুষ্য।

পুষ্যের দৃষ্টি বর্ধমানের পায়ের ছাপের ওপর পড়ল। সে দেখল, সেখানে ধ্বজ ও অঙ্কুশের চিহ্ন।

পুষ্য মনে মনে বিচার করল যার পায়ে ধ্বজ ও অঙ্কুশের চিহ্ন সে কখনো রাজচক্রবর্তী না হয়ে যায় না।

কিন্তু আবার তখনি ভাবল, যে রাজচক্রবর্তী সে খালি পায়ে নদী সৈকত দিয়ে যাবে কেন?

তখন তার হঠাৎ মনে হল হয়ত কোনো কারণে তাঁর কোনো বিপদ হয়ে থাকবে।

পুষ্য তখন বিচার করতে লাগল—তার জীবনে এ যেন এক মহৎ সুযোগ এসেছে। যদি তাঁকে তাঁর বিপদে সাহায্য করবার কোনো সময় থেকে থাকে তবে এই। মহৎ ব্যক্তি অন্যের কৃত উপকার কখনো বিস্মৃত হন না। কে জানে এ হতে তার ভাগ্যের দরজা খুলে যাবে কিনা।

পুষ্য তখন সেই পায়ের ছাপ অনুসরণ করে সেখান হতে থাম্বুক সন্নিবেশে এসে উপস্থিত হল।

শুধু পায়ের ছাপই নয়, দেখল বর্ধমানের সমস্ত গায়ে রাজ-চক্রবর্তীত্বের লক্ষণ।

কিন্তু পুষ্য যা দেখবে বলে এসেছিল তা দেখতে পেল না। দেখল এক নগ্নদেহ শ্রমণ কায়োৎসর্গ ধ্যানে এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। একে সে কিভাবে সাহায্য করতে পারে।

পুষ্যের নৈরাশ্যের সীমা নেই। নৈরাশ্য ভাগ্যের জন্যই নয়,

নৈরাশ্য তার সামুদ্রিক শাস্ত্রই যে মিথ্যা হয়ে গেল তার জন্য। যার রাজচক্রবর্তী রাজা হবার কথা সে কিনা দীন, পথের ভিক্ষুক।

যে শাস্ত্র মিথ্যা সে শাস্ত্র ঘরে রেখে লাভ কি?

পুষ্য তাই ঘরে ফিরে গেল ও তার আজীবন সঞ্চিত গ্রন্থগুলো একে একে টেনে এনে আগুনে ফেলতে লাগল।

পুষ্যের স্ত্রী স্বামীর কাণ্ড দেখে বলল, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

পুষ্য তখন সমস্ত কথা খুলে বলল। বলল, যে শাস্ত্র মিথ্যা তাতে তার প্রয়োজন নেই।

সমস্ত শুনে পুষ্যের স্ত্রী বলল, যে লক্ষণ রাজচক্রবর্তীর সে লক্ষণ ত তীর্থংকরেরও। উনি হয়ত ভাবী তীর্থংকর।

পুষ্য সেকথা শুনে গ্রন্থগুলো আগুনে ফেলা হতে নিরস্ত হল। দগ্ধ গ্রন্থের জন্য তার চিত্ত তখন অনুশোচনায় ভরে উঠল। ভাবল, এ কথা তার প্রথমেই কেন মনে হয়নি!

•

থাদুক হতে বর্ধমান এলেন রাজগৃহে। কিন্তু রাজধানীতে তিনি অবস্থান করলেন না। চলে এলেন বাহিরিকা নালন্দায়। সেখানে এক তন্তুবায়শালায় আশ্রয় নিলেন।

নালন্দা সেদিন ইতিহাসের সেই বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি অর্জন করেনি। সেদিন তা ছিল মগধের রাজধানী রাজগৃহের শাখাপুর মাত্র। আজকের পরিভাষায় উপনগর। তবু নালন্দার আর এক ধরনের খ্যাতি ছিল। সূত্র কৃতাঙ্গে লেখা রয়েছে অর্থীদের যা যথেপ্সিত দান করে তাই নালন্দা।

তাই নালন্দায় বর্ষাবাস করবার জন্য অন্য তীর্থিক সাধু ও সন্ন্যাসীরাও এসে থাকেন।

সেই তন্তুবায়শালায় এসে আছেন আর একজন নবীন শ্রমণ। নাম গোশালক। মংখলীপুত্র বলেও তিনি আবার পরিচিত।

মংখলীর পুত্র ছিলেন বলেই তাঁর নাম মংখলীপুত্র। আর গোশালক নামের কারণ তিনি গোশালে জন্মগ্রহণ করেন।

মংখলী সম্ভবতঃ মংখ ছিলেন। চিত্র প্রদর্শন তাঁর জীবিকা ছিল। তাই জীবিকার জন্য তাঁকে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতে হত।

এমনি পরিভ্রমণ করতে করতে তিনি একবার এসে উঠেছিলেন শরবন সন্নিবেশের এক ব্রাহ্মণের গোশালে। সেইখানে তাঁর স্ত্রী ভদ্রা গোশালকের জন্ম দেন।

গোশালক শৈশবে একটু উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন। তারপর যখন একটু বড় হলেন তখন পিতামাতাকে পরিত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে চিত্র প্রদর্শন করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। শেষে সাধু-সন্ন্যাসীদের সর্বত্র সমাদর দেখে শ্রমণ হয়ে ইতস্ততঃ প্রব্রজন করতে লাগলেন।

এমনি প্রব্রজন করতে করতেই তিনি এবার এসেছেন নালন্দায়।

গোশালক প্রথম হতেই বর্ধমানের দিকে আকৃষ্ট হলেন। যদিও বর্ধমানের এখন সেই কান্তি নেই, উপবাস ও তপশ্চর্যায় তাঁর শরীর কৃশ হয়েছে তবু তাঁর চারপাশে রয়েছে জ্যোতির এক পরিমণ্ডল। তাই প্রথম দর্শনেই চিত্ত শ্রদ্ধায় কেমন যেন নত হয়ে আসে।

তার ওপর গোশালক আরও দেখলেন তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনা। দেখলেন বর্ধমান বর্ষাবাসের প্রথম মাসে কোনো আহার্যই গ্রহণ করলেন না। রাত্রে ধ্যানে প্রায় বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন। দংশমশক, শীতাতপের নির্যাতন সমভাবে সহ্য করলেন। দেখে গোশালক মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল তিনি যেন এতদিন এমনি একজন আচার্যের সন্ধানে ছিলেন। তাই যেদিন মাসান্তের উপবাসের পর বর্ধমান আহার্য ভিক্ষা নিয়ে ফিরে এলেন সেদিন গোশালক তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁকে তিনবার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে বললেন, দেবার্য, আজ হতে আমি আপনার শিষ্য।

বর্ধমানের সেদিন মৌন ছিল। তাই তিনি তার কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না। আর গোশালক সেই মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিয়ে তাঁর পরিচর্যায় নিরত হলেন।

গোশালক একটু উদ্ধত হলেও ছিলেন সরল প্রকৃতির। তাঁর মধ্যে বালকসুলভ চপলতা ছিল ও অকারণ কৌতূহল। তা ছাড়া তিনি

নিয়তিবাদী ছিলেন—অর্থাৎ যা ঘটেছে তা নিয়তির জন্যই। নিয়তিতে যা লেখা রয়েছে তা না হয়ে যায় না। পুরুষকার কথার কথা মাত্র। মানুষ যা ঘটবার তা রোধ করতে পারে না।

কর্মফলে বিশ্বাস এক, নিয়তিবাদ আর। মানুষ যেমন কর্ম করে তার ফল ভোগ তাকে করতে হয়, ইহজীবনে নয়ত পরজীবনে। কিন্তু কি ধরনের কর্ম সে করবে তা তার ইচ্ছাধীন। সেই পুরুষকার। যা হবার হবে বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা নয়, প্রতিনিয়ত নিজেকে সৎপথে নেবার জন্য চারিত্রের নির্মাণ। পুরুষকারকে যদি স্বীকার না করি তবে কোনো সাধনাই হয় না। বর্ধমান কর্মফলে বিশ্বাস করেন কিন্তু তার চাইতেও বেশী বিশ্বাস করেন পুরুষকারে। বলেন, বারবার প্রয়াস করো। কারণ প্রয়াসের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার মধ্যে দিয়ে না গিয়ে কে কবে আত্মজ্ঞান লাভ করেছে? সুপ্ত সিংহের মুখে কি হরিণ আপনা হতেই এসে প্রবেশ করে?

কিন্তু বর্ধমানের সম্পর্কে এসে কোথায় গোশালকের নিয়তিবাদ নষ্ট হয়ে যাবে, তা না হয়ে সেই নিয়তিবাদই যেন আরও একটু দৃঢ় হল।

কার্তিক মাসের পূর্ণিমা। গোশালক ভিক্ষাচর্যায় চলেছেন। যাবার সময় বর্ধমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, আজ ভিক্ষাচর্যায় আমি কি পাব?

বর্ধমান বললেন, কদ্রব চালের বাসি ভাত, টক ঘোল ও অচল মুদ্রা। কদ্রব এক ধরনের নিকৃষ্ট চাল।

গোশালকের সেকথা বিশ্বাস হল না। তা ছাড়া তাঁর মনের ইচ্ছা বর্ধমানকে একটু যাচাই করা। সেই সঙ্গে নিয়তিবাদকেও। নিয়তিতে যদি তাই থাকে তবে তাই তিনি পাবেন। বর্ধমানের কথাও সত্য হবে। কিন্তু এর অন্যথা করবার চেষ্টাই তিনি করবেন। তাই ভেবে ভেবে সেদিন তিনি ভিক্ষায় ধনী শ্রেষ্ঠী পাড়ার দিকে গেলেন।

ধনী শ্রেষ্ঠী পাড়ায় সেদিন গোশালক ভিক্ষা পেলেন না।

গোশালক ভাবলেন, এও মন্দের ভালো। তিনি যে ভিক্ষা পেলেন না এতে বর্ধমানের কথা মিথ্যা হবে, নিয়তিবাদও। তাই ভিক্ষা না নিয়েই তিনি তন্তুবায়শালায় ফিরবেন স্থির করলেন।

তাই ফিরছিলেনও। কিন্তু মাঝপথ হতে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল এক কুমোর। তারপর শ্রদ্ধাভরে ভিক্ষা দিল বাসি কদ্রব চালের ভাত, টক ঘোল ও অচল মুদ্রা।

মুদ্রা অবশ্য সে অচল ভেবে দেয় নি কিন্তু কার্যতঃ তা অচল বলেই প্রমাণিত হল।

গোশালকের এতে যেমন বর্ধমানের ওপর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল তেমনি নিয়তিবাদের ওপরও। নিয়তিতে যা লেখা রয়েছে তা না হয়েই যায় না। ভাগ্য আগে হতেই নিরূপিত হয়ে আছে।

বর্ধমান এই চাতুর্মাস্যের প্রথম মাসের উপবাসের পারণ করেছিলেন বিজয় শ্রেষ্ঠীর ঘরে, দ্বিতীয় মাসের আনন্দ শ্রাবকের ঘরে, তৃতীয় মাসের সুনন্দের ঘরে ও চতুর্থ মাসের নালন্দা হতে পরিব্রাজন করে কোল্লাগে ব্রাহ্মণ বহুলের ঘরে।

॥ ৩ ॥

নালন্দা হতে বর্ধমান যখন পরিব্রাজন করে গেলেন গোশালক তখন তন্তুবায়শালায় ছিলেন না। ভিক্ষাচর্যায় গিয়েছিলেন। ভিক্ষাচর্যা হতে ফিরে এসে তিনি দেখলেন যে বর্ধমান সেখানে নেই, তখন ভাবলেন হয়ত তিনি ভিক্ষাচর্যায় গেছেন। কিন্তু ভিক্ষাচর্যা হতে ফিরে আসার সম্ভাব্য সময়ও যখন উত্তীর্ণ হয়ে গেল তখন তিনি তাঁর সন্ধানে নগরে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর কোনো সন্ধান পেলেন না। তখন হতাশ হয়ে আবার তন্তুবায়শালায় ফিরে এলেন।

কিন্তু সেই তন্তুবায়শালায় তিনি আর অবস্থান করলেন না। নিজের সমস্ত সঞ্চয় দান করে মুণ্ডিতমস্তক ও নগ্ন হয়ে বর্ধমানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

সৌভাগ্যবশতঃ গোশালকও কোল্লাগের পথ নিলেন। তাই কিছুদূর যেতে না যেতেই তিনি পথে এক মহামুনির কথা শুনতে পেলেন। গোশালকের তখন বুঝতে বাকী রইল না যে এই মহামুনিই বর্ধমান ও তিনি এখন কোল্লাগে অবস্থান করছেন।

গোশালক তাঁর সন্ধানে যেই নগরে প্রবেশ করতে যাবেন অমনি বর্ধমানের সঙ্গে পথের ওপরই তাঁর দেখা হয়ে গেল। গোশালক তখন তাঁকে প্রণাম করে বললেন, ভগবন্, এই দীন আপনার শিষ্য। তাকে গ্রহণ করুন।

বর্ধমান তাঁকে স্বীকার করে নিলেন। বললেন, গোশালক তোমার যেমন অভিরুচি।

কোল্লাগ হতে গোশালকসহ সুবর্ণখলের দিকে চলেছেন বর্ধমান।

আভীর পল্লীর মধ্যে দিয়ে পথ। সেই পথের ধারে একখানে প্রকাণ্ড এক মহীরুহের তলায় মাটির হাঁড়িতে আভীরেরা দুধ জ্বাল দিচ্ছিল। দুধ ক্ষীর হবে।

গোশালক তাই দেখে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। বর্ধমানের দিকে চেয়ে বললেন, দেবার্য, এবেলা এখানে অবস্থান করলে হয় না? তা হলে ভিক্ষেটা এখানেই হয়ে যায়।

শুনে বর্ধমান বললেন, না গোশালক। জিহ্বার রসলোলুপতা শ্রমণ জীবনের বাধক। তাই আমি এখানে অবস্থান করব না। এগিয়ে যাব। তা ছাড়া—

তা ছাড়া এই দুধ শেষ পর্যন্ত ক্ষীর হবে না।

ক্ষীর হবে না?

না, গোশালক।

তবে দেবার্য, আপনি এগিয়ে যান। আমি শেষপর্যন্ত দেখে আসব।

বর্ধমান তাই এগিয়ে গেলেন। আর গোশালক সেইখানে রয়ে গেলেন। তিনি দেখবেন যা হবার তাই হয় কিনা। দুধ কিভাবে ক্ষীর না হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

গোশালক সেখানে শুধু অবস্থানই করলেন না, আভীরদের সতর্ক করে দিলেন। বললেন, ওই মহাত্মা বলে গেলেন, এই দুধ ক্ষীর হবে না।

শুনে আভীরেরা হাসল। বলল, দুধ কিভাবে ক্ষীর হবে তা তাদের জানার কথা, মহাত্মার নয়।

কিন্তু বর্ধমানের কথাই সত্যি হল। আগুনের তাপে সেই হাঁড়ি এক সময় কী করে ফেটে গেল। ফেটে গিয়ে সমস্ত দুধ আগুনে পড়ে গেল।

দুধ আগুনে পড়তেই গোশালক বর্ধমান যেদিকে গিয়েছিলেন সেই দিকে তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। মনে মনে বললেন, নিয়তিকে কেউ ঠেকাতে পারে না। তার বিধান অনতিক্রমণীয়।

সুবর্ণখল হতে বর্ধমান এলেন ব্রাহ্মণগ্রামে সেখানে ভিক্ষায় পর্যুষিত অন্ন পেলেন। অদীন মনে তাই গ্রহণ করলেন। তারপর নানাদেশ পরিভ্রমণ করে বর্ষাবাসের আগ দিয়ে এলেন চম্পায়।

চম্পা সেকালে অঙ্গ দেশের রাজধানী ছিল।

বর্ধমান চম্পায় এবার বর্ষাবাস ব্যতীত করবেন। তৃতীয় বর্ষাবাস।

এই বর্ষাবাসে তিনি দু'মাস পরপর মাত্র দু'বার অন্নগ্রহণ করলেন।

বর্ষাবাস শেষ হতে চম্পা পরিত্যাগ করে বর্ধমান এলেন কালায় সন্নিবেশ। সেখানে একরাত্রি অবস্থান করে পরদিন সকালে চলে গেলেন পত্তকালয়। পত্তকালয় হতে কুমারাক সন্নিবেশে। কুমারাক সন্নিবেশ চম্পকরমণীয় উত্থানে তাঁরা স্থিত হলেন।

কুমারাকে সেদিন ভিক্ষাচর্যায় গেছেন গোশালক। হঠাৎ পথের মাঝখানে তাঁর দেখা হয়ে গেল মুনিচন্দ্র স্থবিরের শিষ্যদের সঙ্গে।

তাঁরাও তখন কুমারাকে এসে কুবণর কামারের কর্মশালায় অবস্থান করছিলেন।

মুনিচন্দ্র ভগবান পার্শ্বনাথের শিষ্যসম্প্রদায়ের এক আচার্য ছিলেন। এঁদের বস্ত্র ও পাত্রাদি রাখা সম্বন্ধে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। তাই এঁরা নানা বর্ণের বস্ত্র পরিধান করতেন ও ভিক্ষাচর্যার জন্য পাত্রাদি উপকরণ বহন করতেন।

গোশালকের দৃষ্টি তাঁদের বিচিত্র বেশ ও পাত্রাদি উপকরণের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি কৌতূহলী হয়ে তাঁদের তাই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কে?

আমরা ভগবান পার্শ্বনাথের শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমণ নিগ্রন্থ।

নিগ্রন্থ?

গোশালক মনে মনে ভাবলেন, যাঁদের এত এত বস্ত্রাদির উপকরণ তাঁরা কেমন নিগ্রন্থ?

গোশালকের যদি বাক সংযম থাকত তবে তিনি সেকথা তাঁদের বলতেন না। কিন্তু গোশালকের বাক সংযম ছিল না। তাই সেকথা তাঁদের মুখের ওপর বলে বসলেন। বললেন, নিগ্রন্থ? এত এত বস্ত্র ও পাত্রাদির উপকরণ থাকতে আপনারা কেমন নিগ্রন্থ? সত্যকার নিগ্রন্থ ত আমার আচার্য যাঁর গায়ে এককালি সুতোও নেই, না সঙ্গে ভিক্ষার কাষ্ঠপাত্র। তিনি ত্যাগ এবং তপস্যার প্রতিমূর্তি।

নগ্ন গোশালকের দিকে চেয়ে মুনিচন্দ্র স্থবিরের শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করলেন। তারপর বললেন, তোমার মত স্বয়ংগৃহীত লিঙ্গ হবেন হয়ত তোমার গুরু।

বর্ধমানের নিন্দায় গোশালকের রাগ হল। তিনি গায়ে পড়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করলেন। শেষে তাঁদের অবস্থান স্থান অগ্নিদগ্ধ হোক বলে অভিশাপ দিয়ে প্রতিনিবৃত্ত হলেন।

তোমার মত লোকের কথায় আমাদের অবস্থান স্থান দগ্ধ হয় না বলে মুনিচন্দ্র স্থবিরের শিষ্যরাও নিজেদের পথ নিলেন।

চম্পক রমণীয় উদ্যানে ফিরে এসেই গোশালক বর্ধমানের কাছে

সমস্ত কথা নিবেদন করলেন। বললেন, ভগবন্, আজ সারম্ভ ও সপরিগ্রহী শ্রমণদের সঙ্গে দেখা হল। তাঁদের সঙ্গে আমার বাদও হয়েছে।

বর্ধমান বললেন, হাঁ গোশালক, তাঁরা ভগবান পার্শ্বনাথের পূজ্য শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁদের সঙ্গে বাদ করে তুমি ভালো করো নি।

বর্ধমান বোধ হয় এই জন্যই তীর্থংকর জীবনে তরুণ শিক্ষার্থী শিষ্যদের বিনয় শিক্ষা দিতে বলেছিলেন।

অন্যের দুঃখদায়ী কর্কশ ভাষা সত্য হলেও কখনো উচ্চারণ করবে না।

এতে নিজের মনের সমভাবই যে নষ্ট হয় তা নয়, অন্যের মনেও দ্বেষ ও বৈরভাবের সৃষ্টি করে।

এইজন্যই বোধ হয় সম্যকত্ব প্রয়াসী সাধুকে প্রশান্তমনা, সংযতবাক ও অপ্রগল্‌ভ হতে হয়।

রাত্রির তখন দ্বিতীয় যাম। গোশালক সবে মাত্র শয্যা গ্রহণ করেছেন। এমন সময় দূরে নগরের দিক হতে—যেদিকে কুবণর কামারের বাড়ী ছিল সেদিক হতে একটা আলোর প্রকাশের মত দেখা গেল। সেই আলো ক্রমশই ওপরের দিকে উঠতে লাগল।

গোশালক সেই আলো দেখে উঠে বসলেন। উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন এতক্ষণে তাহলে তাঁর অভিশাপটা সফল হল। সারম্ভী ও সপরিগ্রহী শ্রমণদের উপাশ্রয় নিশ্চয়ই দগ্ধ হচ্ছে।

বর্ধমানকে সে কথা জিজ্ঞাসা করতেই বর্ধমান বললেন, না, গোশালক, এইমাত্র পার্শ্বাপত্য শ্রমণ মুনিচন্দ্র স্থবিরের দেহাবসান হল। তুমি যে আলোর প্রকাশ দেখেছ সে তাঁর আত্মার উৎক্রান্তির প্রকাশ।

গোশালক আবার প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, তিনি ত অসুস্থ ছিলেন না; তবে সহসা কি করে তাঁর দেহাবসান হল?

বর্ধমান বললেন, গোশালক, মুনিচন্দ্র স্থবির কর্মশালায় কায়োৎসর্গ ধ্যানে একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন? কুবণর অত্যধিক মদ্যপান করে এসে চোরভ্রমে তাঁর গলা টিপে ধরেছিল। তাইতেই তাঁর মৃত্যু হল।

বর্ধমান কোথাও স্থিত হন না। তাই পরদিন সকালেই চলে এলেন চোরাক সন্নিবেশ।

বর্ধমান চোরাকে প্রবেশ করতে যাবেন। প্রবেশ পথে আরক্ষকেরা তাঁদের বাধা দিল। জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কে?

বর্ধমানের মৌন ছিল তাই কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না। তাছাড়া তাঁদের কিই-বা পরিচয়? পূর্বাশ্রম তাঁরা পরিত্যাগ করে এসেছেন। এখন কেবল শ্রমণ, পরিব্রাজক। গোশালক সেই কথাই বললেন। বললেন, নগরে প্রবেশের কি কোনো বাধা আছে?

আরক্ষকেরা গোশালকের সেই প্রত্যুত্তরে তুষ্ট হল না। এক, গোশালকের কথা বলার এই বিশেষ ভঙ্গী। দুই, চোরাকের সঙ্গে প্রতিবেশী এক রাষ্ট্রের তখন যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হয়েছে। গুপ্তচরেরা নানাভাবে তাই সংবাদ সংগ্রহ করতে আসছে। আর সাধু শ্রমণের বেশে আসাই ত সবচেয়ে নিরাপদ।

তাই বার বার প্রশ্ন করেও যখন আরক্ষকেরা সন্তোষজনক কোনো প্রত্যুত্তর পেল না তখন তাঁদের ধৃত করে আরক্ষালয়ে নিয়ে গেল।

বর্ধমান তাই চান। পরিবেশ যত প্রতিকূল হবে, তাঁরা যত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হবেন, কর্ম নির্জরা ততই সহজ হবে।

আরক্ষালয়ে প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য আরক্ষকেরা তাঁদের ওপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হল। বর্ধমান সে সব অত্যাচার সহ্য করেও যেমন চুপ করে ছিলেন তেমনি চুপ করে রইলেন। গোশালকও শেষে প্রত্যুত্তর দেওয়া হতে নিবৃত্ত হলেন। এতে তাঁরা যে গুপ্তচর সে সম্বন্ধে আরক্ষকদের আর কোনো সন্দেহই রইল না। তারা তখন তাঁদেরকে আরও উৎপীড়ন করতে প্রবৃত্ত হল।

অনেকদিন পরের কথা। গৌতম বর্ধমানকে জিজ্ঞাসা করছেন, ভগবন্, নির্বেদে জীব কি উপসর্জন করে?

নির্বেদে সে সমস্ত রকম সুখভোগে উদাসীনতাকে প্রাপ্ত হয়।

তার কোনো বিষয়েই আসক্তি থাকে না। সে তখন সর্বারম্ভ পরিত্যাগী হয়ে মোক্ষমার্গ অবলম্বন করে।

বর্ধমান সেই মোক্ষমার্গ অবলম্বন করেছেন। কোনোরকম সুখ-ভোগে তাই তাঁর ইচ্ছা নেই। তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহরূপ কষায় জয় করে প্রিয় অপ্রিয় শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়েছেন।

উদাসীন হয়েছেন তাই যখন কোমরে দড়ি বেঁধে আরক্ষকেরা তাঁকে কুয়োর ভেতর নামিয়ে দিয়েছে তখনো তিনি প্রশান্তমনা।

আরক্ষকেরা তাঁকে একবার জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে আবার ওপরে টেনে তুলছে ও বলছে—বল, এখনো বল, তোরা গুপ্তচর কিনা ?

গুপ্তচরদের সাজা দেওয়া হচ্ছে সে-খবর ততক্ষণে সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের সাজা দেখবার জন্য আরক্ষালয়ে মানুষের ভিড় জমে উঠেছে। কেউ বলছে, কেমন ঢীট্, ধরা পড়েও স্বীকার পাচ্ছে না। কেউ বলছে, কি জানি হতেও পারে সত্যিকার শ্রমণ। ধরা পড়ে অযথা নির্যাতন সহ্য করছে।

সেই সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন সাধ্বী জয়ন্তী ও সোমা।

জয়ন্তী ও সোমা অস্থিক গ্রামের নৈমিত্তিক উৎপলের বোন। সাধ্বীধর্ম গ্রহণ করে প্রব্রজন করতে করতে তাঁরা চোরাকে এসে আছেন কয়েক দিন।

আরক্ষালয়ের পাশে মানুষের ভিড় দেখে তাঁরাও সেদিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর সমস্ত শুনে অপরাধীদের জল হতে টেনে তুলতে বললেন।

জয়ন্তী ও সোমাকে শ্রদ্ধা করে আরক্ষকেরা। তাই তাঁদের কথায় তারা বর্ধমানকে কুয়োর ভেতর হতে টেনে তুলল।

জয়ন্তী ও সোমা বর্ধমানকে একবার দেখেছিলেন শূলপাণি যক্ষায়তনে। তাই দেখা মাত্রই তাঁকে চিনতে পারলেন। তখন আরক্ষকদের দিকে চেয়ে বললেন, এ কি করেছ তোমরা ? এঁকে কী

তোমরা চেন না? ইনি ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরের রাজপুত্র। প্রব্রজ্যা নিয়ে এখন সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন ছদ্মস্থ অবস্থায়। এঁর আত্মিক শক্তি অপরিসীম। তাই শীঘ্র এঁদের মুক্ত করে এঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর।

আরক্ষকেরা তখন ভয় পেয়ে তাঁদের বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে বর্ধমানকে বলল, দেবার্য, আপনি কে তা না জেনে আপনাদের ওপর আমরা অত্যাচার করেছি। আমাদের অজ্ঞানকৃত এই অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।

বর্ধমানের অবশ্য ক্ষমা করবার কিছু ছিল না। ক্রুদ্ধ হলে তবেই ত ক্ষমা। বর্ধমান ক্রুদ্ধই হন নি।

বর্ধমান এখন সর্বত্র সর্বদা ক্ষমা ভাব অর্জন করেছেন। তাই সকলের প্রতি তাঁর মৈত্রী ভাব। এমন কি যে তাঁকে নির্যাতন করছে তার প্রতিও।

তবুও হাত তুলে তাদেরকে আশ্বস্ত করে বর্ধমান পৃষ্ঠচম্পার পথ নিলেন।

পৃষ্ঠচম্পাতেই বর্ধমান যাপন করলেন তাঁর প্রব্রজ্যা জীবনের চতুর্থ বর্ষাবাস।

এবারের চাতুর্মাস্যে বর্ধমান একদিনও আহার গ্রহণ করলেন না। বীরাসনে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে নিশিদিন অতিবাহিত করলেন।

চাতুর্মাস্য শেষ হতে পৃষ্ঠচম্পা হতে তাঁরা এলেন কয়ংগলায়।

কয়ংগলায় থাকেন দরিদ্দথেরা পাষণ্ডীরা। তাঁরা সপত্নীক, সারম্ভী ও সপরিগ্রহী।

বর্ধমান তাঁদের দেবায়তনে সেদিন আশ্রয় নিয়েছেন।

দরিদ্দথেরাদের সেদিন রাত্রে কি একটা উৎসব ছিল ও সেই উপলক্ষে রাত্রি জাগরণ। সেজন্য তাদের সকলে সেই দেবায়তনে সমবেত হয়েছে।

শুধু সমবেত হওয়াই নয়। এক নৃত্য গীতের আয়োজন করেছে। ধর্ম ধ্যানের মধ্য দিয়ে রাত্রি জাগরণের চাইতে নৃত্য গীতের ভেতর দিয়ে রাত্রি জাগরণ অনেক বেশী সহজ।

শুধু সমবেত হওয়াই নয়। এক নৃত্য গীতের আয়োজন করেছে। ধর্ম ধ্যানের মধ্য দিয়ে রাত্রি জাগরণের চাইতে নৃত্য গীতের ভেতর দিয়ে রাত্রি জাগরণ অনেক বেশী সহজ।

বর্ধমান সেই দেবায়তনের এক কোণে কায়োৎসর্গ ধ্যানে স্থিত হয়েছেন। তাই তাঁর কিছু চোখে পড়ছে না বা কানে যাচ্ছে না। কিন্তু গোশালক সমস্তই দেখছেন, সমস্তই শুনছেন। দেখছেন যে-রকম বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয়েছে দরিদ্দথেরা রমণীরা, দেখছেন তাদের হাবভাব, বিলাস ও বিভ্রম আর শুনছেন তাদের গান, তাদের সংলাপ। আর ভাবছেন, এর মধ্যে ধর্ম কোথায়? ধর্ম কি বিলাস সর্জনে না বিলাস বর্জনে?

গোশালক চুপ করে থাকতে পারলেন না। বলে ফেললেন সে কথা। বললেন, এর মধ্যে ধর্ম নেই, নেই রাত্রি জাগরণের সার্থকতা। এর চাইতে মীনকেতনের মন্দিরে গিয়ে মদন মহোৎসব অনেক বেশী ভালো ছিল।

কিন্তু সেকথা সহ্য হবে কেন দরিদ্দথেরা পাষণ্ডীদের। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে মন্দির হতে বার করে দিল।

একে শীতের রাত। তার ওপর এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে সন্ধ্যার পর-পরই। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। থেকে থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। আর হাওয়া। মনে হয় সে যেন তুষার শীতল মৃত্যুর রাজ্য হতে উঠে এসেছে। সেই হাওয়া গোশালকের অনাবৃত দেহে এসে বিঁধছে।

কিন্তু উপায়?

কাছাকাছি এমন কোন আশ্রয় নেই, যেখানে তিনি চলে যাবেন।

না, সংসারের সমস্তই এমনি। এখানে সত্যের কোন মূল্য নেই। যে সত্য কথা বলে তাকে এমনি দুর্ভোগ ভুগতে হয়। গোশালকের তখন মনে পড়ে যায় বাসি পর্যুষিত অন্ন গ্রহণ করবে না বলায় ব্রাহ্মণগ্রামে উপানন্দের দাসী যে ভাবে তাঁর গায়ে সেই বাসি পর্যুষিত অন্ন ছুঁড়ে মেরেছিল। পত্তকালয়ে নির্জন অরণ্যে বর্ধমান

যখন ধ্যানস্থিত ছিলেন তখন গ্রামপতির পুত্র সেখানে এক ক্রীতদাসীর সঙ্গে কামোপভোগে নিরত হলে তাকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে যে ভাবে তিনি তিরস্কৃত হয়েছিলেন। আর আজ?

বাতাসের মুখে গাছের পাতা যেমন থরথর করে কাঁপে গোশালক তেমনি থরথর করে কাঁপছিলেন। তাঁর সেই দুরবস্থা দেখে দরিদ্দথেরাদের মধ্যে যাঁরা একটু বয়স্ক, বয়সে প্রবীণ, তাঁরা গোশালককে ভেতরে ডেকে নিলেন। বাজনাদারদের বললেন, তোরা আরও একটু জোরে জোরে বাজা যাতে ও কিছু বললে কারু কানে না যায়।

গোশালকের আর কোনো কথা বলবারই ইচ্ছে ছিল না। তাই দেবায়তনের এক কোণে গিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

পরদিন সূর্যোদয় হতেই বর্ধমান শ্রাবস্তীর পথ নিলেন। কিন্তু শ্রাবস্তীতে এসে নগরে প্রবেশ করলেন না, নগরের বাইরেই অবস্থান করলেন।

তার পরদিন সেখান হতে চলে গেলেন হল্লিদুয় গ্রামে। সেই গ্রামের বাইরে হলিদ্দুগ নামে এক বিশাল মহীরুহ ছিল। সেই মহীরুহের তলায় সেদিন তাঁরা রাত্রি যাপন করলেন।

শ্রাবস্তী যাবার মুখে একদল সার্থবাহও সেদিন সেই গাছের তলায় রাত্রি যাপন করেছে। গভীর রাতে শীতের তীব্রতার জন্যই তারা লতাপাতা একত্রিত করে অগ্নি প্রজ্বলিত করল। তারপর সেই আগুনের চারদিকে বসে তারা রাত্রি অতিবাহিত করল।

পরদিন সকাল হতেই তারা যে যার মতো উঠে চলে গেল। সেই আগুন নেভাবার কথা একেবারেই ভুলে গেল।

ভুলে গেল তাই সেই আগুন শুকনো ঘাসে ধরে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শেষে বর্ধমান যেখানে কায়োৎসর্গ ধ্যানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে পর্যন্ত বিস্তৃত হল। গোশালক তখন নিকটে ছিলেন না আর বর্ধমানেরও বাহ্য সম্বীতি ছিল না। তাই সেই আগুন বর্ধমানের পা দুটো ঝলসে দিল।

কিন্তু বর্ধমানের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দেহকে দেহ বলে তিনি

আর মনে করেন না। তাই সেই দগ্ধ পা নিয়েই তিনি হেঁটে এলেন নংগলা গ্রামে। দ্বিপ্রহরে সেখানে বাসুদেব মন্দিরে খানিক বিশ্রাম নিয়ে চলে গেলেন আবত্তা। আবত্তায় বলদেব মন্দিরে অবস্থান করলেন।

আবত্তা হতে তাঁরা গেলেন চোরায়। চোরায় হতে কলংবুকা।

কলংবুকার নিকটেই থাকেন শৈলপ মেঘ ও কালহস্তী। কালহস্তী সসৈন্য তখন দুর্বৃত্ত দমনে গমন করছিলেন। পথে বর্ধমান ও গোশালককে দেখে গুপ্তচর ভেবে তাঁদের ধরে মেঘের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

মেঘ একবার বর্ধমানকে ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরে দেখেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে দেখা মাত্রই চিনতে পারলেন ও তাঁদের মুক্ত করে দিলেন।

এই অপ্রত্যাশিত মুক্তিলাভে বর্ধমানের মনে হল এবার তাঁদের অনার্যদেশের দিকে যাওয়া উচিত যেখানে কেউ তাঁদের পরিচিত নেই। কলংবুকায় এই প্রথম তিনি মুক্তিলাভ করেন নি। এর আগে চোরাকেও তিনি মুক্তিলাভ করেছেন। এতে কর্ম নির্জরারই বিলম্ব হচ্ছে। তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনা হতে হবে আরও কঠোর, তপস্যা আরও তীব্র।

বর্ধমান তাই গোশালককে সঙ্গে নিয়ে আর্যসীমা অতিক্রম করে পথহীন রাঢ়প্রদেশে প্রবেশ করলেন।

সেকালে রাঢ়প্রদেশ অনার্যদেশ বলেই পরিগণিত হত। তা ছিল আর্যপরিধির বাইরে।

সেই দুর্গম রাঢ়প্রদেশের বজ্জ ও সুব্ভ ভূমিতে বর্ধমান ও গোশালক দীর্ঘদিন প্রব্রজন করলেন। প্রব্রজন কালে তাঁদের বহুবিধ বিপদের সম্মুখীন হতে হল। বালু ও কঙ্করময় ভূমিতে অবস্থান করতে হল।

রাঢ়দেশের অধিবাসীরা রুক্ষ ও শুষ্ক ভোজী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল। তাই রাঢ়প্রদেশে তাঁদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হল।

সেখানে তাঁরা রুক্ষ, শুষ্ক ও অল্পপরিমিত আহারই প্রাপ্ত হতেন।

কুকুরেরা তাঁদের ওপর উৎপতিত হত, দংশন করত। কুকুরের আক্রমণ হতে কেউ তাঁদের রক্ষা করত না বরং চু-চু শব্দ করে আরও লেলিয়ে দিত।

রাঢ়দেশের গ্রামগুলি দূরে দূরে অবস্থিত ছিল, তাই রাত্রিতে অবস্থানের জন্ম প্রায়ই গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারতেন না। পৌঁছলেও গ্রামবাসীরা গ্রামে তাঁদের প্রবেশ করতে দিত না। প্রহার করে গ্রাম হতে দূর করে দিত। কখনো ঢিল, কখনো নরকপাল, কখনো কলসীর কানা ছুঁড়ে মারত। কখনো ঠেলে ফেলে দিত। কখনো বা ওপরে তুলে নীচে গড়িয়ে দিত। বুকের ওপর বসে মাথার চুল ছিঁড়ে নিত। গায়ে মুখে ধুলোবালি ছড়িয়ে দিত। শরীর হতে মাংস কেটে নিত। শরীরের প্রতি মমত্বহীন তাঁরা এসব অত্যাচার বিনম্রভাবে সহ্য করতেন।

সহ্য করবার জন্যই ত বর্ধমান ব্রাত্য, অন্ত্যজ, দস্যুভূয়িষ্ঠ রাঢ়-প্রদেশে এসেছেন।

স্বর্ণ ততই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যতই তাকে দগ্ধ করা যায়। বর্ধমানও তেমনি এই সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করে কর্ম নির্জরার ভেতর দিয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। আরও প্রদীপ্ত।

অনার্যদেশ পরিভ্রমণ তখনও তাঁদের শেষ হয়নি। এমন সময় নেমে এল বর্ষা। ঘন কৃষ্ণ বর্ষা।

বর্ধমান তাই অনার্যপ্রদেশ পরিত্যাগ করে ফিরে এলেন আর্যদেশের পরিধিতে। পঞ্চম বর্ষাবাস তিনি ভদ্দিয়া নগরীতে ব্যতীত করবেন।

মলয়দেশের রাজধানী এই ভদ্দিয়া। এই চাতুর্মাস্যেও বর্ধমান আহার গ্রহণ করলেন না। যোগানুষ্ঠান ও ধ্যান সমাহিতিতেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করলেন।

॥ ৬ ॥

ঘরের ভেতর কে ও?

আমরা শ্রমণ—গোশালক ভেতর হতে প্রত্যুত্তর দিলেন।

বাইরে বেরিয়ে এস।

ভদ্দিয়ায় চাতুর্মাস্য শেষ করে বর্ধমান এলেন কদলী সমাগম। কদলী সমাগম হতে তংবায়, তংবায় হতে কুপীয়। কুপীয়র এক নির্জন পোড়ো ঘরে তাঁরা রাত্রি যাপন করছেন।

কিছুক্ষণ আগে সেখানে এসেছিল এক কামাসক্ত নারী। নানা-রকম হাবভাবে সে তাঁদের প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যখন কোনো রকমেই সে তাঁদের বিচলিত করতে সমর্থ হল না তখন আরক্ষালয়ে গিয়ে আরক্ষকদের সে খবর দিয়ে এসেছে। দুজন গুপ্তচর গ্রামের প্রত্যন্তে অবস্থিত পোড়োঘরে এসে অবস্থান করছে।

আরক্ষকেরা তাই তাঁদের খবর নিতে এসেছে।

গোশালক বাইরে বেরিয়ে এলেন। বর্ধমানও।

শ্রমণ? এখন আরক্ষালয়ে চল। কাল সকালে দেখা যাবে।

সকালে তাঁদের ওপর অত্যাচার করে তথ্য বার করবারই উপক্রম হচ্ছিল। এমন সময় সেখানে এসে পড়লেন সাধ্বী বিজয়া ও প্রগল্‌ভা। এঁরা পার্শ্বনাথ শ্রমণ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের মুক্ত করিয়ে নিলেন।

কিন্তু গোশালক আর বর্ধমানের সঙ্গে থাকতে চাইলেন না। বর্ধমানের সঙ্গ ত্যাগ করবার কথা তিনি অনেকদিন হতেই ভাবছিলেন, বিশেষ করে অনার্যদেশ হতে ফিরে আসার পর হতে। সেখানে তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, অনেক লাঞ্ছনা ও অপমান। এত কষ্ট কী মানুষের শরীরে সহ্য হয়? প্রকৃতির বা দংশ মশকের অত্যাচার নয়, মানুষের কৃত উৎপীড়ন। যেখানে শ্রমণদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নেই সেখানে কেনই বা যাওয়া? গোশালক তাই মনে মনে ভাবেন এ সমস্তর জন্য যেন বর্ধমানই দায়ী। তিনি আপদে বিপদে তাঁকে রক্ষা ত করেনই না বরং এমন সব জায়গায় নিয়ে যান যেখানে ভিক্ষেই পাওয়া যায় না বা যেখানে শারীরিক পীড়ন সহ্য করতে হয়। তবে আর তিনি কি সুখে তাঁর অনুসরণ করবেন?

গোশালক সেই কথাই বললেন বর্ধমানকে। বললেন, ভগবন্, আপনার সঙ্গে থেকে আমার সুখ নেই। আমি স্বতন্ত্র বিচরণ করতে চাই।

সুখ?

কিন্তু বর্ধমানও বা কিভাবে তাঁকে সুখ দিতে পারেন? তার জন্য ত সংসার। সেখানে যেমন দুঃখ আছে তেমনি সুখও। অবশ্য সে সুখ নিত্য নয়, আত্যন্তিকও নয়। কিন্তু সে সুখ ত বর্ধমান গোশালককে দিতে পারেন না। তিনি যা দিতে পারেন তা আনন্দ।

আনন্দ সুখ নয়। সুখ দুঃখ বিরহিত একটি অবস্থা। যখন সর্বত্র সম।

প্রব্রজ্যা নেবার সময় এই সমভাবই বর্ধমান গ্রহণ করেছিলেন। আজ হতে সর্বত্র আমি সম হব। সুখে দুঃখে, শীতে গ্রীষ্মে, মানে অপমানে।

সাধনার সিদ্ধি যখন সমদর্শনে সাধন অবস্থায় সাধুকে তাই সর্বত্র সমদর্শী হতে হয়। অবহেলা-নিন্দা-তর্জন-তাড়নায় সমান অবিচলিত থাকতে হয়।

বর্ধমান তাই-ই আছেন। সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, মান অপমান সমস্ত কিছুকে তিনি সমভাবে গ্রহণ করে চলেছেন। তাঁর কারো প্রতি দ্বেষ নেই, না অনুরাগ। প্রতিকূল উপসর্গ উপস্থিত হলেও তাই তিনি তার নিবারণ করেন না বা নিরাকরণ।

কিন্তু সুখ দুঃখের এই বৈপরীত্যকে কি সকলে সমভাবে গ্রহণ করতে পারে? নির্দ্বন্দ্ব হতে পারে?

পারে না। কারণ এর জন্য চাই অসীম বল, ধৈর্য ও সাহস। যার বল, ধৈর্য ও সাহস নেই সে এই সংযমভার বহন করতে সমর্থ হয় না।

শীতের দিনে শীতের প্রকোপে সে তেমনি কাতর হয় যেমন কাতর হয় কোনো রাজ্যভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়।

গ্রীষ্মের দিনে তপন তাপে সে তেমনি সন্তপ্ত হয় যেমন সন্তপ্ত হয় স্বল্প জলে মীন।

দংশ মশকের জ্বালা ও তৃণশয্যার রুক্ষ স্পর্শ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে সে তখন মনে করে পরলোক আমি প্রত্যক্ষ করিনি কিন্তু মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছি।

অনার্য পুরুষের অত্যাচার বা অজ্ঞানের 'এ চর', 'এ চোর' এই সন্দেহে, বন্ধনে, পীড়নে সে বন্ধু-বান্ধবের কথা স্মরণ করে, যেমন স্মরণ করে ক্রোধবশে গৃহ পরিত্যাগ করে আসা পৌর স্ত্রী।

তবু বর্ধমান গোশালককে নিবারণ করলেন না। বললেন, গোশালক, যেমন তোমার অভিরুচি।

গোশালক তাই বর্ধমানের সঙ্গ ত্যাগ করে রাজগৃহের পথ নিলেন। আর বর্ধমান? বর্ধমান এলেন বৈশালী।

বৈশালীতে এক কর্মকারশালায় তিনি আশ্রয় নিলেন।

সেই কর্মকারশালার যিনি অধিকারী তিনি দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের পর সেই সেদিনই প্রথম এসেছেন তাঁর কর্মশালায়।

তিনি কর্মশালায় প্রবেশ করতে যাবেন সহসা তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল বর্ধমানের ওপর। তিনি শ্রমণ ধর্মের অনুযায়ী ছিলেন না; তার ওপর দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের জন্য একটু ক্লিষ্ট ছিলেন। তাই বর্ধমানকে দেখা মাত্রই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যা ছিল তাঁর পরম সৌভাগ্যের তাকে অমঙ্গল মনে করে হাতুড়ি নিয়ে তিনি বর্ধমানকে মারতে ছুটলেন।

কিন্তু বর্ধমানের কাছ পর্যন্ত তিনি পৌঁছতে পারলেন না। অত্যধিক রাগের জন্যই হোক বা দুর্বলতার জন্য তিনি কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং সেই যে সংজ্ঞা হারালেন সেই সংজ্ঞা আর ইহ-জীবনে ফিরে পেলেন না। সেইখানে সেইভাবে তাঁর মৃত্যু হল।

সেই দুর্ঘটনার পর বর্ধমান আর সেখানে অবস্থান করলেন না। সেখান হতে চলে এলেন শালীশীর্ষে। সেখানে নগরের বাইরে যে উদ্যান ছিল সেই উদ্যানে এক বৃক্ষতলে তিনি ধ্যানস্থিত হলেন।

বর্ধমান যে বৃক্ষতলে ধ্যানস্থিত হলেন সেই বৃক্ষে বাস করে এক নিকৃষ্ট ধরনের অপদেবতা। নাম কটপুতনা।

সংসারে এক ধরনের জীব আছে যারা অন্যের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়, তার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করে। এই কটপুতনাও সেই ধরনের। তাই সে যখন বর্ধমানকে ধ্যানের গভীরতায় ডুবে যেতে দেখল তখন সে অকারণ ঈর্ষায় জ্বলে উঠল ও তাঁর ধ্যান ভাঙাবার জন্য পরিব্রাজিকার রূপ ধারণ করে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল ও নানা ভাবে নানা প্রলোভনে তাঁর ধ্যান ভাঙাবার চেষ্টা করল। কিন্তু যখন সে তাতে সফলকাম হল না তখন আরও ক্রুদ্ধ হয়ে মাথার চুল জলে ভিজিয়ে সেই জলকণা তাঁর সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিতে লাগল।

সেই শীতল জলকণা বর্ধমানের গায়ে গিয়ে সূচের মত বিদ্ধ হল। কিন্তু বর্ধমান সেই উপসর্গেও বিচলিত হলেন না। যেমন ধ্যান-সমাহিত ছিলেন, তেমনি ধ্যান-সমাহিত রইলেন। তাই তিনি লোকাবধিজ্ঞান লাভে সমর্থ হলেন।

লোকাবধিজ্ঞানে লোকবর্তী সমস্ত পদার্থ হস্তামলকবৎ পরিদৃষ্ট হয়।

আর কটপুতনা ? কটপুতনা তখন পরাজিত ও লজ্জিত হয়ে সেই বৃক্ষ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেল।

কটপুতনা চলে গেল কিন্তু তার পর পরই এলেন গোশালক। গোশালক একাকী পরিব্রাজন করে সুখ পান নি। তাই আবার ফিরে এসেছেন।

বর্ধমান শালীশীর্ষ হতে এলেন ভদ্দিয়ায়। ভদ্দিয়ায় কঠোর যোগ সাধনায় ষষ্ঠ বর্ষাবাস ব্যতীত করলেন।

॥ ৭ ॥

বর্ষাবাসের পর ভদ্দিয়া হতে বর্ধমান গেলেন মগধভূমির দিকে। সেখানে দীর্ঘ এক বছর বিচরণ করে বর্ষাবাসের আগ দিয়ে এলেন আলংভিয়ায়। আলংভিয়ায় তিনি সপ্তম বর্ষাবাস ব্যতীত করলেন।

॥ ৮ ॥

বর্ষাবাস ব্যতীত করে আলংভিয়া হতে বর্ধমান এলেন কুণ্ডাক সন্নিবেশ। কুণ্ডাক হতে মদ্দন্ন। মদ্দন্ন হতে বহুসালগ। বহুসালগ হতে লোহর্গলা।

লোহর্গলায় তখন জীতশত্রু রাজত্ব করেন।

যদিও রাজার নাম জীতশত্রু তবু তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না। সম্প্রতি প্রতিবেশী এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে তাঁর রাজ্যের ওপর। প্রহরীরা তাই সদা সতর্ক। অপরিচিত কাউকে নগরে প্রবেশ করতে দেয় না। প্রবেশ করবার চেষ্টা করলে বন্দী করে রাজার কাছে উপস্থিত করে।

বর্ধমান ও গোশালকও তাই নগরে প্রবেশ করতে গিয়ে প্রহরীদের হাতে বন্দী হলেন। প্রহরীরা তাঁদের রাজসভায় উপস্থিত করল।

সেই সময় রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন অস্থিক গ্রামের উৎপল। উৎপল বর্ধমানকে দেখা মাত্রই চিনতে পারলেন ও উঠে এসে তাঁকে প্রণাম করে জীতশত্রুকে তাঁদের মুক্ত করে দিতে বললেন। বললেন, এঁরা গুপ্তচর নন। ইনি ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরের রাজপুত্র ও ভাবী তীর্থংকর।

সে কথা শুনে জীতশত্রু তখনি তাঁদের মুক্ত করে দিলেন ও প্রহরীদের অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নিলেন।

লোহর্গলা হতে বর্ধমান এলেন পুরীমতাল, যে পুরীমতালে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমের নিকটবর্তী শকটমুখ উদ্যানে আদিকর ভগবান্ ঋষভদেব কেবল-জ্ঞান ও কেবল-দর্শন লাভ করেছিলেন।

পুরীমতাল ও শকটমুখ উদ্যান তাই বর্ধমানের কাছেও তীর্থক্ষেত্র। এই শকটমুখ উদ্যানেই না তিনি মরীচি জীবনে প্রথম শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। বর্ধমান তাই শকটমুখ উদ্যানে গিয়ে এক বৃক্ষতলে ধ্যানস্থিত হলেন।

এই পুরীমতালে থাকেন শ্রেষ্ঠী বগ্‌গুর। বগ্‌গুর সেদিন শকটমুখ উদ্যানে ভগবান মল্লীনাথের মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন।

বগ্‌গুর উদ্যানে প্রবেশ করেই বর্ধমানকে দেখতে পেলেন।

দেখলেন তীর্থংকরদের মতই তাঁর আয়ত চোখ, বিশাল বক্ষ, দিব্য বিভা।

বগ্‌গুর তখন একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তিনি এখন কার পুজো দেবেন? ভগবান মল্লীনাথের না জীবন্তস্বামীর?

বগ্‌গুরের মনের মধ্য হতে তখন কে যেন বলে উঠল, বগ্‌গুর, ভাবী তীর্থংকর যখন স্বয়ং তোমার সামনে উপস্থিত তখন তুমি তীর্থংকর মূর্তিতে কেন পুজো দেবে?

বগ্‌গুর তখন বর্ধমানের পায়ের কাছে তাঁর পূজার্ঘ্য নিবেদন করে ফিরে গেলেন।

বর্ধমান কিছুকাল সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর উন্নাগ ও গোভূমি হয়ে এলেন রাজগৃহ।

রাজগৃহে তিনি অষ্টম বর্ষাবাস ব্যতীত করলেন।

॥ ৯ ॥

রাজগৃহ হতে বর্ধমান আবার গেলেন অনার্য ভূমির দিকে। এখনো তাঁর অনেক ক্লিষ্ট কর্ম রয়েছে যাকে ক্ষয় করবার জন্য তাঁকে আরও অনেক দুঃখ বহন করতে হবে আরও করতে হবে কঠিন তপশ্চর্যা। তাই তিনি চলে এলেন রাঢ়দেশের বজ্জ ও সুব্ভ ভূমিতে।

সে বছর তিনি অনার্য ভূমিতেই পরিভ্রমণ করলেন। এমন কি যখন নেমে এল বর্ষা তখনো তিনি আর্য ভূমিতে ফিরে গেলেন না, সেইখানেই রয়ে গেলেন।

কিন্তু সেখানে কে দেবে তাঁকে আশ্রয়? তাই বৃক্ষতলেই যাপন করতে হল তাঁকে সেই চাতুর্মাস্য।

এ অঞ্চলে প্রায় একটানা বর্ষা। কড়কড় করে পড়ে বাজ, ঝম-ঝম করে জল। আকাশ আর মাটি একাকার হয়ে যায় যখন বাতাসে বৃষ্টিতে চলে প্রলয়ের তাণ্ডব। কিন্তু বর্ধমান নির্বিকার। দুরন্ত

শ্রাবণের ধারাপাত তাঁকে নিরুদ্যম করতে পারে না, নিরুৎসাহ করতে পারে না প্রবল ঝটিকার আবর্ত। তিনি সে সমস্ত বিশাল মহীরুহের মত সহ্য করেন।

সহ্য করেন তাই তিনি আরও প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন।

তারপর একদিন কেটে যায় বর্ষার বাধাও। দিগন্ত ফিরে পায় তার প্রসারতা। গ্রামের সীমান্তে ঢেউ দিয়ে যায় ধান্য-মঞ্জরীর সোনালী রঙ্। রমণীয় হয় পাদপের ছায়া। শিউলি ফুলের সুবাসে মন্থর হয় ভোরের বাতাস।

কিন্তু মন্থর হয় কি মানুষের মন ?

হয় বৈ কি !

যদিও তারা নির্যাতন করেছে বর্ধমানকে, দেয় নি থাকবার আশ্রয় তবু যখন দেখল তারা তাঁর অবিচল ধৈর্য, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, তাদের চোখের দৃষ্টি যখন গিয়ে পড়ল বর্ধমানের সৌম্য মধুর মুখের ওপর, করুণার রসে যা সিক্ত, ক্ষমার ঔদার্যে যা উদ্ভাসিত তখন তাদের ক্রূরতা যেন আপনা হতেই বিগলিত হতে চাইল। চোখ দুটো হয়ে উঠল বাষ্পসিক্ত।

বর্ধমান এইজন্যই এসেছিলেন অনার্যদেশে। কর্ম নির্জরার সঙ্গে সঙ্গে জয় করলেন তিনি তাদের হৃদয়। জয় হয়েছে তাঁর। জয় হয়েছে তাঁর অসীম ক্ষমার।

বর্ধমান শরৎকালও সেখানে ব্যতীত করলেন। তারপর চাতুর্মাস্য শেষ হতে ফিরে গেলেন আবার আর্যভূমিতে।

॥ ১০ ॥

বর্ধমান চলেছেন সিদ্ধার্থপুর হয়ে কূর্মগ্রামের দিকে।

পথের মধ্যে এক তিল গাছকে মাথা গজিয়ে উঠতে দেখে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন গোশালক। ভগবন্, এই গাছে কী শুঁটি ধরবে ? তিল হবে ?

বর্ধমান বললেন, হ্যাঁ গোশালক, এই গাছে সাতটি পুষ্প বীজ রয়েছে। এতে একটি শুঁটি হবে। তাতে সাতটি তিল বীজ।

সেকথা শুনে গোশালক সেই গাছটি তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মনের ভাব, দেখি এতে কি করে সাতটি তিল বীজ হয়।

যদি না হয় তবে নিয়তিবাদ অসত্য। বর্ধমান সর্বজ্ঞ নন।

বর্ধমান সেদিকে চেয়ে একটু হাসলেন, কিছু বললেন না।

তারপর তাঁরা এলেন কূর্মগ্রামে। বেলা তখন দ্বিপ্রহর।

সেই দ্বিপ্রহরের রোদে কূর্মগ্রামের বাইরে এক আধাবয়সী যুবক বৃক্ষের ডাল হতে ঝুলে নিম্নমুখ ও উর্ধ্বপদ হয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে তপস্যা করছিল। তার আলুলায়িত জটা হতে রোদের তাপে ব্যাকুল হয়ে উকুন থেকে থেকে মাটিতে ঝরে পড়ছিল আর সে তাদের তুলে তুলে আবার মাথায় রাখছিল।

সেদিকে চেয়ে গোশালকের বিস্ময়ের সীমা নেই। মনে মনে ভাবছেন এই উকুন পোষা সন্ন্যাসী মানুষ না পিশাচ?

মানুষই, পিশাচ নয়। এই তরুণ সন্ন্যাসীর নাম বৈশ্যায়ন।

বৈশ্যায়নের প্রথম জীবনের ইতিহাস যেমন করুণ তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ।

বৈশ্যায়নের বয়স যখন দুই, তখন তাদের বাড়ীতে একবার ডাকাত পড়ে। ডাকাতেরা তার বাবাকে হত্যা করে তাদের ঘরে যা কিছু ছিল তা লুট করে নিয়ে যায় ও সেই সঙ্গে তার মাকেও ধরে নিয়ে যায়। এবং তাকে তার মার কোল হতে ছিনিয়ে এক গাছের তলায় ফেলে দিয়ে যায়।

বৈশ্যায়নের হয়ত সেইখানে সেইভাবেই মৃত্যু হত। কিন্তু তার আয়ু ছিল। তাই তাদের চলে যাবার পর পরই সে পথ দিয়ে এল গোবর গ্রামের আভীর গোশঙ্খী। গোশঙ্খী অসহায় বালককে গাছের তলায় পড়ে থাকতে দেখে তুলে ঘরে নিয়ে গেল ও নিজের সন্তানের মত প্রতিপালন করতে লাগল।

বৈশ্যায়ন ক্রমে বড় হয়ে উঠল।

বৈশ্যায়নের যখন বোঝবার মত বয়স হল তখন গোশঙ্খী তাকে সমস্ত কথা খুলে বলল। তারপর তার হাতের কবচে আঁকা মার মুখের ছবি দেখিয়ে বলল এই তোমার সত্যিকার মা। কিন্তু বৈশ্যায়নের নিজের মার কথা তেমন মনে পড়ে না।

বৈশ্যায়ন আরও বড় হয়ে উঠল। তারপর কোনো কার্যোপলক্ষে একবার চম্পানগরীতে এল। সেখানে সে বয়স্যদের সঙ্গে পড়ে এক গণিকালয়ে গেল।

গণিকালয়ে যে তার পরিচর্যা করতে এল বৈশ্যায়ন দেখল তার মুখের সঙ্গে কবচে আঁকা মায়ের মুখের হুবহু মিল।

বৈশ্যায়ন তখন তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু সে তাকে তার কি পরিচয় দেবে! শেষে বৈশ্যায়নের আগ্রহাতিশয্যে ডাকাতেরা যে ভাবে তার স্বামীকে হত্যা করে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেকথা খুলে বলল। শেষে চম্পানগরীর এক গণিকার কাছে তারা তাকে বিক্রয় করে দেয়। সেই হতে সে এখানে আছে।

সে কথা শুনে বৈশ্যায়ন তাকে নিজের পরিচয় দিল।

বৈশ্যায়নের মা তখন লজ্জায় দুঃখে আত্মহত্যা করতে গেলেন। কিন্তু বৈশ্যায়ন তাঁকে আত্মহত্যা হতে নিবৃত্ত করে সেই গণিকার কাছ হতে পুনরায় ক্রয় করে নিল ও সদ্‌গুরুর কাছে নিয়ে গিয়ে প্রণাম দীক্ষা দেওয়াল। বৈশ্যায়ন নিজেও এই ঘটনায় সংসার বিরক্ত হয়ে প্রাণায়াম দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেল।

গোশালকের বাক-সংযম কোনো কালেই ছিল না। তাই বৈশ্যায়নকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে বর্ধমানকে বলতে লাগল, দেবার্য, এ মানুষ না পিশাচ?

সে কথা বৈশ্যায়নের কানে গেল।

বৈশ্যায়ন প্রথমে তা উপেক্ষার ভাবে গ্রহণ করল কিন্তু শেষে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ হয়ে সে তার তপস্যালব্ধ তেজোলেশ্যা গোশালকের ওপর প্রয়োগ করল।

তেজোলেশ্যার প্রথমে দাহ হয় তারপর মৃত্যু।

বর্ধমান সঙ্গে সঙ্গে শীতলেশ্যার প্রয়োগ করে সেই তেজোলেশ্যাকে ব্যর্থ করে দিলেন।

বৈশ্যায়ন তখন বর্ধমানকে উদ্দেশ করে বলল, এ যাত্রা ও খুব বেঁচে গেল। ও আপনার শিষ্য তা জানতাম না।

গোশালক প্রথমে ও-কথার তাৎপর্যই বুঝতে পারলেন না। তারপর যখন বুঝতে পারলেন তখন এই তেজোলেশ্যা তাঁকেও পেতে হবে সে কথা তাঁর মনে এল। তিনি তখন বর্ধমানকে কি করে এই তেজোলেশ্যা লাভ করা যায় সেকথা জিজ্ঞাসা করলেন।

বর্ধমান বললেন, গোশালক, কেউ যদি ছ'মাস এক মুঠো কলাই ও এক আঁজলা গরম জল খেয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে তপস্যা করে তবে সে এই তেজোলেশ্যা লাভ করবে।

মাসখানেক পরে কূর্মগ্রাম হয়ে আবার সিদ্ধার্থপুরের দিকেই ফিরছেন বর্ধমান।

গোশালক যেখানে গাছটি তুলে ফেলে দিয়েছিলেন সেখানে আসতেই তাঁর সেকথা মনে পড়ে গেল। তখন তিনি বর্ধমানের দিকে চেয়ে বললেন, ভগবন্, নিয়তিবাদের সিদ্ধান্ত তা হলে ঠিক নয় আর আপনিও সর্বদর্শী নন?

বর্ধমান বললেন, কেন গোশালক?

কেন আর কেন? আপনি যে গাছে একটি শুঁটি ও সাতটি তিল বীজ হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা মিথ্যা হয়ে গেছে।

বর্ধমান বললেন, না গোশালক, তুমি যে গাছটি তুলে ফেলে দিয়েছিলে সে ওই গাছ। ওই গাছে একটিই শুঁটি হয়েছে ও সাতটি তিল বীজ। বলে তাঁকে অদূরের একটি গাছ দেখিয়ে দিলেন।

গোশালক নিকটে গিয়ে দেখলেন ঠিক তাই। গাছটি একটু কাত হয়ে উঠেছে।

বর্ধমান বললেন, গোশালক, আমরা চলে যাবার পর পরই এখানে এক পসলা বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিতে মাটি কাদা কাদা হয়ে যায়। সেই মাটিতে গরুর পায়ের ক্ষুরের চাপে তুমি যে গাছটি তুলে ফেলে দিয়ে-

ছিলে তার শেকড় বসে যায়। তাই গাছটি ঠিক সোজা না উঠে একটু কাৎ হয়ে উঠেছে।

গোশালকের নিয়তিবাদ সম্পর্কে আর কোনো সংশয় নেই। নিয়তি-বশেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে, নিয়তিবশেই মৃত্যুবরণ। নিয়তিবশেই মানুষ সংসার পরিভ্রমণ করে। মোক্ষের জন্য তবে বৃথাই কৃচ্ছ্রসাধন। মুক্তি যদি তিনি লাভ করেন তবে তা নিয়তিবশেই লাভ করবেন।

গোশালকের তখন মনে হল তিনি যদি ওই তেজোলেশ্যা লাভ করতে পারেন আর ভবিষ্যদ্বাণী করবার জন্য সামান্য জ্যোতিষ তবে তিনি এক নূতন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ও লোকসমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে সুখে বিচরণ করতে পারেন।

গোশালক তখন বর্ধমানের সঙ্গ ত্যাগ করে শ্রাবস্তীতে এসে উপস্থিত হলেন ও সেখানে হালাহলার ভাণ্ডশালায় অবস্থান করে বর্ধমান নির্দিষ্ট উপায়ে তেজোলেশ্যা অধিগত করলেন। তারপর পর পর শোণ, কলিন্দ, কর্ণিকার, অচ্ছিদ্র, অগ্নিবেশান ও অর্জুনের কাছে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবার ক্ষমতা অর্জন করলেন। এভাবে সিদ্ধবাক হয়ে গোশালক আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করলেন ও নিজেকে তীর্থংকর বলে ঘোষণা করে দিলেন। তাঁর প্রধান উপাসিকা ও সহায়িকা হলেন হালাহলা।

বর্ধমানও তাঁর তপস্যা ও যোগানুষ্ঠানে তেজোলেশ্যা অধিগত করেছেন ও শীতলেশ্যা; লোকাবধিজ্ঞানে তিনি সমস্ত বস্তুই প্রত্যক্ষ দেখতে পান। তাই ভবিষ্যদ্বাণী করা তাঁর পক্ষে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু তিনি ত খ্যাতি-প্রতিপত্তি, বিষয়-বৈভব এসব কিছু চান না। তাই তাদের প্রয়োগের কথা ভাবতেই পারেন না। তিনি চান অনুপম শান্তি, অনুপম মুক্তি, অনুপম জ্ঞান, অনুপম চারিত্র। বর্ধমান তাই গোশালক চলে যাবার পর দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এলেন বৈশালী। বৈশালী হতে বাণিজ্যগ্রাম, বাণিজ্যগ্রাম হতে শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তীতে তিনি দশম চাতুর্মাস্য ব্যতীত করলেন।

॥ ১১ ॥

চাতুর্মাস্য শেষ হতে তিনি শ্রাবস্তী পরিত্যাগ করে এলেন সানুলঠ্‌ঠিয়। সেখানে তিনি ভদ্র, মহাভদ্র ও সর্বতোভদ্র প্রতিমার আরাধনা করে ধ্যানমগ্ন রইলেন।

ভদ্র প্রতিমার আরাধনা অর্থ পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারদিকে চার প্রহর কায়োৎসর্গ করা। এর পরিমাণ দুই অহোরাত্র।

মহাভদ্র প্রতিমা আরাধনা অর্থ পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারদিকে এক অহোরাত্র কায়োৎসর্গ করা। এর পরিমাণ চার অহোরাত্র।

সর্বতোভদ্র প্রতিমার আরাধনা অর্থ শুধু পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চারদিকেই নয়; ঈশান, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, উর্ধ্ব, অধঃ সহ দশ দিকে দশ অহোরাত্র কায়োৎসর্গ করা। এর পরিমাণ দশ অহোরাত্র।

ষোল দিন তাই বর্ধমান নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে মগ্ন রইলেন।

সানুলঠ্‌ঠিয় হতে বর্ধমান গেলেন দৃঢ়ভূমির দিকে। সেখানে পোঢাল গ্রামে পোঢাল উদ্যানে পোলাস চৈত্যে মহাপ্রতিমার আরাধনা করলেন।

মহাপ্রতিমার আরাধনায় তিন দিন উপবাসের পর শিলাখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে শরীরকে সামনের দিকে ঈষৎ আনমিত করে হাত দুটি সামনে প্রসারিত করতে হয়। তারপর কোনো রুক্ষ পদার্থে সমগ্র দৃষ্টি কেন্দ্রিত করে সমস্ত রাত্রি ধ্যান করতে হয়।

বর্ধমানের এই উৎকৃষ্ট ধ্যানে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র বর্ধমানের প্রশংসা করে বললেন, বর্ধমানের মত ধ্যানী সংসারে আর দ্বিতীয় নেই। তিনি যে ধ্যানাবস্থা লাভ করেছেন দেবতারাও তা হতে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

সেকথা সংগমক নামক এক দেবতার বিশ্বাস হল না। তিনি তাই বর্ধমানকে পরীক্ষা করবার জন্য স্বর্গ হতে বর্ধমান যেখানে ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেখানে নেমে এলেন। এসে প্রলয়কালীন ধুলোবৃষ্টি করলেন। সেই ধুলো বর্ধমানের চোখ, কান ও নাকের ভেতর দিয়ে শরীরের ভেতর প্রবেশ করল। কিন্তু তাতে বর্ধমানের ধ্যান ভঙ্গ হল না।

মহাবীর জননী দেবগড়, মন্দির নং ৪
৫ খৃষ্টীয় ১০ম শতক

ধুলোবৃষ্টি শান্ত হতেই বজ্রের মত তীক্ষ্ণ মুখবিশিষ্ট পিঁপড়ের সৃষ্টি করলেন। সেই পিঁপড়ে তাঁর শরীরের সমস্ত মাংস খুঁটে খুঁটে খেল।

তারপর তিনি মশকের সৃষ্টি করলেন। তারা বর্ধমানের শরীরে দংশন করে রক্তপান করল। সেই সময় তাঁর শরীর হতে দুগ্ধধারার মত যে রক্তধারা প্রবাহিত হল তাতে তাঁকে মনে হল যেন প্রস্রবণ-যুক্ত এক গিরিরাজ ধ্যান সমাহিত রয়েছেন।

মশকের উৎপাত শান্ত হতে না হতেই তিনি সহস্র উই-এর সৃষ্টি করলেন। তারা তাঁর সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে দংশন করল। দেখে মনে হল, কে যেন তাঁর গায়ে কদম্ব কেশরের মত কেশর ফুটিয়ে দিয়ে গেছে।

তারপর তিনি ভয়ঙ্কর বিছের সৃষ্টি করলেন যার বিষ মত্ত মাতঙ্গেরও প্রাণ হরণ করে। তারা বর্ধমানের সর্বাঙ্গ দংশন করে ফিরল।

বর্ধমানের যখন তাতেও ধ্যানভঙ্গ হল না। তখন সংগমক নেউলের সৃষ্টি করলেন। তারা বিকট চীৎকার করতে করতে তাঁর দিকে ছুটে গেল ও তাঁর দেহ হতে মাংসখণ্ড টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগল।

নেউলের পর তিনি সাপের সৃষ্টি করলেন। তারা তাঁর দেহ বেষ্টন করে দংশন করল। ততক্ষণ দংশন করল যতক্ষণ না নির্বিষ হয়ে তারা তাঁর দেহ হতে বিশ্লিষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তারপর তিনি তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা মূষিকের সৃষ্টি করলেন। তারা তাঁর দেহকে জীর্ণ চীবরের মতো ছিন্নভিন্ন করল।

মূষিকেরা নিরস্ত হলে তিনি দীর্ঘদন্ত হস্তীদের সৃষ্টি করলেন। তারা তাঁর আয়ত বুকে সেই দন্ত দিয়ে আঘাত করল। সেই আঘাতে তাঁর বক্ষাস্থি হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হল কিন্তু তবু তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল না।

সংগমক তখন হস্তিনীদের সৃষ্টি করলেন। তারা তাঁর দেহ নিয়ে কন্দুকের মত লোফালুফি করল।

তাতেও যখন বর্ধমানের ধ্যানভঙ্গ হল না তখন সংগমক নিজে পিশাচ রূপ ধারণ করে বর্শা দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করল।

ব্যাঘ্র হয়ে নখর দিয়ে তাঁর শরীর বিদীর্ণ করল।

তাতেও যখন তাঁকে ধ্যানচ্যুত করতে পারলেন না তখন তিনি ত্রিশলা ও সিদ্ধার্থের রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর সামনে এসে বিলাপ করে বলতে লাগলেন, বর্ধমান, তুমি আমাদের বৃদ্ধাবস্থায় কোথায় ফেলে চলে গেলে? ভেবেছিলাম তুমি আমাদের সেবা করবে, যত্ন নেবে। তোমাকে নিয়ে আমাদের কত আশা ছিল, কত সাধ। সব আশা নির্মূল হয়ে গেল।

বর্ধমান সেই উপসর্গেও অবিচলিত রইলেন।

সংগমক তখন সেখানে এক স্কন্ধাবারের সৃষ্টি করলেন। স্কন্ধাবারের সূপকারেরা বর্ধমানের পা দুটোকে উনুন করে অগ্নি প্রজ্বলিত করল। সেই অগ্নি বর্ধমানের সমস্ত শরীর দগ্ধ করল। দগ্ধ হয়েও বর্ধমান পুড়ে গেলেন না। অনলদগ্ধ স্বর্ণের মত তাঁর শরীর আরও কান্তিমান হয়ে উঠল। সেই অনলে বর্ধমানের কর্মরূপী কাষ্ঠসমূহ দগ্ধ হয়ে গেল।

সংগমক তাঁকে ধ্যানচ্যুত করতে বারবার অসমর্থ হয়ে নিজের কাছে লজ্জিত হলেন কিন্তু অহমিকা বশে নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিতে পারলেন না। তাই তিনি নিরস্ত না হয়ে তাঁকে আরও উৎপীড়ন করতে লাগলেন। চণ্ডাল হয়ে তাঁর দেহকে দণ্ডের মত ব্যবহার করে শৃঙ্খলাবদ্ধ নানা ধরনের পাখি তাঁর গায়ে ঝুলিয়ে দিলেন। তারা চঞ্চু ও নখর দিয়ে তাঁর দেহকে বিক্ষত করল।

তারপর তিনি এক প্রবল বাত্যার সৃষ্টি করলেন। বাত্যায় বৃক্ষমূল উৎপাটিত হল, সৌধশ্রেণী ভগ্ন হল। বর্ধমানও কয়েকবার আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভূতলে পতিত হলেন তবু বর্ধমানের ধ্যানভঙ্গ হল না।

সংগমক তখন বাত্যাবর্তের সৃষ্টি করলেন। বাত্যাবর্তে বর্ধমান চক্রের মত ঘুরতে লাগলেন।

তাতেও যখন বর্ধমানের ধ্যান ভঙ্গ হল না তখন সংগমক ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ওপর কালচক্র নিক্ষেপ করলেন। কালচক্রের আঘাতে হাঁটু

অবধি বর্ধমানের শরীর মাটিতে প্রোথিত হল। তবু তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল না।

প্রতিকূল উপসর্গে সংগমক যখন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে সমর্থ হলেন না তখন তিনি অনুকূল উপসর্গের সৃষ্টি করলেন। বৈমানিক দেবতা হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, বর্ধমান, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি। বল তোমার কি চাই ?—ধন, জন, সুখ, আয়ু এমন কি স্বর্গীয় বৈভবও আমি তোমায় দিতে পারি।

বর্ধমান যখন তাতেও সাড়া দিলেন না তখন তিনি বসন্ত ঋতুর সৃষ্টি করলেন। বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবে মুহূর্তেই উদ্দাম হয়ে উঠল কিংশুক বন। মাধবীলতার পরাগে গন্ধবিধুর হল দিগন্ত। অশোকের শাখায় শাখায় শিউরে উঠল রক্ত পল্লবের আলোলগুচ্ছ। বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল আম্রমঞ্জরীর মকরন্দ। মনে হল আকাশে আকাশে কে যেন ছড়িয়ে দিয়ে গেল অনুরাগের বর্ণ, হাওয়ায় হাওয়ায় জাগিয়ে দিয়ে গেল আদিম প্রাণের উন্মাদনা।

শুধু তাই নয়, সেই বসন্তের সমাগমে সেই সুন্দর বনভূমে নেমে এল অপ্সরী ও কিন্নরীর দল যাদের কটাক্ষে অতিনীল পদ্মবনের সৃষ্টি, ভ্রূলতায় পুষ্পধনুর বক্রতা, অধরের হাস্যরাগে চৈত্রদিনের প্রসূনতা, নিশ্বাসে মলয় পাহাড়ের দক্ষিণ বাতাস। তাদের দিকে চেয়ে কে নিজেকে সংবরণ করে নিতে পারে ? কিন্তু সেই নব বসন্তের সমাগমে মধুকণ্ঠী দিব্যাঙ্গনাদের গীতস্বরেও বর্ধমানের ধ্যান ভঙ্গ হল না। নিবাত দীপশিখার মত তিনি আরও প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

সূর্যের আলো তখন ফুটতে আরম্ভ করেছে পূব আকাশে। সেই আলো ক্রমে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বর্ধমান তখন মহাপ্রতিমায় ধ্যানে সিদ্ধ হয়ে ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চলে গেলেন বালুকার দিকে।

সংগমক পরাভূত হয়েছেন, সম্পূর্ণরূপে পরাভূত। মরুর মত বর্ধমানের ধৈর্য, সাগরের মত বর্ধমানের গম্ভীরতা। কিন্তু পরাভূত হয়ে সংগমক এখন কোন মুখে স্বর্গে ফিরে যাবেন ? ফিরে যাবার

সেই লজ্জাই যেন তাঁকে বর্ধমানের প্রতি আরও অকরুণ করে তুলেছে। বর্ধমানকে অপদস্থ করবার জন্য তিনি তাই বদ্ধপরিকর হলেন।

বর্ধমান বালুকা হয়ে এসেছেন সুযোগ, তারপর সুচ্ছেত্তা, মলয়, হস্তীশীর্ষ আদি স্থান হয়ে তোসলি গ্রাম। তোসলি গ্রামে তিনি যখন এক বৃক্ষমূলে ধ্যানারূঢ় হয়েছেন তখন সংগমক গ্রামে গিয়ে গ্রামীণের ঘরে সিঁধ দিতে আরম্ভ করলেন।

সংগমক লোক দেখিয়েই সিঁধ দিতে গিয়েছিলেন তাই সহজেই ধরা পড়ে গেলেন। ধরা পড়ে যখন মার খেতে আরম্ভ করলেন তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা কেন অনর্থক আমাকে মারছ। আমি আমার গুরুর আদেশে সিঁধ দিতে এসেছিলাম। এতে আমার কী দোষ?

লোকেরা তখন তাঁর নির্দেশ মত বর্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল ও তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিল চড় লাথি ঘুষি যখন নিঃশেষ হল তখন তাঁকে বেঁধে আরক্ষালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। এমন সময় সেখানে এসে পড়লেন ঐন্দ্রজালিক মহাভূতিল। মহাভূতিল বর্ধমানকে দেখামাত্রই বলে উঠলেন, এঁকে কেন তোমরা বাঁধছ। এঁর সমস্ত গায়ে রাজচক্রবর্তীত্বের লক্ষণ। তাই মনে হয় ইনি ধর্মচক্রবর্তী। ইনি কখনো চোর নন্।

সেকথা শুনে তারা লজ্জিত হয়ে সংগমকের সন্ধান করতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে সংগমক অন্তর্ধান করেছেন।

বর্ধমান তোসলি হতে এলেন মোসলি। মোসলিতেও বর্ধমান যখন ধ্যানমগ্ন হয়েছেন তখন সংগমক তাঁর পাশে সিঁধ কাটবার যন্ত্রাদি রেখে সরে পড়লেন।

আরক্ষকেরা তাঁর কাছে সিঁধ কাটবার যন্ত্রাদি পেয়ে তাঁকে ধৃত করে রাজসভায় উপস্থিত করল।

সেই সময় রাজসভায় সুমাগধ নামে এক রাষ্ট্রীয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজা সিদ্ধার্থের মিত্র ছিলেন। বর্ধমানকে দেখা মাত্রই তাই তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন ও রাজাকে তাঁর পরিচয় দিয়ে তাঁকে বন্ধন মুক্ত করিয়ে দিলেন।

বর্ধমান মোসলি হতে আবার এলেন তোসলি। তোসলিতে এবার সংগমকের চক্রান্তে আরক্ষকদের হাতে ধৃত হলেন। তারা তাঁকে ক্ষত্রিয়ের কাছে প্রেরণ করল। ক্ষত্রিয় যখন নানা ভাবে প্রশ্ন করেও কোনো প্রত্যুত্তর পেলেন না তখন তাঁকে চোর ভেবে ফাঁসীর সাজা দিলেন।

বর্ধমানকে ফাঁসীর মঞ্চে তুলে দেওয়া হল। কিন্তু যতবারই তাঁর গলায় ফাঁস পরান হয় ততবারই তা ছিঁড়ে যায়। এ ভাবে এক আধবার নয়, সাত সাত বার। রাজপুরুষেরা সেকথা ক্ষত্রিয়কে গিয়ে নিবেদন করল। ক্ষত্রিয় তখন তাঁর মুক্তির আদেশ দিলেন।

তোসলি হতে বর্ধমান গেলেন সিদ্ধার্থপুর। সেখানেও তিনি চোর অপবাদে ধৃত হলেন কিন্তু অশ্ববণিক কৌশিক তাঁর পরিচয় দিয়ে তাঁকে মুক্ত করিয়ে নিল।

সংগমক যখন এভাবে তাঁকে পর্যুদস্ত করতে পারলেন না তখন ভিন্ন পথ নিলেন। বর্ধমান যখন যেখানে ভিক্ষা নিতে যান, সংগমক তাঁর আগে আগে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। বর্ধমানকে শ্রমণ ধর্মের নিয়মানুযায়ী তাই ভিক্ষে না নিয়েই সেখান হতে ফিরে যেতে হয়। এভাবে এক আধ দিন নয় দীর্ঘ ছ'মাস তিনি কোথাও ভিক্ষে গ্রহণ করতে পারলেন না।

বজ্রগ্রামে সেদিন ভিক্ষা গ্রহণ করতে গেছেন বর্ধমান। গিয়ে দেখেন সংগমক সেখানে আগে হতেই উপস্থিত।

বর্ধমান যখন ভিক্ষা না নিয়েই সেখান হতে ফিরে যাচ্ছেন তখন সংগমক তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও তাঁকে নমস্কার করে বললেন : দেবার্য, ইন্দ্র আপনার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন—আপনার মত ধ্যানী বা ধীর নেই, তা অক্ষরশঃ সত্য। আমি এতদিন আপনাকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করেছি, আপনার ধ্যান ভাঙবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। বাস্তবে আপনি সত্য-প্রতিজ্ঞ, আমি ভগ্ন-প্রতিজ্ঞ। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি আর বাধা দেব না। আপনি ভিক্ষের যান।

বর্ধমান সেদিনও ভিক্ষা না নিয়ে ফিরে গেলেন। পরদিন এক গ্রাম-বৃদ্ধার হাতে পায়সান্ন গ্রহণ করে দীর্ঘ ছ'মাসের উপবাস ভঙ্গ করলেন।

বজ্রগ্রাম হতে অলংভিয়া, সেয়বিয়া হয়ে তিনি এলেন শ্রাবস্তী। তারপর কৌশাম্বী, বারাণসী, রাজগৃহ ও মিথিলা হয়ে বৈশালী। বৈশালীর বাইরে সমরোত্থান বলে যে উত্থান ছিল সেই উত্থানে বলদেব মন্দিরে অবস্থান করলেন। বৈশালীতেই তিনি এবারের বর্ষাবাস ব্যতীত করবেন।

বৈশালীতে থাকেন শ্রেষ্ঠী জিনদত্ত। জিনদত্তের এখন পূর্বের সে সমৃদ্ধি নেই। তাই সকলে তাঁকে জিন শ্রেষ্ঠী না বলে, বলে জীর্ণ শ্রেষ্ঠী। কিন্তু সে যা হোক, জিন শ্রেষ্ঠী ছিলেন খুবই সরল ও শ্রদ্ধা-বান। বর্ধমান তাই যখন সমরোত্থান উত্থানে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি প্রতিদিন এসে তাঁর বন্দনা করে যেতেন ও তাঁকে তাঁর ঘরে ভিক্ষা নেবার জন্য আমন্ত্রণ করতেন।

বর্ধমানের চাতুর্মাসিক তপ ছিল। তাই তিনি ভিক্ষা নিতেই যান না। তাছাড়া শ্রমণকে আমন্ত্রিত হয়ে ভিক্ষা নিতে যেতে নেই।

বর্ধমানকে ভিক্ষা নিতে নগরে যেতে না দেখে জিন শ্রেষ্ঠী ভাবলেন, বর্ধমানের হয়ত মাসিক তপ রয়েছে। তাই মাসান্তে তিনি বর্ধমানকে তাঁর ঘরে ভিক্ষা গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

কিন্তু বর্ধমান সেদিন ও তারপরেও ভিক্ষাচর্যায় গেলেন না।

জিন শ্রেষ্ঠী তখন ভাবলেন, বর্ধমানের হয়ত দ্বিমাসিক তপ রয়েছে।

এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ মাসও অতীত হয়ে গেল। চাতুর্মাস্যের শেষের দিন জিন শ্রেষ্ঠী আবার তাঁর প্রার্থনা জানালেন ও নিজের ঘরে গিয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করে রইলেন।

বর্ধমান সেদিন ভিক্ষায় গেলেন—কিন্তু জিন শ্রেষ্ঠীর ঘরে গেলেন না, অভিনব শ্রেষ্ঠীর ঘরে ভিক্ষা নিয়ে তিনি তাঁর অবস্থান স্থানে ফিরে এলেন। অভিনব শ্রেষ্ঠীর দাসী দারুহস্তকে করে তাঁকে কলাই সেদ্ধ ভিক্ষা দিল। তিনি তাই গ্রহণ করে তাঁর চাতুর্মাসিক তপের পারণ করলেন।

জিন শ্রেষ্ঠী যখন সেকথা জানতে পারলেন তখন মনে মনে একটু

দুঃখিত হলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত যখন তিনি বুঝতে পারলেন বর্ধমান কেন তাঁর ঘরে ভিক্ষা নিতে আসেন নি।

॥ ১২ ॥

বর্ধমান বৈশালী হতে এলেন সুংসুমারপুর। সুংসুমারপুর হতে ভোগপুর। তারপর নন্দীগ্রাম, মেঁঢ়িয়গ্রাম হয়ে কৌশাম্বী।

কৌশাম্বীতে বর্ধমান এক ভীষণ অভিগ্রহ গ্রহণ করলেন। অভিগ্রহ অর্থ মানসিক সঙ্কল্প—যে সঙ্কল্প পূর্ণ হলে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করবেন, নইলে নয়। সে অভিগ্রহ মুণ্ডিত মাথা, হাতে কড়া পায়ে বেড়ী, তিন দিনের উপবাসী দাসত্ব প্রাপ্ত কোনো রাজকন্যা ভিক্ষার সময় অতীত হয়ে গেলে কুলোর প্রান্তে কলাই সেদ্ধ নিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁকে যদি ভিক্ষে দেয় তবেই তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করবেন।

কিন্তু এধরনের অভিগ্রহ সহজেই পূর্ণ হবার নয়। তাই বর্ধমান রোজই নগরে ভিক্ষায় যান আর রোজই ভিক্ষা না নিয়ে ফিরে আসেন।

একদিন বর্ধমান ভিক্ষা নেবার জন্য এসেছেন কৌশাম্বীর অমাত্য সুগুপ্তের ঘরে। সুগুপ্তের স্ত্রী নন্দা নিজের হাতে পরমান্ন সাজিয়ে তাঁকে ভিক্ষা দিতে এলেন। কিন্তু বর্ধমান সে ভিক্ষা না নিয়ে ফিরে গেলেন।

নন্দা জৈন শ্রাবিকা ছিলেন। তাই মনে মনে দুঃখিতা হলেন ও নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

নন্দাকে বিষাদগ্রস্তা দেখে তাঁর পরিচারিকা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, দেবী, উনি ভিক্ষা নেননি বলে আপনি দুঃখিত হবেন না। উনি প্রতিদিনই নগরে ভিক্ষাচর্যায় আসেন আর প্রতিদিনই ভিক্ষা না নিয়ে ফিরে যান।

সেকথা শুনে নন্দা বুঝতে পারলেন বর্ধমানের এমন কোনো অভিগ্রহ রয়েছে যা পূর্ণ না হবার জন্য তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করতে পারছেন না।

কিন্তু কি সে অভিগ্রহ ?

সে অভিগ্রহের কথা কারু জানবার উপায় নেই। বর্ধমান সে অভিগ্রহের কথা নিজে হতে কাউকে বলবেন না।

সুগুপ্ত তাই ঘরে আসতেই নন্দা তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বললেন। বললেন, তোমার বুদ্ধিচাতুর্যে ধিক যদি তুমি তাঁর কী অভিগ্রহ তা না জানতে পার। তোমার অমাত্য পদে অভিষিক্ত থাকাও বৃথা যদি না কৌশাম্বীতে বর্ধমান ভিক্ষা পান।

যখন তাঁদের মধ্যে এই কথা হচ্ছিল তখন সেখানে দাঁড়িয়েছিল রাণী মৃগাবতীর দূতী বিজয়া। বিজয়া সেকথা গিয়ে মৃগাবতীকে নিবেদন করল। মৃগাবতী শতানীককে বললেন। বললেন, বর্ধমান আজ কয়েকমাস ধরে নগরে ভিক্ষাচর্যায় আসছেন কিন্তু ভিক্ষা না নিয়েই ফিরে যাচ্ছেন। অথচ তিনি কেন ভিক্ষা নিচ্ছেন না—সেকথা কারু মনে এল না, বা তাঁর কী অভিগ্রহ তাও জানা গেল না।

শতানীক সুগুপ্তকে ডেকে পাঠালেন। সুগুপ্ত তথ্যবাদী পণ্ডিতদের। তাঁরা অনেক শাস্ত্র মন্থন করে সেখানে দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব বিষয়ক যে সব অভিগ্রহের কথা লিপিবদ্ধ আছে ও সাত রকমের যে পিণ্ডৈষণা ও পানৈষণা তা নিরূপিত করে শ্রমণদের আহার ও জল দেবার যে রীতি তা বিবৃত করলেন। রাজাও সেই তথ্য নগরে প্রচারিত করে দিলেন ও সেই ভাবে বর্ধমানকে ভিক্ষা দিতে বললেন। কিন্তু বর্ধমান তবু ভিক্ষা গ্রহণ করলেন না।

সেই অভিগ্রহ নেবার পর ছ'মাস প্রায় অতীত হতে চলেছে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকী। বর্ধমান সেদিন ভিক্ষায় এসেছেন শ্রেষ্ঠী ধনবাহের ঘরে।

না ঘরের মধ্যে না ঘরের বাইরে ঠিক দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মলিন বসনা একটি মেয়ে। মুণ্ডিত যার মাথা, হাতে হাত-কড়া, পায়ে বেড়া। হাতে কুলোর কোণে রাখা সেদ্ধ কলাই। ভাবনায় বিভোর। বর্ধমানের ওপর চোখ পড়তেই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

উৎফুল্ল হয়ে উঠল কারণ সে মনে মনে তাঁরই আগমন প্রতীক্ষা করছিল। ভাবছিল, আজ তিন দিনের আমার উপবাস। এই সময় যদি তিনি আসেন তবে তাঁকে ভিক্ষা দিয়ে আমি আহার গ্রহণ করি।

মেয়েটি তাই উদ্ভাসিত মুখে স্খলিত পায়ে বর্ধমানকে ভিক্ষা দিতে গেল।

বর্ধমান ভিক্ষা নেবার জন্য হাত দুটি প্রসারিতও করেছিলেন কিন্তু তখুনি আবার তা গুটিয়ে নিলেন।

তবে কি তার অন্তরের প্রার্থনা বর্ধমানের কানে পৌঁছয় নি—না তার হৃদয়ের আকুতি ?

মুহূর্ত মাত্রই। মুহূর্তের মধ্যে নামল মেয়েটির চোখ বেয়ে শ্রাবণের অজস্র বন্যা। অঝোর ধারায়। সেই জলের ধারায় তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। সব আজ তার ব্যর্থ। তার জীবন, তার প্রতীক্ষা, তার প্রার্থনা, সব। সে কি এতই ভাগ্যহীনা যে তার হাতে শ্রমণ বর্ধমানও ভিক্ষা গ্রহণ করলেন না।

কিন্তু না। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সে দেখল বর্ধমান যেন থমকে দাঁড়ালেন। তারপর এক এক পা করে এগিয়ে এলেন। আবার হাত দুটো প্রসারিত করলেন তার সামনে। না, আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। সে কম্পিত হাতে কুলোর কোণে রাখা সেই কলাই সেদ্ধর সমস্তটা বর্ধমানের হাতে ঢেলে দিল।

মুহূর্তের মধ্যে সেই কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল কৌশাম্বীতে—বর্ধমান ভিক্ষাগ্রহণ করেছেন শ্রেষ্ঠী ধনবাহের ঘরে ক্রীতদাসী চন্দনার হাতে। এই সেই চন্দনা যাকে তিনি নগরের চৌমাথা হতে কিনে নিয়ে এসেছিলেন। মেয়েটি রূপসীই ছিল না; তার চারপাশে ছিল শুভ্রতার, নির্মলতার এক পরিমণ্ডল। তাই তিনি তাকে ক্রীতদাসীদের ঘরে না পাঠিয়ে নিজের অন্তঃপুরে স্থান দিয়েছিলেন, নিজের মেয়ের মত ব্যবহার করেছিলেন। আর চন্দনের মত শীতল তার ব্যবহার বলে তার নাম দিয়েছিলেন চন্দনা।

কিন্তু চন্দনার প্রতি শ্রেষ্ঠীর এই অহেতুক স্নেহই হল চন্দনার কাল। শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী মূলা এর জন্য বিষ চোখে দেখতে লাগলেন চন্দনাকে। ভাবলেন, চন্দনা তার রূপের জন্য হয়ত একদিন কর্ত্রী হয়ে উঠবে এই ঘরের। সেদিন সে তার সপত্নীই হবে না, সেদিন সন্তানহীনা মূলার কোন মর্যাদাই থাকবে না শ্রেষ্ঠীর চোখে।

কিন্তু শ্রেষ্ঠীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি করতে পারেন মূলা? তাছাড়া শ্রেষ্ঠীর অনুরাগের এখনো তিনি কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান নি।

তবু চন্দনার প্রতি তাঁর দুর্ব্যবহারের সীমা নেই।

কিন্তু শেষে একদিন সেই অনুরাগের প্রমাণও পাওয়া গেল। অন্ততঃ মূলার তাই মনে হল। মূলা দেখলেন, শ্রেষ্ঠী সেদিন মধ্যাহ্নে ঘরে আসতেই চন্দনা যেভাবে ভৃঙ্গারে করে তাঁর পা ধোয়াবার জল নিয়ে এল। তারপর তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর পা ধুইয়ে দিল।

শ্রেষ্ঠী অবশ্যই নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, নিজেই ধুয়ে নিতে পারবেন। অন্যদিন অন্য দাসীরাই ধুইয়ে দেয়। আজ কেউ নিকটে ছিল না। তাই চন্দনা জল নিয়ে এসেছে। কিন্তু চন্দনা তাঁর কথা শুনল না।

তারপর পা ধোয়াবার সময় কেমন করে তার চুলের গ্রন্থি খুলে গিয়ে সমস্ত চুল এলিয়ে পড়ল। কিছু মাটিতে গিয়ে পড়ল। চুলে কাদা লাগবে ভেবে শ্রেষ্ঠী সেই চুল আলগোছে তুলে নিয়ে আবার তার মাথায় গ্রন্থি বেঁধে দিলেন।

মূলা এই দৃশ্য নিজের চোখেই দেখলেন। এর মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু মূলার চোখে ঈর্ষার অঞ্জন। মূলা তাই সমস্তটাকে অনুরাগের লক্ষণ বলে ধরে নিলেন।

এর জন্য চন্দনাকে কি শাস্তি দেওয়া যায়? শুধু শাস্তি কেন, তাকে কী একেবারেই সরিয়ে দেওয়া যায় না? মূলা সেদিন হতে সেই সুযোগেরই অপেক্ষা করে রইলেন।

সেই সুযোগও আবার সহসাই এসে গেল। শ্রেষ্ঠী কি একটা কাজে তিন দিনের জন্য কৌশাম্বীর বাইরে গেলেন। মূলা সেই

অবসরে এক ক্ষৌরকারকে ডেকে তাঁর স্বামী চন্দনার যে চুল স্পর্শ করেছিলেন তা কাটিয়ে ফেললেন। তারপর তার হাতে কড়া, পায়ে বেড়ী পরিয়ে নীচের এক অন্ধকার কুঠরীতে বন্ধ করে দিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। যাবার আগে অন্যান্য দাসদাসীদের বলে গেলেন একথা যেন তারা শ্রেষ্ঠীর কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করে।

শ্রেষ্ঠী ফিরে এসে তাই মূলার পিতৃগৃহে যাবার সংবাদ পেলেন কিন্তু চন্দনার কোনো খবরই পেলেন না।

শ্রেষ্ঠী চন্দনার জন্য চিন্তিত হলেন ও তার ব্যাপক অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। তখন এক বৃদ্ধা দাসী সমস্ত কথা তাঁকে খুলে বলল। বলল, মূলার ভয়েই তারা শ্রেষ্ঠীকে এতক্ষণ সমস্ত কথা খুলে বলতে পারে নি।

শ্রেষ্ঠী তখন চন্দনা যে কুঠরীতে বন্ধ ছিল সেই কুঠরীর দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলেন ও দরজা খুলে তাকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলেন। চন্দনার তখনকার স্থিতি দেখে তাঁর চোখেও জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু চন্দনাকে তখনই কিছু খেতে দেওয়া দরকার। ঘরে আর কিছু নেই। রান্নাঘরেও কুলুপ দেওয়া। শ্রেষ্ঠী তাই গাই বাছুরের জন্য যে কলাই সেদ্ধ করা ছিল তাই পাত্রের অভাবে কুলোর এক কোণে রেখে নিয়ে এলেন ও চন্দনাকে তাই খেতে দিয়ে কামার ডাকতে গেলেন—চন্দনার হাতের কড়া, পায়ের বেড়ী কাটিয়ে দিতে হবে। শ্রেষ্ঠী যেই গেছেন আর বর্ধমানও সেই এসেছেন।

কিন্তু কে এই চন্দনা? কে সেই ভাগ্যবতী যার হাতে বর্ধমান ভিক্ষা গ্রহণ করলেন? শ্রেষ্ঠীর গৃহে কৌশাম্বীর সমস্ত লোক ভেঙে পড়েছে। শতানীক এসেছেন আর পদ্মগন্ধা মৃগাবতী। সুগুপ্ত এসেছেন ও নন্দা। সকলের দৃষ্টি এখন চন্দনার ওপর।

তোমরা কাকে বলছ চন্দনা? এত বসুমতী—বলে এগিয়ে এল রাজান্তঃপুরের এক বৃদ্ধা দাসী। এ যে রাজা দধিবাহনের মেয়ে বসুমতী।

মৃগাবতী এবারে চন্দনাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছেন। বলেছেন, বসুমতী, আমি যে তোর মাসী হই। যুদ্ধে তোর বাবা মারা যাবার পর আমি তোদের অনেক সন্ধান করিয়েছি। কিন্তু কোনো সন্ধান পাইনি। শুনি, প্রাসাদ আক্রমণ হলে তোরা প্রাসাদ পরিত্যাগ করে কোথায় যেন চলে গেলি।

তখন প্রকাশ পেল প্রাসাদ আক্রমণের সময় এক সুভট যে ভাবে তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মা ধারিণী শীল রক্ষার জন্য যে ভাবে নিজের প্রাণ দিলেন। বসুমতী আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কিন্তু সুভটের হৃদয় পরিবর্তন হওয়ায় সে তাকে আশ্বস্ত করে কৌশাম্বীতে নিয়ে আসে। কিন্তু তার স্ত্রীর বিরূপতায় সে শেষ পর্যন্ত চন্দনাকে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। প্রথমে তাকে কিনতে চেয়েছিল কৌশাম্বীর এক রূপোপজীবিনী। কিন্তু সে তার ঘরে যেতে অস্বীকার করে। পরে শ্রেষ্ঠী ধনবাহ তাকে ক্রয় করে নিয়ে আসেন।

মৃগাবতী আর একবার তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, বসুমতী আজ হতে তোর সমস্ত দুঃখের অবসান হল।

সেকথা শুনে চন্দনা চোখের জলের মধ্য দিয়ে হাসল। হাসল, কারণ সংসারে কি দুঃখের শেষ আছে! যদিও চন্দনার বয়স খুব বেশী নয়, তবু সে সংসারের নির্লজ্জ রূপটাকে দেখেছে। দেখেছে মানুষের লালসা ও লোভ, নীচতা ও উৎপীড়ন। সংসারে তার আর মোহ নেই। সে শান্তি চায়, জন্ম মৃত্যুর এই প্রবাহ হতে মুক্তি।

চন্দনা তাই রাজান্তঃপুরে ফিরে গেল না। প্রতীক্ষা করে রইল সেইদিনের যেদিন বর্ধমান কেবল-জ্ঞান লাভ করে সর্বজ্ঞ তীর্থংকর হবেন। বর্ধমান যখন জ্ঞান লাভ করে সর্বজ্ঞ তীর্থংকর হলেন সেদিন চন্দনা এসে তাঁর কাছে সাধ্বী ধর্ম গ্রহণ করল। মেয়েদের মধ্যে চন্দনাই তাঁর প্রথম শিষ্যা।

চন্দনা এই জীবনেই সাধ্বী ধর্ম পালন করে জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ হতে মুক্তি লাভ করেছিল।

আর মৃগাবতী? মৃগাবতীও পরে সাধ্বী ধর্ম গ্রহণ করে শ্রমণী

সঙ্ঘে প্রবেশ করেছিলেন যার সর্বাধিনায়িকা ছিল আর্যা চন্দনা। কিন্তু সেকথা এখানে নয়।

বর্ধমান কৌশাম্বী হতে সুমঙ্গল, সুচ্ছেত্তা, পালক আদি গ্রাম হয়ে এলেন চম্পায়। চম্পায় তিনি তাঁর প্রব্রজ্যা জীবনের দ্বাদশ চাতুর্মাস্য ব্যতীত করবেন।

বর্ধমান সেখানে এসে আশ্রয় নিলেন স্বাতি দত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালায়।

সেই যজ্ঞশালায় বর্ধমানের তপশ্চর্যায় প্রভাবিত হয়ে প্রতি রাত্রে তাঁকে বন্দনা করতে আসে পূর্ণভদ্র ও মণিভদ্র নামে দু'জন যক্ষ। বর্ধমানের সঙ্গে তাদের কথা হয়। স্বাতি দত্ত যেদিন সেকথা জানতে পারলেন সেদিন তিনিও এলেন তাঁর কাছে ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হয়ে। এসেই প্রশ্ন করলেন, এই শরীরে আত্মা কে?

বর্ধমান প্রত্যুত্তর দিলেন, যা আমি শব্দের বাচ্যার্থ, তাই আত্মা।

আমি শব্দের বাচ্যার্থ বলতে আপনি কী বলতে চান?

স্বাতি দত্ত, যা এই দেহ হতে সম্পূর্ণ-ই ভিন্ন এবং সূক্ষ্ম।

ভগবন্, কি রকম সূক্ষ্ম? শব্দ, গন্ধ ও বায়ুর মত সূক্ষ্ম কী?

না স্বাতি দত্ত, কারণ চোখ দিয়ে শব্দ, গন্ধ ও বায়ুকে দেখা না গেলেও, অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে এদেরকে গ্রহণ করা যায়। যেমন কান দিয়ে শব্দকে, নাক দিয়ে গন্ধকে, ত্বক দিয়ে বায়ুকে। যা কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করা যায় না তাই সূক্ষ্ম; তাই আত্মা।

ভগবন্, তবে কি জ্ঞানই আত্মা?

না, স্বাতি দত্ত। জ্ঞান তার অসাধারণ গুণ মাত্র, আত্মা নয়। যার জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানীই আত্মা।

স্বাতি দত্ত অন্য প্রশ্ন করলেন। বললেন, ভগবন্ প্রদেশন শব্দের অর্থ কী?

বর্ধমান বললেন, প্রদেশন শব্দের অর্থ উপদেশ। উপদেশ দুই ধরনের: ধার্মিক, অধার্মিক।

স্বাতি দত্ত, প্রত্যাখ্যান অর্থ নিষেধ। নিষেধও দুই ধরনের। মূলগুণ প্রত্যাখ্যান, উত্তর গুণ প্রত্যাখ্যান। আত্মার দয়া, সত্যবাদিতা আদি স্বাভাবিক মূলগুণের রক্ষা ও হিংসা, অসত্যাদি বৈভাবিক প্রবৃত্তির পরিত্যাগ মূলগুণ প্রত্যাখ্যান। এই মূলগুণের সহায়ক সদাচারের বিপরীত আচরণের ত্যাগ উত্তরগুণ প্রত্যাখ্যান।

এই সব প্রশ্নোত্তরের ফলে স্বাতি দত্তের বিশ্বাস হল বর্ধমান কেবল মাত্র কঠোর তপস্বীই নন, মহাজ্ঞানীও।

॥ ১৩ ॥

চাতুর্মাস্য শেষ হতে বর্ধমান সেখান হতে এলেন জংভিয় গ্রাম। জংভিয় গ্রামে কিছুকাল অবস্থান করে মেঁঢ়িয় হয়ে এলেন ছম্মানি। ছম্মানিতে গ্রামের বাইরে তিনি ধ্যানস্থিত হলেন।

যেখানে তিনি ধ্যানস্থিত হলেন, সেখানে এক গোপ খানিক বাদে এসে তার বলদ দুটো ছেড়ে দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেল। তারপর গ্রাম হতে ফিরে এসে যখন সে সেখানে তার বলদ দুটো দেখতে পেল না তখন বর্ধমানকে জিজ্ঞাসা করল, দেবার্য, আপনি কী আমার বলদ দুটো দেখেছেন?

বর্ধমান ধ্যানে ছিলেন, তাই কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না।

প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় গোপ ক্রুদ্ধ হল ও কাষ্ঠশলাকা এনে তাঁর কানের ভেতর প্রবেশ করিয়ে কালা সাজাবার সাজা দিল। এমনভাবে প্রবেশ করাল যাতে তা কর্ণপট ভেদ করে মাথার ভেতর পরস্পর মিলিত হয় অথচ বাইরে থেকে দেখলে কিছুই যেন বোঝা না যায়।

বর্ধমানের সেই সময় অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছিল কিন্তু তবু তিনি ধ্যানে নিশ্চল রইলেন।

ধ্যান ভঙ্গের পরও সেই শলাকা নিষ্কাশন করবার কোনো প্রযত্নই তিনি করলেন না, সেইভাবে সেই অবস্থায় প্রব্রজন করে পরদিন

সকালে এলেন মধ্যমা পাবায়। ভিক্ষাচর্যার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠী সিদ্ধার্থের ঘরে গেলেন।

শ্রেষ্ঠী সেই সময় ঘরে ছিলেন। তাঁর মিত্র বৈদ্য খরকও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বর্ধমানের মুখাকৃতি দেখা মাত্রই বৈদ্যরাজ বলে উঠলেন, দেবার্যর শরীর সর্বসুলক্ষণযুক্ত হলেও সশল্য।

সেকথা শুনে সিদ্ধার্থ কোথায় শল্য রয়েছে তা দেখতে বললেন।

খরক তখন বর্ধমানের সমস্ত শরীর নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারলেন, যে তাঁর কানের ভেতর শলাকা বিদ্ধ রয়েছে।

খরক ও সিদ্ধার্থ তখন বর্ধমানের সেই শলাকা নিষ্কাশনের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু বর্ধমান তাঁদের নিবারিত করে গ্রামের বাইরে গিয়ে আবার ধ্যানস্থিত হলেন।

কিন্তু নিবারিত হয়েও খরক ও সিদ্ধার্থ নিবৃত্ত হলেন না। তাঁকে অনুসরণ করে তিনি যেখানে ধ্যানস্থিত ছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ও তাঁকে ধরে তেলের এক দ্রোণীর মধ্যে বসিয়ে প্রথমে সর্বাঙ্গে তৈলমর্দন করলেন ও পরে সাঁড়াশী দিয়ে তাঁর দুই কান হতে দুই কাষ্ঠশলাকা টেনে বার করলেন। বর্ধমান অসাধারণ ধৈর্যশীল হওয়া সত্ত্বেও সেই সময় তীব্র বেদনায় চীৎকার দিয়ে উঠলেন। শলাকা নিষ্কাশন করবার পর খরক তাঁর কানের ভেতর সংরোহণ ঔষধিতে ভরে দিলেন।

গোপের অত্যাচারের উপসর্গ দিয়ে বর্ধমানের প্রব্রজ্যা জীবনের আরম্ভ হয়েছিল, গোপের অত্যাচারের উপসর্গ দিয়েই তার শেষ হল।

বর্ধমানকে যে সব উপসর্গের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তার মধ্যে জঘন্য উপসর্গ ছিল কটপুতনাকৃত শীত উপসর্গ; মধ্যম উপসর্গের মধ্যে সংগমক সৃষ্ট কালচক্র নিক্ষেপ উপসর্গ ও উৎকৃষ্ট উপসর্গের মধ্যে খরক কৃত শলাকা নিষ্কাশনরূপ এই উপসর্গ।

বর্ধমান প্রব্রজ্যা নেবার পর সাড়ে বারো বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। এই দীর্ঘকাল তাঁর অনুপম জ্ঞান, অনুপম দর্শন, অনুপম

চারিত্র, অনুপম লাঘব, অনুপম ক্ষান্তি, অনুপম মুক্তি, অনুপম প্রাপ্তি, অনুপম সত্য, অনুপম সংযম ও অনুপম ত্যাগের দ্বারা আত্মানুসন্ধান করতে করতেই ব্যয়িত হয়েছে। এখন উপস্থিত হয়েছে তাঁর কেবল জ্ঞান লাভের চরম মুহূর্ত।

বর্ধমান মধ্যমা পাবা হতে এসেছেন আবার জংভীয়গ্রামে। সেখানে জংভীয়গ্রামের বাইরে ঋজুবালুকার উত্তর তীরে শ্যামাকের ভূমিতে শালবৃক্ষের নীচে ধ্যানস্থিত হয়েছেন। বর্ধমান সেদিন ছু'দিনের উপবাসী ছিলেন। সেখানে সেই ধ্যানাবস্থায় দিনের চতুর্থ প্রহরে শুক্ল ধ্যানের পৃথকত্ব-বিতর্ক-সবিচার, একত্ব-বিতর্ক-অবিচার অবস্থা অতিক্রম করে জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায় এই চার রকম ঘাতি কর্মের ক্ষয় করে কেবল-জ্ঞান ও কেবল-দর্শন লাভ করলেন।

এই চরম উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও দর্শন অনন্ত, ব্যাপক, সম্পূর্ণ, নিরাবরণ ও অব্যাহত, যে জন্য এর প্রাপ্তির পর সমস্ত লোকালোকের সমস্ত পর্যায় বর্ধমানের দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। তিনি অর্হন্ অর্থাৎ পূজনীয়, জিন অর্থাৎ রাগদ্বেষজয়ী ও কেবলী অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হলেন।

সেদিন বৈশাখ শুক্লা দশমী ছিল। চন্দ্রের সঙ্গে উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রের যোগ ছিল।

তীর্থংকর

॥ ১ ॥

কেবল-জ্ঞান লাভ করে ঋজুবালুকা তীর হতে বর্ধমান একরাত্রে বারো যোজন পথ অতিক্রম করে এলেন মধ্যমা পাবায়।

মধ্যমা পাবায় আসবার কারণ তখন সেখানে এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন আচার্য সোমিল। সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করবার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সর্ব ভারতীয় পণ্ডিতদের। বর্ধমান দেখলেন, তিনি যদি এখন সেখানে যান, যদি সেই সর্ব ভারতীয় পণ্ডিতদের স্বমতে আনতে পারেন তবে নির্গ্রন্থ ধর্ম প্রচারে তা তাঁকে অনেকখানি সাহায্য করবে। তাঁরা তাঁর তীর্থ প্রতিষ্ঠার কাজে শরিক হবেন।

বর্ধমান তীর্থ প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন, তিনি তীর্থংকর।

যাঁরা কেবল কেবল-জ্ঞান লাভ করে নিজেরাই মুক্ত হন তাঁরা জিন, অর্হৎ, কেবলী, কিন্তু তীর্থংকর নন্। যাঁরা নিজেরা মুক্ত হয়ে অন্যের মুক্তির পথ নিরূপণ করে দেন ও চতুর্বিধ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁরা তীর্থংকর।

জিন, অর্হৎ বা কেবলী অনেক হয়েছেন, কিন্তু তীর্থংকর ?

এই অবসর্পিণীতে মাত্র চব্বিশটি। বর্ধমান সেই চব্বিশ সংখ্যক তীর্থংকর।

অবশ্য বর্ধমান মধ্যমা পাবা যাবার আগে দেবতারা ঋজুবালুকা তীরে তাঁর ধর্মসভা বা সমবসরণের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু সেই সমবসরণে কেবল মাত্র দেবতারা উপস্থিত ছিলেন। তাই বর্ধমানের উপদেশে কেউই সংযম ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন নি। তীর্থংকরের উপদেশ এভাবে কখনো ব্যর্থ যায় না। তাই এই ঘটনাকে জৈন সাহিত্যে 'অছেরা' বা আশ্চর্যজনক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বর্ধমান মধ্যমা পাবায় এসে মহাসেন উদ্যানে আশ্রয় নিলেন।

বৈশাখ শুক্লা দশমী। বর্ধমানের উপদেশ শুনতে দলে দলে মানুষ চলেছে। কেউ হেঁটে, কেউ রথে, কেউ চতুর্দোলায়। কারু চিনাংশুকের বসন, কেউ নিরাভরণ। পশুপক্ষীও চলেছে। আকাশ পথে দেবতারা।

বর্ধমান সেই উপদেশ সভায় সকলকে সম্বোধিত করে উপদেশ দিলেন। বললেন জীব ও অজীবের কথা, পাপ ও পুণ্যের কথা, আস্রব ও বন্ধের কথা, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষের কথা।

মানুষ যেমন কর্ম করে তেমনি ফলভোগ। সৎকর্ম করলে স্বর্গ, অসৎ কর্ম করলে নরক।

কিন্তু স্বর্গও কি কাম্য? মানুষ স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ করে। যজ্ঞে পশু বলি দেয়। জীবহত্যা করে।

হিংসা কখনো ধর্ম হতে পারে না। স্বর্গ-সুখও অশাশ্বত। স্বর্গ হতেও মানুষ ভ্রষ্ট হয়। তাই মুক্তিই একমাত্র কাম্য।

জীব মুক্তই। অনন্ত জ্ঞান, দর্শন, বীর্য ও আনন্দ তার স্বরূপ। শুধু কর্মের আবরণ তাকে আবৃত করে রেখেছে। যেমন লাউয়ের খোল। মাটির প্রলেপ দিয়ে জলে ফেলে দিলে ডুবে যায়। কিন্তু মাটি গলে গেলেই আবার ভেসে ওঠে।

কর্মসংস্পৃষ্ট মানুষ সংসারসমুদ্রে ডুবে রয়েছে। কর্মের আবরণ দূর করে দাও আবার ভেসে উঠবে, ঊর্ধ্বগতি লাভ করবে।

কর্মসংস্পৃষ্ট হওয়ার নামই আস্রব। আস্রবের পরিণাম বন্ধ।

সঞ্চিত কর্মের যেমন ক্ষয় করতে হবে, তেমনি নূতন কর্ম বন্ধনের নিরোধ। এরই নাম সংবর ও নির্জরা। চৌবাচ্চার জল খালি করে দিলেই হবে না, দেখতে হবে তাতে যেন নূতন জল জমে না ওঠে।

কর্ম যখন নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখন মুক্তি।

এরজন্য সর্ব নিয়ন্তা ঈশ্বরের কল্পনা করবার দরকার নেই কারণ তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন বললে কে তাঁকে সৃষ্টি করেছিল, তাঁর স্বরূপ কি সে সব প্রশ্নও তুলতে হয়।

তাই বিশ্বাস করো জীব অনাদি। কর্মও অনাদি। তবে কর্মের অন্ত আছে, কর্ম অনন্ত নয়। কর্ম অন্তের যে পথ সেইপথ জিন নির্দিষ্ট পথ, সেপথ সম্যক দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্রের পথ।

এই সত্য, এছাড়া সত্য নেই এই বিশ্বাসের নাম সম্যক দর্শন। এই বিশ্বাসজনিত যে সত্য জ্ঞান তাই সম্যক জ্ঞান। তদনুরূপ যে আচরণ তাই সম্যক চারিত্র।

সম্যক দর্শন বা বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। চাই জ্ঞান, তত্ত্বের অবধারণ। কিন্তু তত্ত্বের অবধারণও বৃথা যদি না হয় তদনুরূপ আচরণ। তাই এই তিনটিকে একত্রে আরাধনা করতে হয়।

এই তিনটি মিলে এক ত্রিপুটি—ত্রিরত্ন। তিনে এক, একে তিন।

সম্যক চারিত্রের জন্য অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থংকর অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ও অপরিগ্রহের কথা বলেছিলেন; মহাবীর তার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য যোগ করে দিলেন।

পার্শ্বনাথের চতুর্যাম ধর্ম তাই হল পঞ্চযাম।

বর্ধমান বললেন মনুষ্য জন্মের দুর্লভতার কথা। মানুষই কেবল মুক্ত হতে পারে, আর কেউ নয়। দেবতারাও মুক্ত হতে পারেন না কারণ স্বর্গ কর্মভূমি নয়, ভোগভূমি। মুক্তির জন্য তাই দেবতাদেরও মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়।

মানুষ হয়ে জন্মান সুলভ নয়, কত জন্ম-জন্মান্তরের ভেতর দিয়ে জীব মানুষ হয়ে জন্মায়।

মানুষ হয়ে জন্মালেই কী সদ্ধর্ম শ্রবণ হয়? হয় না। সদ্ধর্ম শ্রবণ তাই দুর্লভ।

সদ্ধর্ম শ্রবণ হলেই কি হয় তাতে শ্রদ্ধা—বিশ্বাস? শ্রদ্ধা তাই দুর্লভ।

কিন্তু শ্রদ্ধা হলেই কি সব হয়? হয় না, যদি না থাকে উদ্যম। দুর্লভ তাই ধর্মে উদ্যম।

বর্ধমান তাই সবাইকে ডাক দিয়ে বললেন, সময়ং মা পমায়য়—ওঠো, জাগো অলস হয়ে সময় ক্ষেপ কোরো না। কালগত হয়ে যেমন ঝরছে গাছের পাতা তেমনি ঝরছে আয়ু, সময়। যা পাবার তা দ্রুত লাভ কর।

বর্ধমানের কথা শ্রোতাদের মনে নিয়েছে। মনে নিয়েছে কেন না বর্ধমান সুন্দর করে সহজ করে বলেছেন ধর্মের তত্ত্ব। বলেন নি, আমার কাছে এসো, আমি তোমায় মুক্তি দেব। বলেছেন মুক্তি তোমার জন্মগত অধিকার। মুক্তি তোমার হাতের মুঠোয় মধ্যে। শুধু তাকে জানো, বোঝ, লাভ কর।

বর্ধমানের কথা আরও ভালো লেগেছে তার কারণ তিনি ধর্মের তত্ত্ব বলেন নি বিদ্বৎজনের ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষায়, দুরূহ শব্দের সমাবেশে। বলেছেন সহজ করে, সাধারণের বোধগম্য লোক ভাষায়, অর্ধমাগধীতে।

বর্ধমানের কথা তাই এখন লোকের মুখে মুখে। ঘাটে মাঠে বাটে, অন্তঃপুরিকাদের অন্তঃপুরে, রাজন্যদের রাজসভায়, বিদ্বৎজনের আলোচনাচক্রে।

ক্রমে সেই কথা সোমিলাচার্যের যজ্ঞশালায় গিয়ে পৌঁছল। শুনে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

যজ্ঞে উপস্থিত বিদ্বৎজনদের মধ্যে ইন্দ্রভূতিই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। ইনি গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাই গৌতম নামেও আবার ইনি অভিহিত হতেন। বাসস্থান মগধান্তর্বর্তী গোবর গ্রাম। পিতার নাম বসুভূতি, মায়ের নাম পৃথিবী। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। শিষ্য সংখ্যা পাঁচশ।

বর্ধমানের খ্যাতির কথা শুনে গৌতমই সর্ব প্রথম জলে উঠলেন। কারণ তাঁর নিজের জ্ঞানের গর্ব ছিল। নিজেকে তিনি সর্বজ্ঞ ভাবতেন। এক খাপে যেমন দুই তলোয়ার থাকে না, সেই রকম এক সময়ে দুই সর্বজ্ঞ। তাই তিনি মহাসেন উদ্যান হতে প্রত্যাগত একজনকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখলে সেই সর্বজ্ঞ?

জবাব এল, সে কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। যেমন জ্ঞানী, তেমনি মধুক্ষরা তাঁর বাণী।

সেকথা শুনে গৌতম আরও জ্বলে উঠলেন। বর্ধমানকে তাঁকে বাদে পরাস্ত করতে হবে। এ তাঁর প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। নইলে তাঁর সর্বজ্ঞত্ব থাকবে না। আবার ভাবলেন, সত্যিই কী বর্ধমান সর্বজ্ঞ! না কোনো শঠ, প্রবঞ্চক বা ঐন্দ্রজালিক নিজের সম্মোহনী শক্তিতে সবাইকে বিভ্রান্ত করছে। যাকেই সে বিভ্রান্ত করুক কিন্তু তাঁকে বিভ্রান্ত করা সহজ নয়। গৌতম তখন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে মহাসেন উদ্যানের দিকে যাত্রা করলেন।

গৌতম সত্যিই বড় পণ্ডিত ছিলেন। বাদে সবাইকে তিনি পরাস্ত করেছেন। কোথাও পরাজিত হননি। কিন্তু পাণ্ডিত্য এক, সাধনলব্ধ সিদ্ধি আর। তাই যখন বর্ধমানের সামনে এসে উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাঁর যোগৈশ্বর্য ও তপঃপ্রভাবে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি বর্ধমানকে তর্কে পরাস্ত করতে এসেছিলেন কিন্তু এখন দেখলেন তাঁকে তর্কে পরাস্ত করবার কোনো প্রবৃত্তিই যেন তাঁর আর নেই। বরং আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর যে সংশয় ছিল সে সংশয়ের কথা মনে এল। মনে মনে ভাবলেন—ইনি যদি অজিজ্ঞাসিতভাবে সেই সংশয়ের নিরসন করে দেন তবে তিনি তাঁকে সর্বজ্ঞ বলে স্বীকার করে নেবেন।

গৌতমকে তদবস্থ দেখে বর্ধমানই প্রথম কথা বললেন। বললেন, ইন্দ্রভূতি গৌতম, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই না তোমার সন্দেহ। আত্মা আছে কী নেই—তাই নয় কী?

আশ্চর্য চকিত হলেন গৌতম। কী করে জানলেন ইনি তাঁর মনের কথা, তাঁর নাম? তবে নিশ্চয়ই ইনি তাঁর সংশয়েরও নিরসন করে দিতে পারবেন। গৌতম তাই আরও বিনীত হয়ে বললেন, হ্যাঁ ভগবন্।

কিন্তু কেন?

কেন? ভগবন্, বেদেই ত সেকথা রয়েছে। বিজ্ঞানঘন

এবৈভেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি। ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি।

কিন্তু গৌতম, স বৈ অয়মাত্মা জ্ঞানময়ঃ ইত্যাদি বাক্যে বেদে আত্মার অস্তিত্বও ত আবার স্বীকৃত হয়েছে?

হ্যাঁ, ভগবন্। আমার শঙ্কার কারণও তাই।

গৌতম, তুমি যেমন বিজ্ঞানঘনর অর্থ করছ, বাস্তবে তা তার অর্থ নয়। বিজ্ঞানঘন ইত্যাদি বাক্যের অর্থ আত্মায় প্রতিনিয়ত যে জ্ঞান পর্যায়ের উদ্ভব ও পূর্ববর্তী জ্ঞান পর্যায়ের লোপ হয় তাই। এখানে পদার্থের জ্ঞান পর্যায়ই বিজ্ঞানঘন যা ভূত বা জ্ঞেয় পদার্থ হতে উৎপন্ন হয়। ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তির তাৎপর্যও পরলোকের সঙ্গে নয়। যখন নূতন জ্ঞান পর্যায়ের উদ্ভব হয় তখন পূর্ববর্তী জ্ঞান পর্যায় স্ফুটিত হয় না এই মাত্র।

বর্ধমানের মুখে বেদবাক্যের এমন অপূর্ব সমন্বয় শুনে ইন্দ্রভূতি গৌতমের অজ্ঞানান্ধকার মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল। তিনি করজোড়ে বর্ধমানের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ভগবন্, আমি নির্গ্রন্থ প্রবচন শুনতে অভিলাষী।

বর্ধমান তখন তাঁকে নির্গ্রন্থ প্রবচনের উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশে গৌতম সংসারবিরক্ত হয়ে তাঁর শিষ্যসহ বর্ধমানের কাছে শ্রমণধর্ম গ্রহণ করলেন।

ইন্দ্রভূতি শ্রমণধর্ম গ্রহণ করেছেন সে খবর মুহূর্তেই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। শুনে কেউ বললে বর্ধমান জ্ঞানের অগাধ বারিধি; কেউ বলল ধর্মের সাক্ষাৎ অবতার। তা নইলে গৌতমকে পরাস্ত করা মানুষের সাধ্য নয়।

ইন্দ্রভূতির পরাজয় ও শ্রমণধর্ম গ্রহণের খবর তাঁর ছোট ভাই অগ্নিভূতিও শুনলেন। তিনিও মধ্যমা পাবার যজ্ঞশালায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। প্রথমে ইন্দ্রভূতির পরাজয় হয়েছে সে কথা তাঁর বিশ্বাসই হয়নি। পূবের সূর্য পশ্চিমে উদিত হতে পারে কিন্তু ইন্দ্রভূতির পরাজয় কখনো নয়। কিন্তু ইন্দ্রভূতি যখন মহাসেন

উদ্যান হতে ফিরে এলেন না তখন তিনি খানিকটা ক্ষোভ, খানিকটা অভিমান, খানিকটা আশ্চর্যচকিত ভাব নিয়ে তাঁর পাঁচশ জন শিষ্যসহ মহাসেন উদ্যানের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর এ বিশ্বাস তখন দৃঢ় ছিল যে বর্ধমানকে পরাস্ত করে তাঁর অগ্রজ ইন্দ্রভূতি গৌতমকে তিনি আবার যজ্ঞশালায় ফিরিয়ে আনবেন।

অগ্নিভূতি যজ্ঞশালা হতে যে আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে বেরিয়েছিলেন মহাসেন উদ্যানের দিকে যতই এগিয়ে যেতে লাগলেন ততই দেখলেন তা যেন ক্রমশই স্তিমিত হয়ে আসছে। তারপর যখন তিনি বর্ধমানের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন তিনি যেন আর এক মানুষ।

বর্ধমানই প্রথম কথা বললেন। বললেন, অগ্নিভূতি, কর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই না তোমার সন্দেহ?

অগ্নিভূতি বললেন, হ্যাঁ, ভগবন্।

তার কারণ?

কারণ শ্রুতি যখন পুরুষ এবেদং গ্নিং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং এই বাক্যে পুরুষাদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা করছে, যখন দৃশ্য অদৃশ্য, বাহ্য অভ্যন্তর, ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু পুরুষই তখন পুরুষের অতিরিক্ত কর্মের অস্তিত্ব কিভাবে স্বীকার করা যায়? তাছাড়া যুক্তিতেও কী কর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়? কর্মবাদীরা বলেন, যেমন কর্ম তেমনি ফল। জীব যেমন কর্ম করে তেমনি ফল লাভ করে। জীব নিত্য, অরূপী ও চেতন, অথচ কর্ম অনিত্য, রূপী ও জড়। সে ক্ষেত্রে এদের সম্বন্ধ অনাদি না সাদি অর্থাৎ কোনো সময়ে হয়েছিল? যদি কোনো সময়ে হয়ে থাকে তার অর্থ হল জীব তার পূর্ববর্তী সময়ে কর্মরহিত ছিল কিন্তু এই মান্যতা কর্মসিদ্ধান্তের প্রতিকূল। কারণ কর্মসিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবের কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রবৃত্তি পূর্ববদ্ধ কর্মের জন্য। সেক্ষেত্রে মুক্ত জীব কোনো সময়েই বদ্ধ হতে পারে না। কারণ বদ্ধ হবার কারণের সেখানে সর্বথা অভাব। যদি বলা হয় জীব অকারণে কর্মবদ্ধ হয় তবে একথাও বলা যেতে পারে যে মুক্তাত্মারও

পুনরায় কর্মবদ্ধ হতে পারে। সেক্ষেত্রে কাউকেই আর মুক্ত বলা যাবে না। যদি জীব ও কর্মের সম্বন্ধকে অনাদি বলা হয় তবে কর্মও আত্ম স্বরূপের মত নিত্য। যা নিত্য তা কখনো বিনষ্ট হয় না। সেক্ষেত্রে জীব কোনো সময়েই কর্মমুক্ত হবে না। যদি কর্মমুক্তই না হবে তবে মুক্তির জন্য প্রয়াসও নিরর্থক।

বর্ধমান বললেন, অগ্নিভূতি, তোমার কথাতেই বোঝা যায় যে তুমি পুরুষ এবেদং ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে পারনি। এই শ্রুতিবাক্য পুরুষাদ্বৈতবাদের সাধক নয়, স্তুতি বাক্য মাত্র।

কেন ভগবন্?

এই জন্যই যে পুরুষাদ্বৈতবাদ দৃষ্টাপলাপ ও অদৃষ্টকল্পনা দোষে দুষ্ট।

সে কী রকম?

অগ্নিভূতি, সে এই রকম। পুরুষাদ্বৈত স্বীকার করলে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু আদি যা প্রত্যক্ষ তার অপলাপ হয় ও সৎ ও অসৎ হতে স্বতন্ত্র 'অনির্বচনীয়' এক অদৃষ্ট বস্তুর কল্পনা করতে হয়।

না, ভগবন্। পুরুষাদ্বৈতবাদীরা এই দৃশ্যজগৎকে পুরুষ হতে ভিন্ন মনে করেন না, তাই অপলাপের প্রশ্নই নেই। জড় ও চেতনের পার্থক্য ব্যবহারিক কল্পনা মাত্র। বস্তুতঃ যা কিছু দৃশ্য অদৃশ্য, চর অচর সমস্তই পুরুষস্বরূপ।

আচ্ছা, অগ্নিভূতি, পুরুষ দৃশ্য না অদৃশ্য?

ভগবন্, পুরুষ রূপ রস স্বাদ গন্ধ ও স্পর্শহীন, অদৃশ্য। ইন্দ্রিয় দিয়ে পুরুষকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

অগ্নিভূতি, যা চোখ দিয়ে দেখা যায়, কান দিয়ে শোনা যায়, নাক দিয়ে শোঁকা যায়, জিভ দিয়ে যার আস্বাদ নেওয়া যায় ও ত্বক দিয়ে যা স্পর্শ করা যায় তাকে তুমি কি বলবে?

ভগবন্, সে সমস্তই নাম রূপাত্মক জগৎ।

অগ্নিভূতি, এরা পুরুষ হতে ভিন্ন না অভিন্ন?

অভিন্ন।

অগ্নিভূতি, তুমি এই মাত্র বললে পুরুষ অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়াতীত। পুরুষ হতে অভিন্ন জগৎ তবে কি করে ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ের বিষয় হয়?

ভগবন্, মায়ায়। নামরূপাত্মক দৃশ্য জগতের উদ্ভব হয় মায়ায়। মায়া ও মায়া হতে উদ্ভূত নামরূপ জগৎ সৎ নয় কারণ কালান্তরে এর নাশ হয়।

অগ্নিভূতি, তবে কী দৃশ্য জগৎ অসৎ?

না, ভগবন্। যেমন তা সৎ নয়, তেমনি অসৎও নয়। কারণ জ্ঞান সময়ে তা সৎরূপে প্রতিভাসিত হয়।

সৎও নয়, অসৎও নয়, তবে তুমি তাকে কি বলবে?

সৎ ও অসৎ হতে স্বতন্ত্র এই মায়াকে আমি অনির্বচনীয় বলব।

অগ্নিভূতি, শেষ পর্যন্ত তোমাকে পুরুষাতিরিক্ত মায়ারূপ স্বতন্ত্র পদার্থকে স্বীকার করতেই হল। তবে কোথায় রইল তোমার পুরুষাদ্বৈতবাদ? অগ্নিভূতি, একটু চিন্তা কর—এই দৃশ্য জগৎ যদি পুরুষ হতে অভিন্ন হয় তবে তা ইন্দ্রিয়গোচর হতে পারে না কিন্তু তুমি সেই জগৎকে প্রত্যক্ষই দেখছ। নিশ্চয়ই তুমি একে ভ্রান্তি বলবে না?

ভগবন্, যদি আমি একে ভ্রান্তিই বলি।

অগ্নিভূতি, ভ্রান্তজ্ঞান উত্তরকালেও ভ্রান্তই প্রমাণিত হয়। কিন্তু তুমি যাকে ভ্রান্তি বলছ তা কোনো সময়েই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়নি। তাই তা ভ্রান্তি নয়। নির্বাধ জ্ঞান।

ভগবন্, বাস্তবে মায়া পুরুষেরই শক্তি। পুরুষ বিবর্ত সময়ে নামরূপাত্মক জগৎ হয়ে ভাসমান হয়। বস্তুতঃ মায়া পুরুষ হতে ভিন্ন নয়।

অগ্নিভূতি, মায়া যদি পুরুষের শক্তিই হয় তবে তা পুরুষের জ্ঞানাদি অন্য গুণের মত অরূপী ও অদৃশ্য হতে হয়। কিন্তু মায়া অদৃশ্য নয়। তাই মায়া পুরুষের শক্তি হতে পারে না। মায়া পুরুষ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাছাড়া পুরুষ বিবর্ত-স্বীকার করলেও তা হতে

পুরুষাদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। পুরুষ বিবর্তের অর্থ পুরুষের মূল স্বরূপের বিকৃতি। পুরুষ বিকৃতি স্বীকার করলে তাকে আর অকর্মক বলা যাবে না, বলতে হবে সকর্মক। যেমন সাদা জলের পচন হয় না তেমনি অকর্মক জীবে বিবর্তও হয় না। তাই পুরুষাদ্বৈতবাদীরা যাকে মায়া নামে অভিহিত করেন তা পুরুষাতিরিক্ত জড় পদার্থ। তাঁরা যে তাকে সৎ বা অসৎ না বলে অনির্বচনীয় বলেন এতেও তা যে পুরুষ হতে স্বতন্ত্র তাই সিদ্ধ হয়। সৎ নয় কারণ তা পুরুষ নয়; অসৎও নয় কারণ তা আকাশকুসুমের মত কল্পিত বস্তুও নয়।

ভগবন্, স্বীকার করছি পুরুষাদ্বৈতবাদ স্বীকার করলে প্রত্যক্ষ অনুভবের অসম্ভাব হয়। কিন্তু জড় ও রূপী কর্মপদার্থ চেতন ও অরূপী আত্মার সঙ্গে কিভাবে সম্বদ্ধ হয় ও কিভাবে তাকে প্রভাবিত করে?

যেমন অরূপী আকাশের সঙ্গে রূপময় দ্রব্যের সম্বন্ধ হয়, যেমন ব্রাহ্মী ঔষধি ও মদিরা আত্মার অরূপী চৈতন্যের ওপর ভালোমন্দ প্রভাব বিস্তার করে।

এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ও শঙ্কার সমাধান। শেষ পর্যন্ত অগ্নিভূতিকে স্বীকার করতেই হল কর্মের অস্তিত্ব। স্বীকার করতে হল জীব ও কর্মের অনাদি সম্বন্ধ। যেমন বীজ ও অঙ্কুর। হেতু হেতু রূপে বর্তমান কিন্তু সেই সম্বন্ধের অবসান করা যেতে পারে।

প্রতিবুদ্ধ হয়ে অগ্নিভূতি তখন ইন্দ্রভূতির মত তাঁর পাঁচশ জন শিষ্যসহ বর্ধমানের কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

অগ্নিভূতির পরাজয় ও শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণের খবর যখন সোমিলাচার্যের যজ্ঞশালায় গিয়ে পৌছল তখন সেখানে উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সকলেই প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন ও পরে অগ্নিভূতির ছোট ভাই বায়ুভূতিকে অগ্রবর্তী করে সশিষ্য বর্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

এঁদের মধ্যে ব্যক্ত ছিলেন কোল্লাগ সন্নিবেশের ভারদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৫০০। সুধর্মাও ছিলেন কোল্লাগ সন্নিবেশের তবে অগ্নি বৈশ্যায়ন গোত্রীয়। শিষ্য সংখ্যা ৫০০। মণ্ডিক মৌর্য

সন্নিবেশের বাশিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩৫০। মৌর্যপুত্র মৌর্য সন্নিবেশের কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩৫০। অকম্পিত মিথিলার গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩০০। অচলভ্রাতা কোশলনিবাসী হারীত গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩০০। মেতার্য তুংগিক সন্নিবেশের কৌডিন্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩০০। প্রভাস রাজগৃহের কৌডিন্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ২০০।

বায়ুভূতির শিষ্য সংখ্যা ছিল ৫০০।

এঁরা বর্ধমানকে পরাস্ত করতে গেলেন তা নয় কারণ ইন্দ্রভূতি ও অগ্নিভূতির মত পণ্ডিত যাঁর কাছে পরাজিত হয়েছেন তাঁকে পরাজিত করার কল্পনা বাতুলতা মাত্র। তাঁরা গেলেন সেই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করতে ও জীবাদি বিষয়ে তাঁদের প্রত্যেকের মনে যে যে শঙ্কা ছিল তার নিরসন করতে।

বর্ধমান তাঁদের প্রত্যেককে স্বাগত জানালেন এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক শঙ্কার নিরসন করে দিলেন। তারপর তাঁরাও সম্বুদ্ধ হয়ে বর্ধমানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এভাবে একদিনে ৪৪১১ জন ব্রাহ্মণ নির্গ্রন্থ ধর্ম গ্রহণ করলেন। বর্ধমান ইন্দ্রভূতি প্রমুখ ১১ জন পণ্ডিতদের তাঁদের নিজ নিজ গণ বা শিষ্যের ওপর সর্বাধিকার দিয়ে তাঁদের গণধর পদে অভিষিক্ত করলেন।

এই ৪৪১১ জন ছাড়াও আর যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে শ্রমণধর্ম অঙ্গীকার করলেন। যাঁরা শ্রমণ-ধর্ম অঙ্গীকারে অসমর্থ হলেন, তাঁরা শ্রাবকধর্ম গ্রহণ করলেন। এভাবে মধ্যমা পাবায় বৈশাখ শুক্লা দশমীতে বর্ধমান সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা রূপ চতুর্বিধ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করে তীর্থ প্রবর্তিত করলেন।

এই সভাতেই চন্দনাও তাঁর কাছে সাধ্বীধর্ম গ্রহণ করলেন। বর্ধমান তাঁকে সাধ্বী সঙ্ঘের নেত্রী করে দিলেন।

মধ্যমা পাবা হতে বর্ধমান এলেন রাজগৃহে।

রাজগৃহ তখন মগধের রাজধানীই ছিল না, ছিল পূর্বভারতের একটি প্রখ্যাত শহর। সেখানে তখন রাজত্ব করছেন শ্রেণিক বিম্বিসার। এই শ্রেণিকের প্রিয় মহিষী ছিলেন চেলনা। তিনি বর্ধমানের মামাতো বোন ছিলেন ও শ্রমণোপাসিকা। পার্শ্বনাথ সম্প্রদায়ের অনেক শ্রাবকও তখন বাস করতেন রাজগৃহে। বর্ধমান তাই রাজগৃহে এসে ঈশান কোণস্থিত গুণশীল চৈত্যে অবস্থান করলেন।

বর্ধমানের আসবার খবর পেয়ে রাজগৃহের লোক গুণশীল চৈত্যে ভেঙে পড়ল। শ্রেণিকও এলেন সপরিকরে।

বর্ধমান নিগ্রন্থধমের উপদেশ দিলেন। প্রথমে নিরূপণ করলেন মুনিধর্ম। তারপর শ্রাবকাচার। মুনিদের জন্য সর্ববিরতি—তাই অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও পরিগ্রহ তাদের সর্বথা পরিত্যাগ করতে হবে। শ্রাবকদের জন্যও অবশ্য সেই নিয়ম তবে তাদের ছুট দেওয়া হল। তাই আংশিক বা দেশ বিরতি—অণুব্রত। তারাও সেই একই ব্রত পালন করবে তবে স্থূলভাবে।

তবে লক্ষ্য সেই এক। তাই শ্রাবকাচারে বর্ধমান আরও যুক্ত করে দিলেন শিক্ষা ও গুণব্রত। গুণব্রতে অণুব্রতকে আরও পরিশুদ্ধ করা ও শিক্ষাব্রতে মুনিধর্ম গ্রহণের জন্য নিজেকে আরও প্রস্তুত করা।

বর্ধমান কুশলী সংগঠক ছিলেন। তাই একসূত্রে গেঁথে দিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্ঘের দুইটি অঙ্গ : গৃহী ও মুনি, শ্রাবক ও শ্রমণ।

বর্ধমানের উপদেশ অনেককেই আকৃষ্ট করল। আকৃষ্ট করল কারণ, বর্ধমান ধর্মকে মুক্ত করলেন দেববাদের নাগপাশ হতে। মুক্তি দয়ার দান নয়, মুক্তি মানুষের জন্মগত অধিকার, তাকে অর্জন করতে হয় নিজের প্রচেষ্টায়, আত্মার নির্মাণে। সেখানে পুরোহিতের কোনো ভূমিকাই নেই।

ধর্মজগতে এ এক রক্তহীন বিপ্লব। মনুষ্যত্বের এ এক নবীন উজ্জীবন। এরই আকর্ষণে মগধবাসীদের অনেকেই সেদিন তাঁর ধর্ম গ্রহণ করল। কেউ শ্রমণধর্ম, কেউ শ্রাবকধর্ম।

শ্রমণধর্ম গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন রাজপুত্র মেঘকুমার ও

নন্দীসেন। দুই বিচিত্র জীবন। এই দুই জীবনকে বর্ধমান যেভাবে পরিচালিত করে ছিলেন তা হতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাঁর লোকশিক্ষা দেবার পদ্ধতি, যা বাধ্য করে না উদ্বুদ্ধ করে, পরমুখাপেক্ষী করে না, নির্ভরতা আনে।

শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করার পর গুণশীল চৈত্যে রাত্রে শুয়ে আছেন রাজকুমার মেঘ। দীক্ষায় সর্বকনিষ্ঠ তাই সকলের শেষে তাঁর শয্যা।

হঠাৎ পাদস্পৃষ্ট হওয়ায় তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

সেই যে ঘুম ভাঙল, সেই ঘুম তাঁর আর এল না। তাঁর মাথার মধ্যে নানান চিন্তা ঘুরতে লাগল। ঘুরতে লাগল কারণ তিনি যে রাজকুমার সেকথা তিনি তখনো ভুলতে পারেন নি।

মেঘকুমার ভাবলেন সাধুদের এ ইচ্ছাকৃত অবহেলা। বর্ধমানও কি ইচ্ছা করলে তাঁকে একটু ভালো জায়গায় শুতে দিতে পারতেন না? তা নয় দিয়েছেন সকলের শেষে দরজার কাছে। তাই রাত্রে বয়োবৃদ্ধ সাধুদের কেউ উঠে যখন বাইরে যাচ্ছেন তখন তাকে মাড়িয়ে যাচ্ছেন।

ভাবতে ভাবতে মেঘকুমারের মাথা গরম হয়ে উঠল। তিনি শেষপর্যন্ত নির্ণয় করলেন এভাবে মুনিধর্ম পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তার চাইতে সংসার আশ্রমেই আবার ফিরে যাওয়া ভালো।

মেঘকুমার সেকথা বলবার জন্যই তাই পরদিন সকালে বর্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মেঘকুমারের মনোভাব বর্ধমানের অজ্ঞাত ছিল না। তাই তাকে তাঁর কাছে এসে চুপ করে দাঁড়াতে দেখে বলে উঠলেন, মেঘকুমার, তুমি একদিনেই সংযম পালনে ধৈর্য হারিয়ে ফেললে? কিন্তু তুমি ত এমন দুর্বলচিত্ত ছিলে না। তোমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ কর।

মেঘকুমারের চোখের সামনে হতে তখন যেন বিস্মরণের কালো পর্দাটা সরে গেল। সেখানে ফুটে উঠল এক স্নিগ্ধ নীলাভ আলো। সেই নীলাভ আলোয় সে দেখল এক প্রকাণ্ড বন। সেই বনে যেন

আগুন লেগেছে। সেই আগুনে বড় বড় গাছ পুড়ছে, ছোট ছোট গাছ, ঝোপ ঝাড় জঙ্গল। ক্রমশঃ সেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। লাল হয়ে উঠল আকাশ। দেখল বনের পশুরা প্রাণ ভয়ে চারদিকে ছুটছে। প্রথমে হাতীর দল গেল, তারপর বুনো মোষ, শিয়াল, হরিণ, এক ঝাঁক বনটিয়া তারপর আর এক ঝাঁক। দেখল তারা সবাই নদীর ধারে এসে ভিড় করেছে। সেখানে স্বল্পপরিসর একটুখানি জায়গা। দেখতে দেখতে তা পশুতে পাখিতে ভরে গেল। সকলের শেষে সে দেখল এল এক যূথভ্রষ্ট হাতী। জায়গা বলতে তখন আর কিছু ছিল না। সে কোন মতে এক কোণে এসে দাঁড়াল। কিন্তু পা নাড়বার তার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল তারপর এক সময় গা চুলকোবার জন্যই সে যেন পা তুলল।

সে পা তুলল আর সেই অবসরে যেখানে তার পা ছিল সেখানে এসে আশ্রয় নিল এক অল্পপ্রাণ খরগোশ।

গা চুলকিয়ে হাতীটি যখন মাটিতে পা রাখতে যাবে তখন তার চোখে পড়ে গেল সেই খরগোশটি। হাতীর মনে দয়ার উদ্রেক হল। মাটিতে পা রাখলে খরগোশটির মৃত্যু হবে ভেবে সে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ সেই আগুন জ্বলল।

তারপর যখন সেই দাবাগ্নি নিভে গেল ও বনের পশুরা নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল তখন সে তার পা নাবিয়ে মাটিতে রাখতে গেল। কিন্তু সেই পা সে মাটিতে রাখতে পারল না। তার পা অসাড় হয়ে যাওয়ায় ধপ করে সেখানেই সে পড়ে গেল।

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে সেই হাতীটি সেইখানে পড়ে রইল। নদীর জল এত কাছে তবু সেখানে গিয়ে জল খাবার তার শক্তি নেই। ভরসা—যদি বৃষ্টি হয়। করুণ চোখে সে তাই আকাশের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু একফোঁটা বৃষ্টি পড়ল না। সে তাই আগুনে পোড়া বনের ধারে নদীর তীরে এভাবে পড়ে রইল। তারপর এক সময় তার মৃত্যু হল।

মেঘকুমারের চোখে জল ভরে এসেছিল। বর্ধমান তার দিকে চেয়ে বললেন, মেঘকুমার, পূর্বজন্মে তুমি ওই হাতী ছিলে। অল্পপ্রাণ খরগোশের জন্য তোমার মনে দয়ার উদ্রেক হয়েছিল তাই তুমি এজন্মে রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ। মেঘের প্রত্যাশা করে তুমি মারা গিয়েছিলে তাই তোমার মায়ের মেঘের দোহদ হয়েছিল যার জন্য তোমার নাম রাখা হয় মেঘকুমার।

মেঘকুমারের চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠল। পশুজীবনে সে যদি একটি নগণ্য প্রাণীর জীবন রক্ষার জন্য এতখানি ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকতে পারে তবে মনুষ্য জীবনে সে কি সামান্য পা মাড়িয়ে দেওয়ায় এতখানি অধৈর্য হয়ে উঠবে ?

বর্ধমান মেঘকুমারের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, মেঘকুমার, তুমি কি সংসারাশ্রমে ফিরে যাবে ?

মেঘকুমারের সমস্ত ভাবনার তখন জট খুলে গেছে। সে বর্ধমানের চরণ স্পর্শ করে বলল, না, ভগবন্, না।

রাজপুত্র নন্দীসেন এসেছে বর্ধমানের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করতে।

বর্ধমান তার দিকে চেয়ে বললেন, নন্দীসেন, তোমার জাগতিক সুখভোগ এখনো বাকী রয়েছে, তা ক্ষয় করে এসো, তোমায় আমি দীক্ষা দেব।

কিন্তু নন্দীসেন সেকথা কানে নিল না। ভগবন্, আমার সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে। জাগতিক সুখভোগে আমার এতটুকু আসক্তি নেই।

বর্ধমান বললেন, নন্দীসেন, তোমায় আমি নিরুৎসাহ করতে চাই না, তবু আর একবার ভেবে দেখো।

নন্দীসেন বলল, আমি সমস্ত ভাবনা শেষ করে এসেছি। আমায় গ্রহণ করুন।

বর্ধমান বললেন, বেশ তবে তাই হবে।

নন্দীসেন চলে যেতে গৌতম প্রশ্ন করলেন বর্ধমানকে। ভগবন্,

আপনি যখন সকলকে চারিত্র গ্রহণ করবার জন্য অনুপ্রাণিত করছেন তখন কেন নন্দীসেনকে নিরস্ত করতে চাইলেন ?

প্রত্যুত্তরে বর্ধমান বললেন, গৌতম, সংসারে তিন রকমের কামী হয় : মন্দকামী, মধ্যকামী ও তীব্রকামী। মন্দকামীর কামবাসনা স্বল্প। তীব্র নিমিত্ত উপস্থিত না হলে তা জাগ্রত হয় না। সে তাই সহজেই সংযম পালন করতে পারে। স্ত্রীলোক হতে সে যদি দূরে থাকে তবে তার কামবাসনা জাগ্রত হবে না। সে শ্রমণ হতে পারে।

যারা মধ্যকামী তাদের যেমন স্ত্রীলোক হতে দূরে থাকতে হয় তেমনি কঠোর তপশ্চর্যাও করতে হয়। এদেরও শ্রমণ হতে বাধা নেই যদি তারা তপঃনিরত থাকে। সংসারের শতকরা পঁচানব্বুই জনই মধ্যকামী।

কিন্তু যারা তীব্রকামী তাদের ভোগবাসনা ভোগ ছাড়া উপশান্ত হয় না। তাদের শরীরের গঠনই এই রকম যে ইচ্ছে করলেও তারা কামবাসনা জয় করতে পারে না, তপশ্চর্যাতেও না। নন্দীসেন তীব্র-কামী। তাই তার এখুনি শ্রমণ হওয়া উচিত হয়নি। নন্দীসেনের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে তবু যখন তার কামবাসনার উদয় হবে তখন সে নিজেকে দমন করতে পারবে না। তাই তাকে আমি নিষেধ করেছিলাম।

ভদন্ত, তবে তাকে আপনি আবার শ্রমণ সঙ্ঘে গ্রহণ করলেন কেন ?

গৌতম, এই জন্যই তাকে গ্রহণ করলাম যে সে চারিত্র হতে বিচ্যুত হলেও তীব্র শ্রদ্ধার জন্য সম্যকত্ব হতে বিচ্যুত হবে না। সেই সম্যকত্বই তাকে একদিন আবার চারিত্রে ফিরিয়ে আনবে।

হোলও ঠিক তাই। নন্দীসেন ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে একদিন প্রেমে পড়ে গেল এক গণিকার। গণিকার চোখের জলে তার সংযমের বেড়া রইল না। সে তাই শ্রমণবেশ পরিত্যাগ করে তার সঙ্গে জাগতিক সুখভোগে লিপ্ত হল। লিপ্ত হল কিন্তু সম্যকত্ব হতে বিচ্যুত হল না। তাই যেদিন তার ভোগবাসনা উপশান্ত হল, সেদিন সে আবার বর্ধমানের কাছে ফিরে এল।

মহাবীর

পাকবিড়রা, পুরুলিয়া

খৃষ্টীয় ৯ম শতক

তীর্থংকর জীবনের প্রথম চাতুর্মাস্য বর্ধমান রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন। তারপর বর্ষাকাল অতীত হতে বিদেহের পথে এলেন ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুর।

॥ ২ ॥

এই ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুরেই বাস করেন ব্রাহ্মণ ঋষভদত্ত ও ব্রাহ্মণী দেবানন্দা। এই দেবানন্দার কুক্ষীতেই তিনি প্রথম অবতরণ করেছিলেন।

বর্ধমানের আসবার সংবাদ পেয়ে তাঁকে বন্দনা করতে এলেন ব্রাহ্মণ ঋষভদত্ত ও ব্রাহ্মণী দেবানন্দা। ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুর হতে এল তাঁর জামাতা জমালি ও কন্যা প্রিয়দর্শনা। ভগবানের উপদেশ সভায় তাঁরাও শুনলেন নিগ্রর্ন্থ ধর্মের প্রবচন। হৃদয়ে তাঁদের শ্রদ্ধার উদ্রেক হল। তাঁরা সেই সভাতেই নিগ্রর্ন্থ ধর্ম গ্রহণ করে শ্রমণ হয়ে গেলেন।

বর্ধমান একবছর বিচরণ করলেন বিদেহভূমিতে, বর্ষাবাস করলেন বৈশালীতে। তারপর বর্ষাকাল শেষ হতে গেলেন বৎস ভূমির দিকে নিগ্রর্ন্থ ধর্ম তাঁকে প্রচার করতে হবে। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে কোথাও একস্থানে অবস্থান করবার তাঁর উপায় নেই।

॥ ৩ ॥

বৎসের রাজধানী তখন কৌশাম্বী। বর্ধমান কৌশাম্বীর বহিঃস্থিত চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে এসে অবস্থান করলেন।

কৌশাম্বীতে তখন রাজত্ব করেন উদয়ন। এই সেই উদয়ন যাঁর সম্বন্ধে কালিদাস বলেছিলেন: 'উদয়ন-কথাকোবিদ্ গ্রামবৃদ্ধান্'। উদয়ন কথা নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে চার চারটি বিখ্যাত নাটক রচিত হয়েছে: ভাসের 'স্বপ্ন-বাসবদত্তম্' ও 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্' ও হর্ষের 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'রত্নাবলী'।

অবশ্য উদয়ন তখন ছোট ছিলেন। তাই তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর মা মৃগাবতী তখন রাজ্য পরিচালনা করছিলেন।

মৃগাবতী ছিলেন বৈশালী নায়ক চেটকের মেয়ে, সাংসারিক সম্পর্কে বর্ধমানের মামাতো বোন। তাই তাঁর আসবার খবর পেয়ে উদয়নকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁকে বন্দনা করতে এলেন।

সঙ্গে এলেন আরও শ্রমণোপাসিকা জয়ন্তী। জয়ন্তী মৃগাবতীর ননদ, উদয়নের পিসী, স্বর্গীয় রাজা সহস্রানীকের মেয়ে, শতানীকের বোন।

জয়ন্তীও ছিলেন শ্রমণ ধর্মের উপাসিকা ও ভক্তিমতী। তাঁর গৃহের দরজা সাধু ও শ্রমণদের জন্য ছিল সর্বদাই উন্মুক্ত।

বর্ধমান তাঁদের ধর্মোপদেশ দিলেন। বললেন আত্মজয়ের কথা। বললেন, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করো, বাইরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে কী লাভ? যে নিজের ওপর জয়লাভ করে সেই যথার্থ সংগ্রাম-বিজয়ী, সেই যথার্থ সুখী।

আরও বললেন, ক্ষমাবান হও, লোভাদি হতে নিবৃত্ত। জিতেন্দ্রিয় হও ও অনাসক্ত। সদাচারী হও ও ধর্মনিষ্ঠ।

সংসার প্রবাহে ভাসমান জীবের জন্য ধর্মই একমাত্র দ্বীপ, আশ্রয় ও শরণ।

বর্ধমানের উপদেশ সবাইকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে জয়ন্তীকে। তাই যখন সকলে চলে গেল তখনো তিনি বসে রইলেন। নানাবিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন বর্ধমানকে। শেষে এক সময়ে বললেন, ভগবন্, ঘুমিয়ে থাকা ভালো না জেগে থাকা?

বর্ধমান প্রত্যুত্তর দিলেন, কারু ঘুমিয়ে থাকা ভালো, কারু জেগে থাকা।

ভগবন্, সে কি রকম?

জয়ন্তী, যারা অধার্মিক, অধর্ম আচরণ করে, অধর্ম যাদের প্রিয় তাদের ঘুমিয়ে থাকা ভালো। কারণ তারা যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে তারা অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের যেমন কারণ হয় না তেমনি

নিজেদের আরও অধোগতিতে নিক্ষেপ করে না। অপরপক্ষে যারা ধার্মিক, ধর্ম আচরণ করে, ধর্ম যাদের প্রিয়, তাদের জেগে থাকাই ভালো। কারণ তারা যদি জেগে থাকে তবে তারা যেমন অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের কারণ না হয়ে তাদের ধর্মপথে চালিত করে তেমনি নিজেদের আরও উন্নতি সাধন করে।

জয়ন্তী বললেন, ভগবন্, জীবের দুর্বল হওয়া ভালো না সবল হওয়া?

বর্ধমান বললেন, জয়ন্তী, কারু দুর্বল হওয়া ভালো কারু সবল হওয়া।

ভগবন্, সে কি রকম?

জয়ন্তী, যারা অধার্মিক, অধর্ম আচরণ করে, অধর্ম যাদের প্রিয়, তাদের দুর্বল হওয়াই ভালো। কারণ তারা যদি দুর্বল হয় তবে তারা অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের যেমন কারণ হয় না তেমনি নিজেদের আরও অধোগতিতে নিক্ষেপ করে না। অপরপক্ষে যারা ধার্মিক, ধর্ম আচরণ করে, ধর্ম যাদের প্রিয় তাদের সবল হওয়াই ভালো। কারণ তারা যদি সবল হয় তবে তারা যেমন অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের কারণ না হয়ে তাদের ধর্মপথে চালিত করে তেমনি নিজেদের আরও উন্নতি সাধন করে।

জয়ন্তী বললেন, ভগবন্, জীবের অলস হওয়া ভালো না উদ্যমী?

বর্ধমান বললেন, জয়ন্তী, কারু অলস হওয়া ভালো কারু উদ্যমী।

ভগবন্, সে কি রকম?

জয়ন্তী, যারা অধার্মিক, অধর্ম আচরণ করে, অধর্ম যাদের প্রিয় তাদের অলস হওয়াই ভালো। কারণ তারা যদি অলস হয় তবে তারা যেমন অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের কারণ হয় না তেমনি নিজেদের আরও অধোগতিতে নিক্ষেপ করে না। অপরপক্ষে যারা ধার্মিক, ধর্ম আচরণ করে, ধর্ম যাদের প্রিয় তাদের উদ্যমী হওয়াই ভালো। কারণ তারা যদি উদ্যমী হয় তবে তারা যেমন অন্যের দুঃখ শোক ও পরিতাপের কারণ না হয়ে তাদের ধর্মপথে চালিত করে তেমনি নিজেদের আরও উন্নতি সাধন করে।

জয়ন্তী এ ধরনের আরও বহু প্রশ্ন করলেন, বর্ধমানও তার সদুত্তর দিলেন।

প্রশ্ন, দুই-ই কি করে ভালো হয়? জেগে থাকাও ভালো, ঘুমিয়ে থাকাও ভালো, দুর্বলতাও ভালো, সরলতাও ভালো, আলস্যও ভালো, উদ্যমও ভালো।

এইখানে বর্ধমানের জীবন দর্শন। সত্য একরূপী নয়, বহুরূপী। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে যাচাই করলেই তবে সত্যের সত্যিকার রূপ ধরা পড়ে।

প্রশ্ন তাই কোন অপেক্ষায় সত্য।

একই জায়গায় যখন গাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি তখন গাছ অচল কিন্তু যখন দেখি তার শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লবের বিস্তার, মাটির নীচে শেকড়ের তলবীথি তখন গাছ সচল।

গাছ সচল না অচল?

দুই-ই। কোন একটি অপেক্ষায়।

এই বর্ধমানের অনেকান্ত দর্শন।

অনেকান্ত দর্শনই জৈন দর্শন, জৈন দর্শনই অনেকান্ত দর্শন।

বিভিন্ন ধর্ম, মত ও মতবাদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার এক অভিনব সূত্র। বর্ধমানের যুগান্তকারী অবদান। বিংশ শতাব্দীর সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রথম উদ্‌ঘোষণা।

বৎস হতে বর্ধমান গেলেন উত্তর কোশলের দিকে। তারপর অনেক গ্রাম ও নগর বিচরণ করে এলেন শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তীতে কোষ্ঠক চৈত্যে তিনি অবস্থান করলেন। সেখানে তাঁর উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।

কোশল হতে তিনি আবার ফিরে এলেন বিদেহে। বিদেহের বাণিজ্যগ্রামে তিনি বর্ষার চার মাস ব্যতীত করবেন।

এই বাণিজ্যগ্রামের বহির্ভাগে কোল্লাগ সন্নিবেশে থাকেন গৃহপতি আনন্দ যাঁর চার কোটি স্বর্ণমুদ্রা মাটিতে প্রোথিত থাকত, চার কোটি

স্বর্ণমুদ্রা বৃদ্ধিতে, চারকোটি স্বর্ণমুদ্রা সম্পত্তিতে ও প্রত্যেক ব্রজে দশ হাজার করে চারটি গোব্রজ ছিল।

এই আনন্দ যখন বর্ধমানের আসার খবর পেলেন তখন তিনি শ্রদ্ধাপ্লুত মন নিয়ে বাণিজ্যগ্রামের মধ্য দিয়ে পদব্রজে দুইপলাশ চৈত্যে যেখানে বর্ধমান অবস্থান করছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ও বর্ধমানের মুখে নির্গ্রন্থ প্রবচন শুনলেন।

প্রবচন শুনে তাঁর মনে শ্রদ্ধার উদয় হল। প্রবচন অন্তে তাই তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও বর্ধমানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে বললেন, ভগবন্‌, নির্গ্রন্থ প্রবচনে আমার শ্রদ্ধা হয়েছে। নির্গ্রন্থ প্রবচনে আমি বিশ্বাস করি। নির্গ্রন্থ প্রবচন আমার রুচিকর। শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করি সে যোগ্যতা আমার নেই তাই আমাকে শ্রাবকের পাঁচটি অণুব্রত ও সাতটি শিক্ষা ও গুণব্রত প্রদান করুন।

বর্ধমান বললেন, আনন্দ, তোমার যেমন অভিরুচি। তুমি শ্রাবক ব্রত গ্রহণ কর।

শ্রাবক ব্রতের পঞ্চম অণুব্রত পরিগ্রহ-পরিমাণে সম্পত্তির সীমা নির্ণয় করে নিতে হয়; কি পরিমাণ সম্পত্তি আমি রাখব, কি পরিমাণ অর্থ।

পরিগ্রহ-পরিমাণের ধর্মীয় উদ্দেশ্য ভোগোপভোগের পরিমাণ সীমিত করা যাতে সে অহিংসা ব্রতকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু আনন্দের ক্ষেত্রে এর পরিণাম হল সুদূরপ্রসারী; শুধু ধর্মজীবনেই নয়, সমাজজীবনেও।

আনন্দ ব্যবসায়ী ছিলেন। তাই এই ব্রত গ্রহণের ফলে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত যে অর্থ অর্জিত হত তা ব্যয়িত হতে লাগল জনকল্যাণে। কারণ তা রাখবার অধিকার তাঁর আর ছিল না।

বর্ধমান ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চেয়ে ছিলেন সমাজের সংস্কারও। তাঁর লক্ষ্য ছিল সর্বোদয়। সর্বোদয়ের জন্য সাম্য। সব মানুষ সমান বললেই হবে না, দেখতে হবে সেখানে যেন আর্থিক বৈষম্যও না

থাকে। তার জন্ম পরিগ্রহ-পরিমাণ। সঞ্চয়ের সীমা নির্ধারণ, রাষ্ট্রের নির্দেশে, দণ্ডের ভয়ে নয়; স্বেচ্ছায়, ব্রত গ্রহণে।

আর্থিক বৈষম্য ধনিকদের মধ্যে যেমন আনে নৈতিক পতন, দরিদ্র, শোষিতদের মধ্যে তেমনি অসন্তোষ ও বিক্ষোভ, যার পরিণাম দ্বন্দ্ব, সংঘাত, মৃত্যু। সে অবস্থা সর্বোদয়ের পরিপন্থীই নয়, গণতন্ত্রেরও।

॥ ৪ ॥

বাণিজ্যগ্রাম হতে বর্ধমান গেলেন মগধভূমির দিকে। মগধের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে তিনি শেষে এলেন রাজগৃহে। রাজগৃহের গুণশীল চৈত্যে তিনি এবারের চাতুর্মাস্য যাপন করবেন।

রাজগৃহে অনেককেই তিনি দীক্ষিত করলেন, অনেকে শ্রাবক ব্রত গ্রহণ করল।

যাঁদের এবার তিনি দীক্ষিত করলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রেষ্ঠী শালিভদ্র ও ধন্য।

শালিভদ্র ছিলেন গোভদ্র শ্রেষ্ঠীর পুত্র। অপরিমিত ধনের অধিকারী। তাঁর যত ধন ছিল বোধহয় মগধের রাজকোষেও তত ধন ছিল না।

একবারের কথা। শ্রেণিকের রাজসভায় নেপাল হতে বণিক এল রত্ন-কম্বল নিয়ে যার এক একটির মূল্য এক লক্ষ কার্ষাপণ।

শ্রেণিক সে রত্ন-কম্বল কিনতে পারলেন না। সে রত্ন-কম্বল কিনে নিলেন শালিভদ্রের মা ভদ্রা। একটি নয়, ষোলটি। বত্রিশটি তিনি কিনতে চেয়েছিলেন তাঁর বত্রিশ পুত্রবধূর জন্য কিন্তু বণিকদের কাছে আর রত্ন-কম্বল ছিল না।

এ খবর যখন শ্রেণিকের কানে গেল তখন তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, শালিভদ্র এত কি ধনী! কিন্তু আশ্চর্য হবার তখনো তাঁর বাকী ছিল।

রানী চেলনার আগ্রহাতিশয্যে শ্রেণিক ষোলটি রত্ন-কম্বলের একটি রত্ন-কম্বল চেয়ে পাঠালেন ভদ্রার কাছ হতে, অর্থের বিনিময়ে। জবাব এল অর্থের কোনো প্রশ্নই নেই কিন্তু সেই রত্ন-কম্বলই আর ঘরে নেই। তাঁর পুত্রবধূরা এক দিন মাত্র ব্যবহার করে তা ফেলে দিয়েছে।

শুনে শ্রেণিক আবারও ভাবলেন, শালিভদ্র এত কী ধনী! তিনি এবারে শালিভদ্রকে দেখতে চাইলেন। তাঁকে রাজসভায় ডেকে পাঠালেন।

ভদ্রা বলে পাঠালেন, সম্ভব নয়। যদি শালিভদ্রকে দেখতে হয় তবে শ্রেণিককেই আসতে হবে তাঁর প্রাসাদে। তাঁর অভ্যর্থনায় কোনো ত্রুটি হবে না।

তাই শ্রেণিকই গেলেন ভদ্রার ঘরে।

শালিভদ্রের সাতমহলা বাড়ী। শালিভদ্র থাকেন সপ্তম মহলে। সেই সপ্তম মহল হতে তিনি কখনো নীচে নামেন নি, চন্দ্র সূর্যের মুখ দেখেন নি। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত কাজই দেখতেন তাঁর মা ভদ্রা।

শ্রেণিক শালিভদ্রের প্রাসাদ দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। প্রথম মহল হতে দ্বিতীয় মহলে, দ্বিতীয় মহল হতে তৃতীয় মহলে এলেন। তারপর বললেন, আমি বুড়ো মানুষ, আর পারি না; শালিভদ্রকে এখানে ডাক।

ভদ্রা তখন কি করেন। শালিভদ্রকে ডাকতে গেলেন। বললেন, রাজা এসেছেন, নীচে চল।

শালিভদ্র বললেন, তা আমি কি করব। তুমি ত সমস্ত কেনাকাটি কর। তুমিই তাকে কিনে নাও।

শুনে ভদ্রা হাসলেন। বললেন, শ্রেণিক কেনবার বস্তু নয়। তিনি রাজা, দেশের অধিপতি, সকলের স্বামী।

স্বামী! আমারও?

হাঁ হাঁ। তাঁর কথা অমান্য করতে নেই।

শালিভদ্র নীচে নেমে এলেন।

শ্রেণিক শালিভদ্রকে দেখে ফিরে গেলেন। কিন্তু শালিভদ্রের মনে এক ভাবনা রেখে দিয়ে গেলেন। আমি আমার স্বামী নই, আমারও একজন স্বামী আছে।

শালিভদ্রের সংসার তখন অসার বলে মনে হতে লাগল। তাঁকে নিজের স্বামী হতে হবে।

শুনে ভদ্রা চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হাসলেন। বললেন, পাগল।

ভদ্রার স্বামী গোভদ্র এইভাবেই একদিন সংসার পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। ভদ্রা তাই শালিভদ্রকে এতদিন আগলে রেখেছিলেন বাইরের সমস্ত সংস্রব হতে। কিন্তু শ্রেণিক একদিন এসে সব কিছু ওলটপালট করে দিয়ে গেলেন। তাঁকে আর ধরে রাখা সম্ভব হল না।

তবু ভদ্রা শেষ চেষ্টা করতে ছাড়লেন না। বললেন, শালিভদ্র, এত দিনের সংসার কি একদিনে ছাড়া যায়? তুমি একটু একটু করে ছাড়।

শালিভদ্র তখন তাঁর স্ত্রীর এক একজনকে পরিত্যাগ করতে লাগলেন।

শালিভদ্রের বোন সুন্দরী। শ্রেষ্ঠী ধন্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

সুন্দরী তখন স্বামীর পরিচর্যা করছিলেন। হঠাৎ শালিভদ্রের বৈরাগ্যের কথা মনে হওয়ায় তাঁর চোখ দিয়ে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল।

ধন্য তাই দেখে তাঁর দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

সুন্দরী তখন সব কথা খুলে বললেন। শুনে ধন্য হাহা করে হেসে উঠলেন। বললেন, এমন অদ্ভুত কথা ত জীবনে কখনো শুনিনি। বৈরাগ্য যখন হয় তখন সংসার একেবারেই চলে যায়। একটু একটু করে যায় না।

সেকথা শুনে সুন্দরী ভাবলেন যে ধন্য তাঁর ভাইকে তাচ্ছিল্য করছেন। তাই বললেন, মুখে বলা সহজ, কাজে করা শক্ত। একবারে তুমি ছাড় দেখি।

এই ছাড়লাম বলে ধন্য সেই মুহূর্তেই সংসার পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

ধন্য সংসার পরিত্যাগ করেছেন শুনে শালিভদ্রও তখন সংসার পরিত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন। তারপর তাঁরা দু'জনে বর্ধমানের কাছে গিয়ে শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করলেন।

শালিভদ্রের সেই এক জীবন আর এই এক জীবন। ভোগের চরম সীমা হতে চলে এলেন ত্যাগের চরম সীমায়। তপস্যায় যে শরীর ফুলের মত কোমল ছিল তাকে শুষ্ক করলেন।

বহুদিন পরের কথা। গ্রামানুগ্রাম বিচরণ করতে করতে সেবারও বর্ধমান এসেছেন রাজগৃহে।

আট দিনের উপবাসের পর পারণ করবেন বলে ভিক্ষাচর্যায় যাবার মুখে বর্ধমানের আদেশ নিতে এসেছেন শালিভদ্র। বর্ধমান বললেন, শালিভদ্র, আজ মা'র কাছ হতে ভিক্ষা নিয়ে এস।

শালিভদ্র মার কাছে ভিক্ষা নিতে গেলেন। কিন্তু ধন্য ও শালিভদ্রের শরীরের এত পরিবর্তন হয়েছিল যে ভদ্রা তাঁদের চিনতেই পারলেন না। তাছাড়া অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁদের ভিক্ষাও দিলেন না।

সেই সময় সেই পথ দিয়ে এক গোয়ালিনী দই নিয়ে বাজারে চলেছিল। শালিভদ্রকে দেখে তার মনে বাৎসল্য ভাবের উদয় হল। সে তখন মুনিদের বন্দনা করে তাঁদের দই ভিক্ষা দিল।

শালিভদ্র দই নিয়ে বর্ধমানের কাছে ফিরে এলেন। বললেন, ভগবন্, আমি মার কাছে ভিক্ষা পেলাম না।

বর্ধমান বললেন, শালিভদ্র, তুমি তোমার মার কাছেই ভিক্ষা পেয়েছ। তবে ইহজন্মের মা নয়, পূর্বজন্মের মা। সে জীবনে দরিদ্রের ঘরে তোমার জন্ম হয়। তোমার মায়ের এত সঙ্গতি ছিল না যে তোমায় রোজ দুধ দই খাওয়ায়। একবার তুমি পায়েস খেতে চাওয়ায় চেয়ে-চিন্তে তোমার মা তোমার জন্য একটুখানি দুধ নিয়ে আসে। পায়েস রান্না করে। তুমি সেই পায়েস নিজে না খেয়ে সে সময় সাধুরা হঠাৎ এসে উপস্থিত হলে তাঁদের ভিক্ষা দিয়ে দাও।

শালিভদ্র, তোমার সেই পুণ্যকাজের ফলে তুমি ইহজন্মে ধনী শ্রেষ্ঠীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছ ও তোমার পূর্বজন্মের মা দুধ দই খাওয়াতে চেয়েছিল বলে গোয়ালিনী হয়ে।

ভদ্রা যখন জানতে পারলেন যে ধন্য ও শালিভদ্র তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে গিয়ে ভিক্ষা না পেয়ে ফিরে এসেছেন তখন চোখের জল আর রাখতে পারলেন না। তিনি তখন তাদের দেখতে গেলেন বিপুলাচল পাহাড়ে যেখানে তারা অবস্থান করছিল।

॥ ৫ ॥

চাতুর্মাস্য শেষ হতে রাজগৃহ হতে বর্ধমান এলেন চম্পায়।

চম্পায় তখন রাজত্ব করেন রাজা দত্ত। বর্ধমানের প্রবচনে মুগ্ধ হয়ে এই দত্তের পুত্র মহাচন্দ্র শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করলেন।

বর্ধমান যখন চম্পায় অবস্থান করছিলেন তখন সিন্ধু সৌবীরের রাজা উদ্রায়ণ যিনি নির্গ্রন্থ শ্রাবক ছিলেন একদিন পৌষধশালায় বসে বসে চিন্তা করছিলেন : সেই গ্রাম, সেই জনপদ ধন্য যেখানে শ্রমণ ভগবান বর্ধমান বিচরণ করছেন, তারাই ভাগ্যশালী যাঁরা প্রত্যহ তাঁর সাক্ষাৎ লাভ ও বন্দনা করে ধন্য হচ্ছে। যদি তিনি আমার ওপর অনুগ্রহ করে বিতভয় পত্তনে এসে মৃগবন উদ্যানে অবস্থান করেন তবে তাঁর পরিচর্যা করে আমিও ধন্য হই।

চম্পা নগরীর পূর্ণভদ্র চৈত্যে বসে বর্ধমান উদ্রায়ণের সেই মনোভাব অবগত হলেন। তাঁর ওপর অনুগ্রহ করে চম্পা হতে বিতভয় পত্তনের দিকে প্রস্থান করলেন। চম্পা হতে বিতভয় পত্তনের দূরত্ব ছিল কম করেও ৫০০ ক্রোশের ওপর। তাছাড়া পথের মধ্যে ছিল রাজস্থানের বিস্তৃত মরুভূমি। কিন্তু পথের দূরত্ব, যাত্রার কষ্ট বর্ধমানকে কবে নিরস্ত করেছে? বর্ধমান তাই সেই কঠিন পথ অতিক্রম করে একদিন বিতভয় পত্তনে এসে উপস্থিত হলেন ও উদ্রায়ণকে শ্রমণ দীক্ষায় দীক্ষিত করলেন।

বিতভয় পত্তনে বর্ধমান কিছুকাল অবস্থান করলেন তারপর আবার বিদেহের দিকে ফিরে গেলেন।

সেই দীর্ঘ মরুভূমির পথেই প্রত্যাবর্তন। তার ওপর গ্রীষ্ম ঋতু। ক্রোশের পর ক্রোশ ধুধু করা মরুভূমি ছাড়া কোথাও কোনো জনবসতি নেই। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাঁটাগাছ ছাড়া আর কোনো ছায়া নেই। তাই ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে শ্রমণদের পথ অতিক্রম করতে হল।

এমনি এক দিনের কথা। ক্ষুধায় যখন তারা কাতর তখন পথের মধ্যে তাদের দেখা হল একদল সার্থবাহের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে তিল ছিল। সেই তিল তারা শ্রমণদের দিতেও চাইল। যখন আর কিছু নেই তখন তিল দিয়েই তারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করুক। কিন্তু না। শ্রমণের চর্যায় তার ব্যতিক্রম হয়। যে অন্ন অপক্ব, বীজরূপ তা শ্রমণ গ্রহণ করতে পারে না।

বর্ধমান নিয়মে কঠোর।

কঠোর তাই আর একদিন যখন পিপাসায় সকলে কাতর, যখন জলেরও সন্ধান পাওয়া গেল, বর্ধমান বললেন, না। শ্রমণের অপক্ব জল খেতে নেই। তাই জলের কূয়ো পেছনে ফেলে তাদের এগিয়ে যেতে হল।

তারপর একদিন সেই দুঃখের পথও শেষ হল। তিনি ফিরে এলেন বিদেহের বাণিজ্যগ্রামে। বাণিজ্যগ্রামেই তিনি সেই বর্ষাকাল ব্যতীত করবেন।

॥ ৬ ॥

চাতুর্মাস্য শেষ হতে বর্ধমান গেলেন বারাণসীর দিকে। সেখানে ঈশান কোণ স্থিত কোষ্ঠক চৈত্যে অবস্থান করলেন।

বারাণসীতেও বর্ধমান অনেক শিষ্য সংগ্রহ করলেন যাদের প্রমুখ ছিলেন চুলনীপিতা ও তাঁর স্ত্রী শ্যামা, সুরাদেব ও তাঁর স্ত্রী ধন্যা।

বারাণসী হতে রাজগৃহের পথে বর্ধমান এলেন আলভিয়া। আলভিয়ায় শঙ্খবন উদ্যানে তিনি কিছুকাল অবস্থান করলেন।

এই শঙ্খবন উদ্যানের কাছেই থাকেন তপস্বী পোগ্‌গল, কঠিন তপশ্চর্যার জন্য যিনি বিভঙ্গ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এই বিভঙ্গ জ্ঞানে ব্রহ্ম দেবলোক পর্যন্ত দেবতাদের গতি ও স্থিতিকে তিনি প্রত্যক্ষ দেখতে লাগলেন।

সেই বিভঙ্গ জ্ঞান লাভ করাতেই পোগ্‌গলের মনে হল যে তিনি শুদ্ধ কেবল-জ্ঞান লাভ করে ফেলেছেন। তাঁর আর কিছু জানবার বা দেখবার বাকী নেই। পোগ্‌গল আলভিয়ার রাজপথে দাঁড়িয়ে সেকথা সবাইকে বলতে লাগলেন।

ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে সেকথা শুনে এলেন ইন্দ্রভূতি গৌতম। ফিরে এসেই তিনি বর্ধমানকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, এখন আলভিয়ায় পোগ্‌গলের জ্ঞান ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। পোগ্‌গল নাকি বলেছে যে ব্রহ্মলোক পর্যন্তই দেবলোক তারপর দেবলোক নেই। তাদের আয়ু দশ হাজার বছর হতে দশ সাগরোপম পর্যন্ত। ভগবন্, সে কি সত্য?

বর্ধমান বললেন, না গৌতম। পোগ্‌গলের জ্ঞান অবাধ জ্ঞান নয়। তা সীমিত। ব্রহ্মলোকের পরও দেবতাদের বাসভূমি আছে। সর্বশেষ অনুত্তর বিমান যেখানে দেবতাদের আয়ু দশ হাজার বছর হতে তেত্রিশ সাগরোপম পর্যন্ত।

বর্ধমানের এই স্পষ্টীকরণ আলভিয়াবাসীরা যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারাও শুনল। তারা বর্ধমানের কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। শেষে সেকথা পোগ্‌গলের কানে গেল।

বর্ধমান সর্বজ্ঞ, বর্ধমান তীর্থংকর, বর্ধমান মহাতপস্বী পোগ্‌গল সেকথা আগেই শুনেছিল। তাই বর্ধমানের কথায় সে শঙ্কিত হয়ে উঠল ও সত্য নির্ণয়ের জন্য তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

পোগ্‌গল বর্ধমানকে বন্দনা ও নমস্কার করে আসন গ্রহণ করল। তারপর বলল, ভগবন্, আমি যে দেবলোকের অবধি পর্যন্ত দেখতে

পাচ্ছি তা আপনি স্বীকার করেন না। আপনিই বলুন এরপর আর কোন কোন দেবলোক রয়েছে?

বর্ধমান বললেন, পোগ্‌গল্‌, তুমিই তার আগে বল, তুমি যে শেষ দেবলোক দেখতে পাচ্ছ সে কি রকম?

ভগবন্‌, সেখানে সকলেই সুখী, সকলেই আনন্দময়।

পোগ্‌গল, সেই দেবলোকের কি ইন্দ্র রয়েছেন?

হ্যাঁ, ভগবন্‌।

পোগ্‌গল, ইন্দ্রের সেবার জন্য সেখানে কি দাসদাসী দেবতারা নিযুক্ত রয়েছে?

হ্যাঁ, ভগবন্‌।

ইন্দ্র ও তাঁর পরিজন ছাড়া অন্য যে দেবতা রয়েছে ও দাসদাসী দেবতা, তাদের সংখ্যা কত?

সাধারণ দেবতা ও দাসদাসীদের সংখ্যা ইন্দ্র ও তাঁর পরিজনের সংখ্যার চাইতে অনেক বেশী।

পোগ্‌গল, তা হলে তুমি একথা কি করে বলছ যে সেখানে সকলেই সমান সুখী, সকলেই সমান আনন্দময়। তুমি যে দেবলোক দেখছ সেখানে সামান্য দেবতাই সুখী; সাধারণ ও দাসদাসী দেবতা সুখী নয়। তাই তা সর্বশেষ স্বর্গ হতে পারে না। সর্বশেষ স্বর্গে সকলেই সমান সুখী, সকলেই সমান আনন্দময়। পোগ্‌গল, তুমি যখন সেই দেবলোক দেখতে পাচ্ছ না তখন তুমি কি করে বলছ যে তুমি সর্বশেষ দেবলোক দেখতে পাচ্ছ?

ভগবন্‌, আপনি ঠিকই বলছেন। আপনি আমায় সেই অন্তিম দেবলোকের কথা বলুন।

পোগ্‌গল, স্বর্গ দুই রকমের। এক কল্পোৎপন্ন, দুই কল্পাতীত। যেখানে ইন্দ্র আছেন ও তাঁর প্রজা, দাসদাসী তা কল্পোৎপন্ন। সেখানে মর্ত্যের পৃথিবীর চাইতে সুখ অনেক বেশী কিন্তু সেই সুখই চরম সুখ নয়। কারণ সেখানে একজন যেমন বেশী সুখী, সেই পরিমাণে অন্যরা বেশী দুঃখী। কিন্তু যেমন যেমন ঊর্ধ্বতর দেবলোকে যাওয়া যায়

তেমন তেমন পরিগ্রহের পরিমাণ কমতে থাকে ও দুঃখী দেবতাদের সংখ্যাও কম হতে থাকে। দ্বাদশ সংখ্যক দেবলোক অচ্যুত। নীচের এগারোটি দেবলোকের চাইতে সেখানে অনেক বেশী সুখ। কিন্তু পোগ্‌গল, তারপরও এমন দেবলোক রয়েছে যেখানে সকলে সুখী। সে কল্পাতীত দেবলোক। সেখানে দাসদাসী নেই, না রাজা প্রজা, সেখানে সকলেই ইন্দ্র। তাই তাদের অহমিন্দ্র বলা হয়। তাদের প্রয়োজনও কম। যতটুকু প্রয়োজন হয় তা আপনা হতেই পূর্ণ হয়ে যায়। এই কল্পাতীত দেবলোকে নয় গ্রৈবেয়ক ও পাঁচ অনুত্তর বিমান। সর্বশেষ বিমান সর্বার্থসিদ্ধি।

ভগবন্, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার দৃষ্টি সীমিত। আপনি আমায় শ্রমণ সঙ্ঘে গ্রহণ করুন।

পোগ্‌গল, তোমার যেমন অভিরুচি।

পোগ্‌গলের বর্ধমানের কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণের খবর মুহূর্তে সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেল।

বর্ধমানের লোকোত্তর প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে আলভিয়ার বহু সংখ্যক জন সমুদায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। এঁদের মধ্যে ছিলেন কোটিপতি গৃহস্থ চুল্লশতক ও তাঁর স্ত্রী বহুলা। তাঁরা শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করলেন।

আলভিয়া হতে বর্ধমান এলেন রাজগৃহ।

রাজগৃহেই তিনি বর্ষাবাস যাপন করলেন।

॥ ৭ ॥

বর্ষাবাসের পরও বর্ধমান রাজগৃহেই রয়ে গেলেন। কারণ মগধাধিপ শ্রেণিক তখন ঘোষণা করেছিলেন যে, যে শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করবে তার পরিবার পরিজন প্রতিপালনের ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। শ্রেণিকের সেই ঘোষণায় প্রভাবে বহু লোক সেদিন শ্রমণ সঙ্ঘে প্রবেশ করতে এগিয়ে এসেছিল। তাঁদের মধ্যে যেমন ছিল

রাজপুত্র, রাজমহিষী, তেমনি ছিল সাধারণ মানুষ—তন্তুবায়, কুমোর, রথিক।

একদিন মুনি আর্দ্রক চলেছেন গুণশীল চৈত্যে বর্ধমানকে বন্দনা করবার জন্য। পথে আজীবিক সম্প্রদায়ের নেতা গোশালকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। গোশালক তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, আর্দ্রক, তোমায় একটা কথা বলি।

আর্দ্রক বললেন, বলুন।

আর্দ্রক, তোমার ধর্মাচার্য শ্রমণ বর্ধমান আগে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতেন, আর এখন অনেক সাধু সাধ্বী একত্রিত করে তাদের সম্মুখে বসে অনর্গল বকে যান।

হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু আপনি কি বলতে চান ?

আমি বলতে চাই যে তোমার আচার্য ভারী অস্থিরচিত্ত। আগে তিনি একান্তে থাকতেন, একান্তে বিচরণ করতেন এবং সমস্ত রকম লোক সংঘট্ট হতে দূরে থাকতেন। আর এখন সাধু ও শ্রাবকের মণ্ডলীতে বসে মনোরঞ্জক কথা ও কাহিনী শোনান। আর্দ্রক, এ ভাবে কি তিনি লোকদের খুশী করে নিজের আজীবিকা নির্বাহ করছেন না ? এতে যে তাঁর পূর্ব ও বর্তমান জীবনে অসামঞ্জস্য এসে পড়েছে সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি নেই। যদি একান্ত বাসই শ্রমণের ধর্ম হয়, তবে বলতে হয় তিনি শ্রমণ ধর্ম হতে বিমুখ হয়েছেন। আর এই জীবনই যদি শ্রমণ জীবনের আদর্শ হয় তবে তাঁর পূর্বজীবন যে ব্যর্থ গেছে সেকথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তাই ভদ্র, যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি তাতে তোমার আচার্যের জীবনচর্যাকে কোনো রকমেই নির্দোষ বলা যায় না।

বর্ধমানের জীবন তখনই যথার্থ ছিল যখন তিনি একান্তবাসী ছিলেন ও যখন আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। এখন নির্জন বাস হতে বিরক্ত হয়ে তিনি জীবিকার জন্য সভায় বসে উপদেশ দেবার পথ খুঁজে নিয়েছেন। তাই বলছিলাম যে তোমার ধর্মাচার্য অব্যবস্থিতচিত্ত।

আর্য, আপনি যা বলছেন তা ঈর্ষাজন্য। বাস্তবে এঁর পূর্বাপর জীবনের রহস্য আপনি বুঝতেই পারেন নি। যদি পারতেন তবে একথা বলতেন না। আপনিই বলুন তাঁর এই দুই জীবনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যখন তিনি ছদ্মস্থ ছিলেন, সাধন নিরত, তখন একান্তবাসীই নয়, মৌনব্রতাবলম্বীও ছিলেন। তা তপস্বীর জীবনের অনুরূপই। এখন ইনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হয়েছেন। এঁর রাগদ্বেষ রূপ বন্ধন সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। এঁর জীবনে আত্মসাধনার স্থান তাই এখন গ্রহণ করেছে জগতের কল্যাণ; প্রাণীমাত্রের হিতকামী এই মহাপুরুষ তাই এখন জনমণ্ডলীর মধ্যে বসে উপদেশ দেন। কিন্তু তবুও তিনি একান্তবাসী। যিনি বীতরাগী তাঁর পক্ষে সভা ও বন দুই-ই সমান। যিনি নির্মল আত্মা তাঁকে সভা বা সমূহ কি করে লিপ্ত করবে? তিনি জগৎ কল্যাণের জন্য যে উপদেশ দেন তাও তাঁর বন্ধের কারণ হয় না কারণ তাঁর কোনো বিষয়ে আগ্রহ ও অনাগ্রহ নেই।

তাহলে বিষয় ভোগ ও স্ত্রীসঙ্গাদি করাতেও বা দোষ কী? তাও তাঁর বন্ধ মোক্ষের কারণ হবে না।—বলে একটু হাসলেন গোশালক। বললেন, আমাদের শাস্ত্রে ত একথাই বলে যে একান্তবাসী তপস্বীর কোনো পাপই পাপ নয়।

যারা জেনে শুনে বিষয় ভোগ ও স্ত্রীসঙ্গ করে তারা কখনো সাধু হতে পারে না। তাহলে গৃহস্থদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ কি? তারা সাধু নয় বা ভিক্ষু। তারা কখনো মুক্ত হতে পারে না।

আর্দ্রক, তুমি অন্য তীর্থিক সাধুদের নিন্দা করছ। তাদের ভণ্ড তপস্বী ও উদরার্থী বলে অভিহিত করছ।

না। আমি কারু ব্যক্তিগতভাবে নিন্দা করতে চাই না। যা সত্য, সেই কথাই বলছি।

আর্দ্রক, তোমার ধর্মাচার্যের ভীরুতা বিষয়ে আর একটি গল্প বলি, শোন। আগে তিনি পান্থশালায় ও উদ্যানে অবস্থান করতেন। এখন আর তা করেন না। তিনি জানেন যে সেখানে অনেক জ্ঞানী,

কুশল, মেধাবী ও পণ্ডিত ভিক্ষু এসে থাকেন। এমন না হয়ে যায় যাতে কোনো ভিক্ষু তাঁকে কোনো প্রশ্ন করে বসেন আর তিনি তার উত্তর দিতে না পারেন। তাই তিনি আর সেই সব জায়গায় যান না।

আর্য, এ হতেই বোঝা যায় আপনি আমার ধর্মাচার্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। লোকে তাঁকে মহাবীর বলে। তিনি নামেও যেমন মহাবীর, কাজেও তেমনি মহাবীর। তাঁর মধ্যে কোথাও ভয়ের লেশমাত্র নেই। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় ও স্বতন্ত্র। মংখলী শ্রমণ, শুনুন, যাঁর কাছে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা পরাস্ত হয়েছেন, তিনি কিনা ভয় পাবেন পান্থশালার উদরার্থী ভিক্ষুদের ? কখনো না। মহাবীর বর্ধমান এখন সাধারণ ছদ্মস্থ ভিক্ষু নন্ তিনি এখন জগৎ উদ্ধারক তীর্থংকর। ইনি যখন ছদ্মস্থ ছিলেন তখন ইনিও একান্তবাস করেছেন কিন্তু এখন যখন কেবল-জ্ঞান লাভ করেছেন তখন সেই জ্ঞান লোক কল্যাণের ভাবনায় সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে জনে জনে বিতরণ করছেন। তাই এমন সব জায়গায় অবস্থান করেন যেখানে বহু সংখ্যক লোকের সম্পর্কে আসা সম্ভব হয়। এতে ভয়েরই বা কি আছে ? আগ্রহেরই বা কী আছে ? তাছাড়া কোথাও যাওয়া, কার সঙ্গে কথা বলা এ সমস্তই তাঁর ইচ্ছাধীন। তবে পান্থশালায় বা উদ্যানগৃহে যে আর যান না তারও একটি কারণ আছে। কারণ সেখানে ত সাধারণতঃ কুতর্কী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিরাই ঘোরাফেরা করে।

তবেই আর্দ্রক, শ্রমণ জ্ঞাতপুত্র নিজের স্বার্থের জন্য প্রবৃত্তিমুখী লাভার্থী বণিকের মত হলেন না কি ?

না মংখলীপুত্র, লাভার্থী বণিক পরিগ্রহ করে, জীবহিংসা করে, আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ না করে নূতন নূতন কর্ম প্রবৃত্তিতে আত্ম-নিয়োগ করে। এ রকম বিষয়বদ্ধ বণিকের উপমা বর্ধমানের সঙ্গে কিছুতেই দেওয়া যায় না। তাছাড়া আরম্ভ ও পরিগ্রহসেবী বণিকদের প্রবৃত্তিকে যে আপনি লাভজনক বলেছেন তাও ঠিক নয়। সে প্রবৃত্তি লাভের জন্য নয়, দুঃখের জন্য। সেই প্রবৃত্তির জন্যই না মানুষ সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করে। তাই তাকে কি আর লাভদায়ক বলা যায় ?

এভাবে আর্দ্রকের কথায় গোশালক নিরুত্তর হয়ে নিজের পথ নিলেন। তিনি চলে যেতে শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষুরা এগিয়ে এসে বললেন, আর্দ্রক, বণিকের দৃষ্টান্ত দিয়ে বাহ্য প্রবৃত্তির খণ্ডন করে তুমি ভাল করেছ। আমাদেরও এই মত। বাহ্য প্রবৃত্তি বন্ধ মোক্ষের কারণ নয়। কারণ অন্তরঙ্গ প্রবৃত্তি। আমাদের মতে যদি কোনো লোক খড়ের মানুষকে মানুষ জ্ঞানে শূলে দেয় তবে সে জীবহত্যার দোষে দোষী হয় আর যদি মানুষকে খড়ের পুতুল জ্ঞানে শূলে দেয় তবে তার কোনো পাপই হবে না। এরকম মানুষের মাংস বুদ্ধও ভোজন করতে পারেন। আমাদের শাস্ত্রে আছে নিত্য যে দু'হাজার বোধিসত্ত্ব ভিক্ষুকে খাওয়ায় সে মহান পুণ্য স্কন্দের অর্জন করে মহাসত্ত্ব-শালী আরোগ্যদেব হয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

আর্দ্রক বললেন, হিংসা জন্য কার্যকে নির্দোষ বলা সংযতের পক্ষে অযোগ্য। যাঁরা এ ধরনের উপদেশ দেন বা যাঁরা এ ধরনের উপদেশ শোনেন তাঁরা অনুচিত কাজ করেন। খড়ের ও সত্যিকার মানুষের যাঁর জ্ঞান নেই তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও অনার্য। তা নইলে কি করে তিনি খড়ের মানুষকে মানুষ ও মানুষকে খড়ের মানুষ বলে মনে করছেন ? ভিক্ষুর ত এ ধরনের স্থূল মিথ্যা কখনো বলা উচিত নয়, যাতে কর্ম বন্ধ হয়। শুনুন, এই সিদ্ধান্তের দ্বারা কেউ কখনো তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেনি, না জীবের শুভাশুভ কর্ম বিপাকের-জ্ঞান। তাই যারা এই সিদ্ধান্তের অনুবর্তী তারা এই লোক করামলক-বৎ প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ নয়, না পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত নিজের যশ বিস্তারিত করতে। ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণ জীবের কর্ম বিপাকের কথা চিন্তা করে আহার দোষ পরিহার করেন ও অকপট বাক্যের প্রয়োগ করেন তিনিই সংযত।

যাদের হাত রক্তরঞ্জিত এ ধরনের অসংযত মানুষ দু' হাজার বোধিসত্ত্ব ভিক্ষুদের নিত্যভোজন করালেও এখানে নিন্দাপাত্রই হন ও পরলোকে দুর্গতিগামী। যাঁরা বলেন প্রাণী হত্যা করে আমাকে যদি কেউ মাংস ভক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ করেন তবে সে মাংস গ্রহণে পাপ

নেই তাঁরা অনার্যধর্মী ও রসলোলুপ। এরূপ মাংস যিনি গ্রহণ করেন, পাপ কি না জানলেও, পাপেরই আচরণ করেন। যিনি সত্যিকার ভিক্ষু তিনি মনেও এ ধরনের আহার ইচ্ছা করেন না, এরূপ মিথ্যা কথা বলেন না।

জ্ঞাতপুত্রীয় শ্রমণেরা এজন্য তাঁদের জন্য উদ্দিষ্ট আহার্য গ্রহণ করেন না কারণ তাঁরা সমস্ত রকম হিংসা পরিত্যাগ করেছেন। তাই যে আহারে সামান্যতম প্রাণী হিংসার সম্ভাবনা থাকে তাঁরা সে আহার গ্রহণ করেন না। সংসারে সংযতদের ধর্ম এই প্রকার। এই আহারশুদ্ধিরূপ সমাধি ও শীলপ্রাপ্ত হয়ে বৈরাগ্যভাবে যিনি নির্গ্রন্থ ধর্মের আচরণ করেন তিনি কীর্তি লাভ করেন।

শাক্য ভিক্ষুদের নিরুত্তর হতে দেখে স্নাতক ব্রাহ্মণেরা এগিয়ে এলেন। বললেন, আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে যে, যে রোজ দু'হাজার স্নাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করায় সে মহাপুণ্য অর্জন করে দেবগতি লাভ করে।

আর্দ্রক বললেন, গৃহস্থালিতে আসক্ত দু'হাজার স্নাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে সে নরক গতিই উপার্জন করে। দয়াধর্মের নিন্দাকারী ও হিংসাধর্মের প্রশংসক ও দুঃশীল মানুষকে যে ভোজন করায় সে রাজা হলেই বা কি অধোগতিই প্রাপ্ত হয়।

তাছাড়া সে তো সত্যি ব্রাহ্মণ নয়। সেই সত্যিকার ব্রাহ্মণ যার প্রাপ্তিতে আনন্দ নেই, বিয়োগে দুঃখ বা শোক।

যে দহনোত্তীর্ণ সোনার মত নির্মল, রাগ, দ্বেষ ও ভয় রহিত, সেই ব্রাহ্মণ।

শির মুণ্ডন করালেই যেমন শ্রমণ হয় না, তেমনি 'ওম্' উচ্চারণ করলেই ব্রাহ্মণ। সমতায় শ্রমণ হয়, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ।

কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হয়।

আর্দ্রকের স্পষ্টোক্তিতে স্নাতক ব্রাহ্মণেরা উদাসীন হলে সাংখ্য-মতানুযায়ী সন্ন্যাসীরা এগিয়ে এলেন। বললেন, তোমার এবং আমাদের ধর্মে পার্থক্য খুব কমই। আমাদের দুই মতই আচার, শীল

ও জ্ঞানকেই মোক্ষের অঙ্গ বলে মনে করে। সংসার বিষয়েও আমাদের মতের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। সাংখ্য দর্শনের মতে পুরুষ অব্যক্ত, মহান ও সনাতন। তার হ্রাস হয় না, না ক্ষয়। তারাগণের মধ্যে যেমন চন্দ্র তেমনি সমস্ত ভূতগণের মধ্যে সেই আত্মা একই।

আর্দ্রক বললেন, আপনাদের সিদ্ধান্তানুসারে না কারু মৃত্যু হয়, না প্রধানের সংসার ভ্রমণ। একই আত্মা স্বীকার করে নিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ বিভেদ যেমন থাকে না তেমনি পশুপাখি কীটপতঙ্গের বিভেদও। যাঁরা লোকস্থিতি না জেনে ধর্মের উপদেশ দেন তাঁরা নিজেরাও বিনষ্ট হন ও অন্যকেও নষ্ট করেন। কেবল-জ্ঞান লাভ করে সমাধিপূর্বক যিনি ধর্ম ও সম্যকত্বের উপদেশ দেন তিনি নিজের ও অন্যের আত্মাকে সংসারসাগর হতে উত্তীর্ণ করেন।

এভাবে একদণ্ডীদের নিরুত্তর করে আর্দ্রক যেই আগে বেরিয়ে যাবেন অমনি হস্তিতাপস ঋষিরা এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, আমরা সমস্ত বছরে একটি মাত্র হাতী হত্যা করি এবং তারি মাংসে সমস্ত বছর জীবন ধারণ করি। এতে অন্য অনেক প্রাণীর জীবন রক্ষা হয়।

আর্দ্রক বললেন, সমস্ত বছরে একটি প্রাণী হত্যা করলেও আমি তাঁদের অহিংসক বলতে পারি না। কারণ প্রাণী হত্যা হতে আপনারা সর্বদা বিরত হননি। আপনারা যদি অহিংসক হন, তবে সংসারী জীবেরাও অহিংসক নয় কেন ? কারণ তাঁরাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীব হত্যা করেন না। যাঁরা তাপস হয়ে যদিও সমস্ত বছরে একটি মাত্র জীব হত্যা করেন তবুও তাঁরা আত্ম কল্যাণ করেন না বরং নিরয়গামী হন। যিনি ধর্ম সমাধিতে স্থির, কায়মনোবাক্যে যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করেন, তিনিই যেন সংসারসমুদ্র অতিক্রম করে ধর্মের উপদেশ দেন।

হস্তিতাপসদের নিরুত্তর করে আর্দ্রক যেমন অগ্রসর হয়েছেন অমনি হস্তিতাপসদের বনস্থ হতে সদ্য ধরে আনা হাতী শেকল ছিঁড়ে তাঁর দিকে ছুটে এল। লোকের মধ্যে কোলাহল উঠল। আর

কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর সেই বুনো হাতী আর্দ্রক মুনিকে হয় শুঁড়ে করে জড়িয়ে দূরে ফেলে দেবে, নয়ত পিঁপড়ের মত পায়ের তলায় পিসে মারবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! হাতী তাঁর কিছুই করল না। আর্দ্রকের কাছে এসে বিনীত শিষ্যের মত মাথা নীচু করে তাঁর পায়ে প্রণাম করল। তারপর অরণ্যের দিকে ছুটে গেল।

মুহূর্তে সেকথা সবখানে ছড়িয়ে পড়ল। আর্দ্রক বুনো হাতীকে বশ করেছেন। আশ্চর্য তাঁর লব্ধি! আশ্চর্য তাঁর সিদ্ধি! সেকথা মহারাজ শ্রেণিকেরও কানে উঠল। তিনি আর্দ্রককে দেখতে এলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন হাতী কেন শেকল ছিঁড়ে তাঁকে প্রণাম করে অরণ্যের গভীরতায় চলে গেল।

শুনে আর্দ্রক বললেন মহারাজ, লোহার শেকল ভাঙা এমন কি আর শক্ত—যত শক্ত কাঁচা সুতোর বাঁধন ছেঁড়া। আমাকে সেই কাঁচা সুতোর বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে দেখে সে তার লোহার শেকল ভেঙে আমায় প্রণাম করে অরণ্যের অবাধ জীবনে ফিরে গেল।

শ্রেণিক আর্দ্রকের কথার তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারলেন না। তাই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আর্দ্রক বললেন, মহারাজ, সে অনেক কাল আগের কথা। আমি অনার্য রাজপুত্র। আপনার পুত্র অভয়কুমার ঋষভদেবের একটি ছোট্ট সোনার প্রতিমা আমায় উপহার পাঠান। সেই প্রতিমা দেখতে দেখতে আমার পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে পড়ে যায় ও শ্রমণ দীক্ষা নেবার জন্য আমি ভারতবর্ষে আসি। এখানে এসে আমি শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করি ও নানা স্থান প্রব্রজন করতে থাকি। এমনি প্রব্রজন করতে করতে একবার আমি বসন্তপুরে আসি। বসন্তপুরে এসে আমি যখন নগর উদ্যানে বসে ধ্যান করছি তখন সেখানে তার সঙ্গিনীদের নিয়ে শ্রেষ্ঠীর মেয়ে খেলা করতে এল। খেলাচ্ছলেই সে সেদিন আমায় বরণ করল। তারপর ঘরে চলে গেল।

তারপর অনেককাল পরের কথা। মেয়েটি যখন বড় হল শ্রেষ্ঠী যখন তার বিবাহের উদ্যোগ করলেন, মেয়েটি তখন তার বাবাকে গিয়ে

বলল, যে তার আর বিয়ে হতে পারে না কারণ সে একজন শ্রমণকে বরণ করেছে।

শ্রেষ্ঠী সমস্ত শুনে মেয়েকে অনেক বোঝালেন। বললেন, সে ত খেলাচ্ছলে।

কিন্তু মেয়ের সেই এক কথা, সেই শ্রমণকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করবো না।

শ্রেষ্ঠী তখন বিপদে পড়লেন। প্রথমতঃ আমাকে কেউ চেনে না, কোথায় থাকি তাও জানে না। তার ওপর তাঁর মেয়েকে যে আমি গ্রহণ করব তারই বা নিশ্চয়তা কী ?

মেয়ে বলল, বাবা, তুমি আমায় অতিথিশালা তৈরী করিয়ে দাও। অতিথিশালায় সাধু শ্রমণ আসবেন। হয়ত তিনিও কোনো দিন আসতে পারেন। তাঁর মুখ আমি দেখিনি কিন্তু তাঁর পা আমি দেখেছি। তাঁর পায়ে পদ্মচিহ্ন ছিল। সেই চিহ্ন দেখে আমি তাঁকে চিনতে পারব।

শ্রেষ্ঠীর অন্য উপায়ান্তর ছিল না। তাই মেয়ের কথা মত অতিথিশালা নির্মাণ করিয়ে দিলেন। মেয়েটি সেখানে যে সাধু শ্রমণ আসে তাঁদের পা ধুইয়ে দেয়।

মহারাজ, একদিন সেই অতিথিশালায় আমিও এলাম।

মেয়েটি পা ধোয়াতে গিয়ে আমার পায়ে পদ্মচিহ্ন দেখে আমায় চিনতে পারল। আমি ধরা পড়ে গেলাম।

এই মেয়েটির কথা আমার মনে ছিল না কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে আমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে গেল। সে জন্মে সে আমার স্ত্রী ছিল। স্ত্রী কিন্তু তার সঙ্গে আমার মিলনের পথ ছিল না। আমি শ্রমণ ছিলাম। কিন্তু শ্রমণজীবনেও তার প্রতি আসক্তি আমি পরিত্যাগ করতে পারিনি। দেখলাম তার প্রেমের চাইতেও সেই আসক্তিই আমাকে তার দিকে দুর্নিবার বেগে টানতে লাগল।

মহারাজ, তাই শ্রমণ ধর্ম এবারে পরিত্যাগ করে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধলাম। সংসারী হলাম। দীর্ঘ বারো বছর তার সঙ্গে এক সঙ্গে

বাস করলাম। তারপর যখন বাসনা উপশান্ত হল তখন আবার সংসার পরিত্যাগের কথা ভাবতে লাগলাম।

আমার স্ত্রী আমার মনের কথা জানতে পেরে আমার সামনে সুতো কাটতে বসল। তাই দেখে আমার ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, মা তুমি এ কি করছ? সে প্রত্যুত্তর দিল, বাবা, তোমার বাবা সংসার পরিত্যাগ করবেন—তাই সংসার চালাবার জন্য সুতো কাটছি।

সে কথা শুনে আমার ছেলে সেই কাটা সুতো নিয়ে আমায় বারো পাকে জড়িয়ে বলল, দেখি এবার তুমি কি করে যাও?

তার দুষ্টু হাসি, তার কচি হাতের স্পর্শ আমায় আবার মোহগ্রস্ত করে দিল। আমি সংসার পরিত্যাগ করতে পারলাম না।

মহারাজ, তাই বলছিলাম লোহার শেকল ভাঙা এমন কি আর শক্ত, যত শক্ত কাঁচা সুতোর বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা। আমাকে সেই বাঁধন ছিঁড়ে আসতে দেখে বুনো হাতীটি তার লোহার শেকল ভেঙে অরণ্যের অসীম মুক্তিতে ফিরে গেল।

সেকথা শুনে শ্রেণিক আর্দ্রককে প্রণাম করে বললেন, আপনি ধন্য, আপনি কৃতকৃত্য।

আর্দ্রক তখন গেলেন বর্ধমানের কাছে।

বর্ধমান সেই চাতুর্মাস্য রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন। তারপর সেখান হতে গেলেন কৌশাম্বী।

॥ ৮ ॥

কৌশাম্বীতে সেদিন মহারাণী মৃগাবতী মহামাত্য, মহাদণ্ডনায়ক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভা আহ্বান করেছেন। সকলে উপস্থিত হলে তিনি সর্বসমক্ষে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনারা সকলে আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন আজ কেন এই সভা ডেকেছি। আপনারা সকলে জানেন যে দীর্ঘদিন ধরে নগরীর

সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রাকার নির্মাণ করা হয়েছে। পরিখা খনন করা হয়েছে সৈন্যদল বৃদ্ধি করা হয়েছে, যুদ্ধসম্ভারও সংগ্রহ করা হয়েছে। নগরী পরিবেষ্টিত হলে দু'তিন বছর অবরোধের সম্মুখীন হতেও তা সমর্থ। এবং এও আপনারা জানেন যে এই সমস্ত কাজ উজ্জয়িনীর চণ্ডপ্রদ্যোতের সাহায্যে সম্পন্ন হয়েছে। চণ্ডপ্রদ্যোত আমার স্বামীর মৃত্যুর সময় কৌশাম্বী আক্রমণ করতে এসেছিলেন। তার পরিবর্তে কৌশাম্বীকে অভেদ্য করে দিয়েছেন। এ আপনাদের কাছে রহস্যজনক বলে মনে হতে পারে এবং সেইজন্যই আমি আজ আপনাদের এখানে আহ্বান করেছি। এবং এও হয়ত আপনাদের অবিদিত নেই যে চণ্ডপ্রদ্যোতের কৌশাম্বী আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিলাম আমি। মহারাজ তখন বিগত হয়েছেন, আর কুমার উদয়ন তখন নাবালক। সেই অবস্থায় কূটনীতির আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমার আর উপায়ান্তর ছিল না। তাই চণ্ডপ্রদ্যোতকে আমি গোপনে বলে পাঠালাম যে আমি তাঁর সঙ্গে উজ্জয়িনী যেতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তার আগে কৌশাম্বীকে সুরক্ষিত করে দিয়ে যেতে চাই যাতে উদয়ন কোনো বিপদের সম্মুখীন না হয়। চণ্ডপ্রদ্যোত আমার কথায় বিশ্বাস করে নগরীকে সুরক্ষিত করে দিয়েছেন। এখন তিনি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। আগামী কালই তাঁর কাছে আমার যাবার শেষ দিন।

মৃগাবতী একটু থামতেই সভায় একটা গুঞ্জন উঠল। মৃগাবতী তখন আবার বলতে লাগলেন, আপনারা যুদ্ধের কথা ভাবছেন। চণ্ডপ্রদ্যোতের সঙ্গে যুদ্ধ করা বাতুলতা। তাতে উভয় পক্ষের লোক ক্ষয় হবে কিন্তু আপনারা আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না। এর একমাত্র যে উপায় আছে তা আমি ভেবে রেখেছি এবং সেই কাজ করবার জন্যই আমি আপনাদের এখানে আহ্বান করেছি। আমি হৈহয় বংশীয় ক্ষত্রিয় কন্যা ও মহারাজ শতানীকের মত ক্ষত্রিয়ের মহিষী। আমি চণ্ডপ্রদ্যোতের অঙ্কশায়িনী হব তা কখনো সম্ভব নয়। কাল আপনারা আমার মৃতদেহ চণ্ডপ্রদ্যোতের কাছে নিয়ে যাবেন আর আমার আত্মা আমার স্বর্গত স্বামীর কাছে গমন করবে।

মৃগাবতী এই বলে থামলেন। সমস্ত সভা তখন বিস্মিত ও স্তম্ভিত। সকলেই মৃগাবতীর বুদ্ধি ও চাতুর্যের, শীল ও সাহসের প্রশংসা করলেন কিন্তু সত্যিই কি মহারাণীর মৃত্যু ছাড়া এ সমস্যা সমাধানের আর কোনো উপায় নেই। মহারাণীর আত্মহত্যার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না—

অনেকক্ষণ সভা নিস্তব্ধ রইল। তারপর একজন নাগরিক সহসা উঠে দাঁড়াল ও মৃগাবতীকে সম্বোধন করে বলতে লাগল, মহারাণী, আত্মহত্যা সব সময়েই পাপ। আমার তাই মনে হয় যে আপনি যদি ভগবান বর্ধমানের সাধ্বী সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন তবে উভয় দিক রক্ষা পায়।

কথাটা সকলেরই মনঃপূত হল। মৃগাবতীরও। কিন্তু কালই তিনি কি করে বর্ধমানের সাধ্বী সঙ্ঘে প্রবেশ করবেন? তিনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন? তাঁর কাছে কীভাবে যাওয়া যায়?—ইত্যাদি বিষয় বিচার্য হয়ে উঠল। সভা পরদিনের জন্য স্থগিত রাখা হল।

কিন্তু পরদিন ভোর হতে না হতেই সংবাদ এল বর্ধমান কৌশাম্বীর উপকণ্ঠস্থিত চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে এসে অবস্থান করছেন। তখন মৃগাবতী তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বর্ধমানের দর্শন ও বন্দনা করবার জন্য চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ওদিকে চণ্ডপ্রদ্যোতও বর্ধমানের আসার খবর পেয়ে চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

বর্ধমান সেই সভায় আত্মার অমরত্ব, কর্মের বন্ধন, সংসারের অসারতা, জন্ম মৃত্যুর দুঃখ, অহিংসা, সংযম ও তপস্যায় সেই দুঃখ হতে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তা ওজস্বিনী ও মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করলেন। জনতা তা মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করল। সেই সময়ের জন্য জনতার মন হতে যেন রাগদ্বেষাদি ভাব একেবারে দূর হয়ে গিয়েছিল।

বর্ধমান যখন তাঁর উপদেশ শেষ করলেন তখন মৃগাবতী উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বর্ধমানকে তিনবার প্রদক্ষিণা ও প্রণাম করে

বললেন, ভগবন্‌, আমি সংসারের অসারতা উপলব্ধি করেছি। এর প্রতি আমার আর কোনো মোহ নেই। জন্ম, জরা ও মৃত্যুর দুঃখ হতে মুক্তি পাবার জন্য আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সাধ্বী সঙ্ঘে প্রবেশ করতে চাই। ভগবন্‌, আপনি আমায় গ্রহণ করুন।

বর্ধমান বললেন, দেবানুপ্রিয়ে, তোমার যেমন অভিরুচি।

প্রদ্যোত অপলক দৃষ্টিতে মৃগাবতীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন আর ভাবছিলেন : এই নারী কি সেই মৃগাবতী যার ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি উজ্জয়িনী হতে কৌশাম্বী ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু এ রূপ ত মোহ উৎপন্ন করে না। বরং ত্যাগ ও বৈরাগ্য ভাবের জন্য শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমেরই উদ্ভব করে।

বস্তুতঃ বর্ধমানের সান্নিধ্যে তাঁর অন্তরেও এক বিরাট পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছিল। তাই এতদিনের উৎকট কামনা তাঁর কাছে ভ্রম ও অন্যায় বলেই মনে হতে লাগল। চণ্ডপ্রদ্যোত তাই মৃগাবতীর সাধ্বী ধর্ম গ্রহণে কোনো বাধাই দিলেন না। বরং পরদিন সকালে কৌশাম্বীতে প্রবেশ করে উদয়নকে সিংহাসনে বসিয়ে উজ্জয়িনীতে ফিরে গেলেন ও বলে গেলেন কেউ যদি কৌশাম্বী আক্রমণ করে তবে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়। তাহলে তিনি সসৈন্যে তখনি এসে কৌশাম্বী রক্ষা করবেন।

এভাবে মৃগাবতীর জীবনই রক্ষা পেল না, আর্যা চন্দনার সান্নিধ্যে তিনি কঠোর সংযম ও তপস্যাচরণ করে অচিরেই মুক্তি লাভ করলেন।

বর্ধমান মৃগাবতীকে দীক্ষিত করবার পর কিছুকাল কৌশাম্বীতে অবস্থান করলেন তারপর বিদেহভূমির দিকে গমন করলেন। সেই বর্ষাবাস তিনি বৈশালীতেই ব্যতীত করবেন।

॥ ৯ ॥

বর্ধমান বর্ষাবাস শেষ হলে মিথিলার দিকে গমন করলেন। সেখান হতে আবার কাকন্দীতে ফিরে এলেন।

কাকন্দী হতে বর্ধমান শ্রাবস্তী হয়ে কাম্পিল্য নগরে এলেন। কাম্পিল্য নগরে গৃহপতি কুণ্ডকোলিককে শ্রাবক ধর্মে দীক্ষিত করলেন। তারপর অহিচ্ছত্রা, গজপুর হয়ে পোলাসপুর এলেন।

পোলাসপুরে তখন সদ্দালপুত্র নামে এক ধনী কুমোর বাস করত। তার তিন কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল ও ৫০০ গরুর গোব্রজ। তার পাঁচশ মাটির বাসনের দোকান ছিল যেখানে এক হাজার লোক কাজ করত। সদ্দালপুত্র ধর্মারাধনাও করত। তবে সে আজীবিক ধর্মাবলম্বী ছিল।

সেদিন রাত্রে সে যখন শুয়ে ছিল তখন সে একটা স্বপ্ন দেখল। দেখল কে যেন তাকে ডাক দিয়ে বলছে, সদ্দালপুত্র, কাল সকালে এদিক দিয়ে সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী মহাব্রাহ্মণ যাবেন। তাঁর কাছে গিয়ে তোমার ঘরে থাকবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করো ও তাঁর অবস্থানের জন্য কাষ্ঠ ফলকাদির ব্যবস্থা করে দিও।

সদ্দালপুত্রের সেই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। সে ভাবল তাহলে সকালবেলায় তার ধর্মাচার্য মংখলীপুত্র গোশালক পোলাসপুরে আসবেন। কারণ তিনি ছাড়া এ যুগে আর কে সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও মহাব্রাহ্মণ আছে ?

সদ্দালপুত্র তাই সেদিন তাড়াতাড়ি উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে মংখলীপুত্রের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। তারপর যখন সে ঘরের বাইরে এল তখন সে শুনল পোলাসপুরের বাইরে জ্ঞাতপুত্র শ্রমণ ভগবান বর্ধমান এসেছেন।

সদ্দালপুত্র সেকথা শুনে হতোৎসাহ হল। মহাব্রাহ্মণকে ঘরে অবস্থানের জন্য আহ্বান ত দূরের তাঁর দর্শন করবার ইচ্ছাও তার শান্ত হয়ে গেল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তখন তার স্বপ্নের কথা আবার মনে হল। ভাবল তবে বর্ধমানের কাছে তার যাওয়াই উচিত। তখন সে বর্ধমানের কাছে গেল ও তাঁকে বন্দনা করে তার ঘরে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। বর্ধমান তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তার ভাণ্ডশালায় এসে উপস্থিত হলেন।

সদ্দালপুত্র বর্ধমানের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েই নিজের কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল। বর্ধমানের সংসঙ্গ সে করল না বা তা করবার তার ইচ্ছাও ছিল না।

কিন্তু বর্ধমান এসেছেন তাকে ভ্রান্তপথ হতে সত্যপথে তুলে নিতে। তাই তার উপেক্ষা তিনি গায়ে মাখলেন না বরং একদিন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সদ্দালপুত্র, এই সব মাটির বাসন কি করে রৈী হল ?

সদ্দালপুত্র বলল, ভগবন্, মাটি হতে। প্রথমে মাটিকে জল দিয়ে কাদাকাদা করে নিতে হয় তারপর নাদ, ভূষি আদি মিলিয়ে দলা পাকাতে হয়। সেই দলাকে চাকে তুলে চাক ঘুরাতে হয়। ঘুরানোতে হাঁড়ি, কলসী, বাসনপত্র তৈরী হয়।

বর্ধমান বললেন, সদ্দালপুত্র, আমি সেকথা জিজ্ঞাসা করিনি। আমার প্রশ্নের তাৎপর্য, এগুলো কি পুরুষকারে হয়েছে না নিয়তিবশে ?

ভগবন্, নিয়তিবশে। তাছাড়া জগতের সমস্ত কিছু নিয়তিরই অধীন। যার যা নিয়তি তা না হয়ে যায় না। পুরুষ প্রযত্ন সেখানে ব্যর্থ।

সদ্দালপুত্র, তোমার ওই বাসন কেউ যদি ভেঙে দেয়, ফেলে দেয়, ছড়িয়ে দেয় তবে তুমি কি কর ?

ভগবন্, যদি তাকে ধরতে পারি ত খুব মারি। এমন মারি যাতে সে জীবনেও না ভোলে।

সদ্দালপুত্র, তুমি তাকে কেন মারবে ? সে যদি তোমার বাসন ভেঙে দিয়ে থাকে, ফেলে দিয়ে থাকে, ছড়িয়ে দিয়ে থাকে তবে তা নিয়তিবশেই ভেঙে দিয়েছে, ফেলে দিয়েছে, ছড়িয়ে দিয়েছে। তুমি ত নিজেই বললে পুরুষ পরাক্রম বলে কিছু নেই।

সদ্দালপুত্র নিরুত্তর।

সদ্দালপুত্র যখন বুঝতে পারল, নিয়তিবাদের সিদ্ধান্ত অব্যবহারিক তখন সে বর্ধমানের পায়ে নতমস্তক হয়ে বলল, ভগবন্, আমি নির্গ্রন্থ প্রবচন শুনবার অভিলাষী।

বর্ধমান তাকে নির্গ্রন্থ প্রবচন শোনালেন। বললেন, সবই যদি নিয়তি জন্য তবে মোক্ষও নিয়তিবশে অনায়াসলভ্য। তবে এত জপ তপ ধ্যান ধারণার প্রয়োজন কি? সুপ্ত সিংহের মুখে এসে কি হরিণ শিশু প্রবেশ করে? তাই চাই পুরুষকার, আত্মার নির্মাণের জন্য সতত প্রচেষ্টা।

সদ্দালপুত্র বর্ধমানের প্রবচনে প্রভাবান্বিত হয়ে সস্ত্রীক তাঁর কাছে শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করল।

সদ্দালপুত্রের ধর্মপরিবর্তনের কথা যখন আজীবিক নেতা মংখলীপুত্রের কানে গেল তখন তাঁর মনে হল যেন বজ্রপাত হয়ে গেছে। কারণ সদ্দালপুত্র একজন সাধারণ গৃহস্থ ছিল না। আজীবিক মতাবলম্বীদের মধ্যে তার বিশিষ্ট স্থান ছিল। তাই রাগে দুঃখে গোশালক তাঁর নিকটস্থ আজীবিক সাধুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ, শুনেছ, পোলাসপুরের ধর্মস্তম্ভের পতন হয়েছে। শ্রমণ মহাবীরের উপদেশে সদ্দালপুত্র আজীবিক সম্প্রদায় পরিত্যাগ করে নির্গ্রন্থ প্রবচন গ্রহণ করেছে। কত দুঃখের কথা। কত পরিতাপের কথা। চল পোলাসপুরে চল। তাকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনাই এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

গোশালক তাই আজীবিক শ্রমণ সঙ্ঘ নিয়ে পোলাসপুরে এসে সভা ভবনে অবস্থান করলেন ও তারপর কয়েকজন বাছা বাছা শ্রমণ নিয়ে সদ্দালপুত্রের আবাসস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বর্ধমান তার পূর্বেই পোলাসপুর পরিত্যাগ করে বাণিজ্যগ্রামের দিকে চলে গেছেন।

যে সদ্দালপুত্র মংখলীপুত্র গোশালকের নাম শুনলে পুলকিত হয়ে উঠত সেই সদ্দালপুত্র তাঁকে আজ সাধারণ অভ্যর্থনা জানাল, ধর্মাচার্যের সম্মান জানাল না। গোশালক এতে আরও ক্রুদ্ধ হলেও মনে মনে বুঝতে পারলেন যে বর্ধমানের নিন্দা করে বা স্বমতের প্রশংসা করে সদ্দালপুত্রকে আজীবিক সম্প্রদায়ে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। তাই কণ্ঠস্বরকে যতদূর সম্ভব কোমল করে বললেন, দেবানুপ্রিয়, মহাব্রাহ্মণ কি এখানে এসেছেন?

সদ্দালপুত্র বলল, কে মহাব্রাহ্মণ ?

শ্রমণ ভগবান বর্ধমান।

আর্য, তিনি মহাব্রাহ্মণ কি করে ?

তিনি জ্ঞান ও দর্শনের ধারক, জগৎ পূজিত ও সত্যিকার কর্মযোগী। তাই মহাব্রাহ্মণ। দেবানুপ্রিয়, মহাগোপ কি এখানে এসেছেন ?

কে মহাগোপ ?

শ্রমণ ভগবান বর্ধমান।

তিনি মহাগোপ কি করে ?

এই সংসাররূপী মহারণ্যে ভ্রান্ত পথশ্রান্ত সংসারী জীবকে তিনি ধর্মদণ্ডে গোপন করে মোক্ষরূপ নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। তাই তিনি মহাগোপ। দেবানুপ্রিয়, মহাধর্মকথী কি এখানে এসেছেন ?

কে মহাধর্মকথী ?

শ্রমণ ভগবান বর্ধমান।

তিনি মহাধর্মকথী কি করে ?

অসীম সংসারে যারা ধর্ম পথ ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে গমন করছে তাদের ধর্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়ে ধর্ম পথে আবার ফিরিয়ে আনছেন। তাই তিনি মহাধর্মকথী। দেবানুপ্রিয়, মহানির্যামক কি এখানে এসেছেন ?

কে মহা নির্যামক ?

শ্রমণ ভগবান বর্ধমান।

তিনি মহানির্যামক কি করে ?

সংসার রূপ অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জমান প্রাণীদের তিনি ধর্মরূপ নৌকায় বসিয়ে নিজে পারে উপস্থিত করছেন তাই তিনি মহানির্যামক।

দেবানুপ্রিয়, আপনি যদি এমন চতুর, এমন নৈয়ায়িক, এমন উপদেশক ও বিজ্ঞানী তবে কি আপনি আমার ধর্মাচার্য ধর্মোপদেশক শ্রমণ ভগবান বর্ধমানের সঙ্গে বাদ বিবাদ করতে সমর্থ ?

না, সদ্দালপুত্র, তাঁর সঙ্গে বাদ বিবাদ করতে আমি সমর্থ নই।

কেন? আমার ধর্মাচার্যের সঙ্গে আপনি বাদ বিবাদ করতে কেন সমর্থ নন?

এই জন্যই সমর্থ নই যে যখন কোনো যুবক মল্ল অপর মল্লকে ধরে তখন তাকে যেমন শক্ত করে ধরে তেমনি তিনি যখন হেতু, যুক্তি, প্রশ্ন ও উত্তরে যেখানেই আমাকে ধরেন সেখানেই আমাকে নিরুত্তর করে দেন। এই জন্য আমি তোমার ধর্মাচার্যের সঙ্গে বিবাদ করতে সমর্থ নই।

দেবানুপ্রিয়, আপনি যখন আমার ধর্মাচার্য ধর্মোপদেশকের বাস্তবিক প্রশংসা করছেন তখন আপনাকে আমি আমার ভাণ্ডশালায় অবস্থানের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি যথাসুখ আমার ভাণ্ডশালায় অবস্থান করুন।

গোশালক তখন ভাণ্ডশালায় এসে অবস্থান করলেন ও নানা সময়ে নানা ভাবে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতে সফল হলেন না। তখন তিনি হতাশ হয়ে পোলাসপুর পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। এই ঘটনায় বর্ধমানের ওপর তিনি মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

বর্ধমান পোলাসপুর পরিত্যাগ করে বাণিজ্যগ্রামে গেলেন। সেখানে তিনি সেই বর্ষাবাস ব্যতীত করলেন।

॥ ১০ ॥

বাণিজ্যগ্রাম হতে নানা স্থানে পরিব্রজন করতে করতে বর্ধমান এলেন রাজগৃহে। সেখানে তাঁর উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে এবারে শ্রাবকধর্ম গ্রহণ করলেন গাথাপতি মহাশতক।

বর্ধমানের ধর্মসভায় একদিন পার্শ্বাপত্য স্থবিরেরা এলেন। তাঁরা বর্ধমান হতে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, এই লোক অসংখ্য প্রদেশ বিশিষ্ট হলেও পরিমিত। সেই পরিমিত লোকে

অনন্ত রাত্রিদিন উৎপন্ন হয়েছে, হচ্ছে, হবে, না পরিমিত রাত্রিদিন উৎপন্ন হয়েছে, হচ্ছে, হবে ?

বর্ধমান বললেন, শ্রমণগণ, পরিমিত লোকে অনন্ত রাত্রিদিন উৎপন্ন হয়েছে, হচ্ছে, হবে।

ভগবন্, সে কিরূপ ?

আর্যগণ, লোককে পুরুষাদানীয় পার্শ্ব নিত্য বলে শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত বলেছেন, সেইজন্য।

ভগবন্, এই লোককে লোক কেন বলা হয় ? সেকি 'যো লোক্যতে স লোকঃ' সেইজন্য ?

আপনারা ঠিকই বলেছেন, ভাগবতগণ। অজীব দ্রব্যের দ্বারা এই লোক দৃষ্টিগোচর হয়, নিশ্চিত হয়, নিরূপিত হয়। তাই একে লোক বলা হয়। এই লোক অনাদি, অনন্ত পরিমিত অলোকাকাশের দ্বারা পরিবৃত। নীচে বিস্তীর্ণ, মধ্যে কটিবৎ, ওপরে বিশাল।

বর্ধমানের স্পষ্টীকরণে পার্শ্বাপত্য স্থবিরদের সংশয় নিরসিত হয়েছে। বিশ্বাস হয়েছে যে ভগবান বর্ধমান সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। তখন তাঁরা বর্ধমানের বন্দনা করে বললেন, ভগবন্, আমরা চতুর্যাম ধর্মের পরিবর্তে আপনার কাছে পঞ্চযাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাই।

পার্শ্ব প্রবর্তিত চতুর্যাম ধর্ম অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ। বর্ধমান এর সঙ্গে ব্রহ্মচর্য যোগ করে পঞ্চযাম ধর্ম প্রবর্তিত করেন।

বর্ধমান বললেন, দেবানুপ্রিয়, তোমরা সানন্দে তা করতে পার।

বর্ধমানের সঙ্গে পার্শ্বাপত্য শ্রমণদের যখন সেই বার্তালাপ চলছিল তখন শ্রমণ রোহ বর্ধমান হতে খানিক দূরে বসে সেই বার্তালাপ শুনছিল। সেই বার্তালাপ শুনতে শুনতে তার মনে কয়েকটি প্রশ্নের উদ্ভব হল। সে তখন বর্ধমানের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, ভগবন্, প্রথমে লোক পরে অলোক, না প্রথমে অলোক পরে লোক।

বর্ধমান বললেন, রোহ, এদের প্রথমেও বলতে পার, পরেও বলতে পার। কারণ এ দুটিই শাশ্বত। তাই এদের মধ্যে আগে পরে নেই।

রোহ এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল আর বর্ধমান তার প্রত্যুত্তর দিতে লাগলেন। শেষে রোহ প্রশ্ন করল, ভগবন্, প্রথমে বীজ পরে গাছ, না প্রথমে গাছ পরে বীজ।

বর্ধমান বললেন, রোহ, গাছ কিভাবে হয়?

বীজ হতে।

আর বীজ?

গাছ হতে।

তবেই, বললেন বর্ধমান, এ দুটি শাশ্বত ভাব। এদের মধ্যে আগে পরে নেই।

রোহ সন্তুষ্ট হয়ে নিরুত্তর হল।

রোহ নিরুত্তর হতে গৌতম লোকস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। বর্ধমান তার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে বললেন আকাশের ওপর বায়ু, বায়ুর ওপর জল, জলের ওপর পৃথিবী, পৃথিবীর ওপর জীব প্রতিষ্ঠিত?

গৌতম প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, বায়ুর ওপর জল কিভাবে প্রতিষ্ঠিত?

বর্ধমান বললেন, গৌতম, কোনো একটি মশক হাওয়ায় ভরে তার মাঝখানে যদি শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয় ও পরে ওপরের ভাগের হাওয়া বার করে জলে ভরে মাঝের বাঁধন আলগা করে দেওয়া হয়, তবে সেই জল হাওয়ার ওপর থাকবে কিনা?

গৌতম বললেন, হাঁ, ভগবন্।

বর্ধমান বললেন, ঠিক এই রকম।

বর্ধমান সেই বর্ষাবাস রাজগৃহে ব্যতীত করলেন।

॥ ১১ ॥

বর্ষাকাল শেষ হতে রাজগৃহ হতে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের দিকে প্রস্থান করলেন ও নানা গ্রামানুগ্রামে বিচরণ করতে করতে কচংগলা নগরীর ছত্র-পলাশ চৈত্যে এসে আশ্রয় নিলেন।

সেই সময় শ্রাবস্তীর নিকটস্থ একটি মঠে গর্দভালি শিষ্য কাত্যায়ন গোত্রীয় স্কন্দক বাস করত। সে পরিব্রাজক ধর্মাবলম্বী ছিল ও বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ আদি বৈদিক সাহিত্যে প্রবীণ ছিল। যে সময় বর্ধমান ছত্র-পলাশ চৈত্যে এসে অবস্থান করছিলেন সেই সময় স্কন্দক কোনো কাজে শ্রাবস্তী এসেছিল। সেখানে কাত্যায়ন গোত্রীয় পিঙ্গলক নামে এক নির্গ্রন্থ শ্রমণের সঙ্গে তার দেখা হয়। পিঙ্গলক তাকে প্রশ্ন করে, মাগধ, এই লোকের অন্ত আছে কি না? সিদ্ধির অন্ত আছে কি না? সিদ্ধর অন্ত আছে কি না? কোন মৃত্যুতে জীব বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়?

স্কন্দক সেই পাঁচটি প্রশ্ন শুনল, মনে মনে চিন্তা করল, বিচার করল কিন্তু তাদের উত্তর দিতে পারল না। যতই সে এ বিষয়ে চিন্তা করতে লাগল ততই যেন তার সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। পিঙ্গলক দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার সেই প্রশ্ন করল। কিন্তু স্কন্দক তার কোনো প্রত্যুত্তরই দিতে পারল না।

স্কন্দক যখন পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই প্রশ্নের কথা ভাবছিল তখন সহসা বর্ধমানের ছত্র-পলাশ চৈত্যে অবস্থানের কথা তার কানে এল। সর্বজ্ঞ এসেছেন, তীর্থংকর এসেছেন—

স্কন্দকের তখন সহসা মনে হল, বর্ধমানের কাছে গিয়ে এই প্রশ্নের কেন না সে সমাধান করে নেয়?

স্কন্দক তখন তাড়াতাড়ি নিজের আশ্রমে ফিরে এল ও ত্রিদণ্ড কুণ্ডিকাদিতে সজ্জিত হয়ে শ্রাবস্তীর মধ্যে দিয়ে ছত্র-পলাশ চৈত্যে গিয়ে উপস্থিত হল।

ওদিকে চৈত্যের মধ্যে বসে বর্ধমান গৌতমকে তখন বলছিলেন, গৌতম, আজ তোমার পূর্বপরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হবে।

কে ভগবন্?

পরিব্রাজক কাত্যায়ন স্কন্দক।

ভগবন্, সে কি রকম? স্কন্দকের সঙ্গে এখানে কি ভাবে দেখা হবে?

গৌতম, শ্রাবস্তীতে শ্রমণ পিঙ্গলক স্কন্দককে কয়েকটি প্রশ্ন করে যার সে প্রত্যুত্তর দিতে পারে নি। আমি এখানে আছি জেনে সে সেই প্রশ্নের সমাধানের জন্য এখানে আসছে। চৈত্যের দরজায় সে এসে পড়েছে। আর একটু পরেই সে ভিতরে আসবে।

ভগবন্, স্কন্দকের কি আপনার শিষ্য হবার যোগ্যতা আছে?

হ্যাঁ, গৌতম, স্কন্দকের সে যোগ্যতা আছে এবং সে আমার শিষ্য হবেও।

বর্ধমানের কথা শেষ হতে না হতেই স্কন্দককে আসতে দেখা গেল। তাকে দেখতেই গৌতম উঠে তার নিকটে গেলেন ও তাকে স্বাগত করে বললেন, মাগধ, একথা কি সত্যি যে শ্রাবস্তীতে পিঙ্গলক তোমায় কয়েকটি প্রশ্ন করে যার প্রত্যুত্তর না দিতে পেরে তুমি এখানে এসেছ?

স্কন্দক বলল, হ্যাঁ, গৌতম, তা সত্যি। কিন্তু গৌতম, এমন কোন জ্ঞানী ও তপস্বী এখানে রয়েছেন যিনি আমার মনের কথা তোমায় বলে দিয়েছেন?

স্কন্দক, আমার আচার্য শ্রমণ ভগবান বর্ধমানই সেই জ্ঞানী ও তপস্বী। তিনি ত্রিকালজ্ঞ। তিনি তোমার মনের কথা আমায় বলে দিয়েছেন।

তবে আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল। তাঁকে গিয়ে আমি প্রণাম করি।

এসো।

এক সঙ্গেই গৌতম ও স্কন্দক বর্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বর্ধমানকে দেখা মাত্র স্কন্দকের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেল। বর্ধমানের দিব্য দেহ, করুণাময় চোখ, মধুক্ষরা বাণী তার মনে অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার করল। সে তাই করজোড়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

বর্ধমান বললেন, স্কন্দক, লোক সাদি না অনন্ত—এই তোমার প্রশ্ন?

হ্যাঁ, ভগবন্।

স্কন্দক, দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব ভেদে লোক চার রকম। দ্রব্য স্বরূপে লোক সান্ত। কারণ তা ধর্ম, অধর্ম, আকাশ, জীব ও পুদ্‌গল-রূপ পঞ্চদ্রব্যময়। ক্ষেত্র স্বরূপে লোক বহু বিস্তৃত হলেও সান্ত। কাল স্বরূপে তা পূর্বেও ছিল, এখনো আছে পরেও থাকবে তই অনন্ত, নিত্য ও শাশ্বত। আর ভাব রূপেও লোক অনন্ত কারণ তা অনন্ত বর্ণ, গন্ধ, রস, স্পর্শ-সংস্থান, গুরু-লঘু, অগুরু-লঘু পর্যায়াত্মক। অনন্ত পর্যায়াত্মক বলেই তা অনন্ত।

স্কন্দক, এভাবে জীবেরও দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব দ্বারা বিচার করতে হবে। দ্রব্য স্বরূপে জীব দ্রব্যের সঙ্গে এক হওয়ায় সান্ত। ক্ষেত্র স্বরূপে জীব অসংখ্য আকাশ প্রদেশ ব্যাপী হলেও সান্ত। কাল স্বরূপে জীব অনন্ত কারণ তা পূর্বে ছিল, এখনো আছে, পরেও থাকবে। ভাব স্বরূপেও জীব অনন্ত। কারণ তা জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্রের অনন্ত পর্যায়ে পরিপূর্ণ ও অনন্ত অগুরু-লঘু পর্যায় স্বরূপ।

স্কন্দক, এ ভাবে দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব ভেদে সিদ্ধি ও সিদ্ধও চার প্রকার। সান্ত, সান্ত, অনন্ত, অনন্ত। আর কোন মৃত্যুতে জীব বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়? স্কন্দক, মৃত্যু দু'রকমের: এক বাল-মরণ, অন্য পণ্ডিত মরণ। সংসারচক্রে ভ্রমণ করতে করতে যে ধরনে মানুষ সাধারণতঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হয় তা বাল-মরণ। সেই মৃত্যুতে তার সংসার ভ্রমণ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। স্কন্দক, এ ভাবে মৃত্যুতে জীব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিত-মরণে যে আসনে বসে অনশন স্বীকার করা হয় সেই আসনে ধর্ম ধ্যান করতে করতে মৃত্যু বরণ করা হয়। এই মৃত্যুতে জীবের সংসারচক্রে ভ্রমণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তাই এই মৃত্যুতে জীবের হ্রাস হয়।

বর্ধমানের স্পষ্টীকরণে স্কন্দকের সংশয় ছিন্ন হল। সে প্রতিবুদ্ধ হয়ে বর্ধমানের কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করে পণ্ডিত-মরণে অনশনে দেহ ত্যাগ করে সংসার ভ্রমণ হ্রাস করে দিল।

ছত্র পলাশ চৈত্য হতে বর্ধমান শ্রাবস্তীর কোষ্ঠক চৈত্যে এসে অবস্থান করলেন। সেখানে সালিহীপিতা প্রমুখ ব্যক্তিদের শ্রাবক ধর্মে দীক্ষিত করে তিনি বাণিজ্যগ্রামে এলেন। সেই বছরের বর্ষাবাস তিনি বাণিজ্যগ্রামেই ব্যতীত করলেন।

॥ ১২ ॥

বাণিজ্যগ্রাম হতে বর্ষাশেষ হতে বর্ধমান এলেন ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুরের বহুশাল চৈত্যে।

বর্ধমান যখন বহুশাল চৈত্যে অবস্থান করছিলেন তখন জমালি একদিন তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, ভগবন্‌, আমি আমার পাঁচশ' জন শিষ্যসহ পৃথক বিচরণ করতে চাই।

বর্ধমান এর কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না।

জমালি তখন পর পর দুবার আরও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু বর্ধমান কোনোবারেই তার প্রত্যুত্তর দিলেন না। তখন জমালি বর্ধমানের অনুমতি ছাড়াই বর্ধমানের শ্রমণ সঙ্ঘ হতে নিজেকে পৃথক করে নিলেন।

পাঁচশ' জন শিষ্যসহ জমালি চলে যেতেই বর্ধমান সেস্থান পরিত্যাগ করে বৎসভূমি হয়ে কৌশাম্বী এলেন। কৌশাম্বী হতে কাশী। তারপর রাজগৃহ।

বর্ধমান যখন রাজগৃহে গুণশীল চৈত্যে অবস্থান করছিলেন তখন পার্শ্বাপত্য স্থবিরদের পাঁচশ' জন বিচরণ করতে করতে রাজগৃহের নিকটবর্তী তুঙ্গিয় নগরীতে পুষ্পবতী চৈত্যে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা এসেছেন জানতে পেরে তুঙ্গিয়বাসীরা তাঁদের কাছে ধর্ম শ্রবণ করতে গেল। ধর্ম শ্রবণের পর তাঁরা প্রশ্ন করলেন, ভগবন্‌, সংযমের কি ফল? তপস্যার কি ফল?

স্থবিরেরা প্রত্যুত্তর দিলেন, সংযমের ফল অনাস্রব, তপস্যার ফল নির্জরা।

শ্রমণোপাসকেরা তখন আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, তাই যদি হয় তবে দেবলোকে দেবতা কি করে উৎপন্ন হয়?

প্রত্যুত্তরে কালিপুত্র স্থবির বললেন, প্রাথমিক তপস্যায় দেবলোকে দেব উৎপন্ন হয়।

মেহিল স্থবির বললেন, প্রাথমিক সংযমে দেবলোকে দেব উৎপন্ন হয়।

আনন্দরক্ষিত স্থবির বললেন, কার্মিকতার জন্য দেবলোকে দেব উৎপন্ন হয়।

কাশ্যপ স্থবির বললে সংগিকতা বা আসক্তির জন্য দেবলোকে দেব উৎপন্ন হয়।

তাঁদের প্রত্যুত্তরে তুঙ্গিয়বাসীরা সন্তুষ্ট হল ও স্থবিরদের বহুমান করে ঘরে ফিরে গেল।

ইন্দ্রভূতি গৌতম ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে শ্রমণোপাসকদের প্রশ্ন ও স্থবিরদের প্রত্যুত্তরের কথা শুনে এলেন। এসেই বর্ধমানকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, রাজগৃহে স্থবিরদের প্রশ্নোত্তরের বিষয়ে যা শুনে এসেছি তা কি ঠিক? স্থবিরেরা কি সঠিক উত্তর দিয়েছেন? সেই উত্তর দিতে তাঁরা কি সমর্থ?

বর্ধমান বললেন, তুঙ্গিয়বাসীদের পার্শ্বাপত্য শ্রমণেরা যে প্রত্যুত্তর দিয়েছেন তা ঠিক। তাঁরা যা কিছু বলেছেন তা সত্য। গৌতম, এ বিষয়ে আমারও এই মত যে পূর্ব সংযম ও পূর্ব তপের জন্যই শ্রমণেরা দেবলোকে দেবরূপে উৎপন্ন হন।

গৌতম তখন প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, এরকম জ্ঞানী শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের যাঁরা পর্যুপাসনা করেন তাঁরা কি ফল পান?

বর্ধমান বললেন গৌতম, সে ধরনের জ্ঞানী শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের পর্যুপাসনার ফল সৎশাস্ত্র শ্রবণ।

ভগবন্, সৎশাস্ত্র শ্রবণের কি ফল?

গৌতম, সৎশাস্ত্র শ্রবণের ফল জ্ঞান।

ভগবন্, জ্ঞানের কি ফল?

জ্ঞানের ফল বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান।

জ্ঞান যখন আত্মস্বরূপে ভাসমান হয় তখনি তা বিজ্ঞান।

ভগবন্, বিজ্ঞানের কি ফল?

বিজ্ঞানের ফল প্রত্যাখ্যান, অর্থাৎ আত্মস্বরূপে যখন তা ভাসিত হয় তখন সমস্ত প্রকার বৃত্তি আপনা আপনি শান্ত হয়ে যায়।

গৌতম আবারও প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, প্রত্যাখ্যানের কি ফল?

বর্ধমান বললেন, সংযম। অর্থাৎ বৃত্তি যখন আপনা আপনি শান্ত হয়ে যায় তখনি সর্বস্ব ত্যাগ রূপ সংযম উপলব্ধ হয়।

গৌতম আবারও প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, সংযমের কি ফল?

গৌতম, সংযমের ফল আস্রবরহিতত্ব। অর্থাৎ সংযম যার বিশুদ্ধ, পাপ ও পুণ্য তাকে স্পর্শ করে না, সে আত্মস্বরূপে অবস্থান করে।

ভগবন্, আস্রবরহিতত্বের কি ফল?

তপ।

এ সামান্য তপস্যা নয়, এ 'ত' বর্গ হতে 'প' বর্গে আসা। 'ত' বর্গ অহংকার', 'প' বর্গ পুরুষ সত্তা। তাই 'প' থেকে 'ত' নয় (পতন) 'ত' থেকে 'প' (তপস্)। অবরোহণ নয়, আরোহণ। অহংকার নাশে স্ব-স্বরূপ লাভ।

ভগবন্, তপের কি ফল?

গৌতম, তপের ফল কর্মফল নাশ।

ভগবন্, কর্মফল নাশের কি ফল?

নিষ্ক্রিয়তা।

ভগবন্, নিষ্ক্রিয়তার কি ফল?

নিষ্ক্রিয়তার ফল সিদ্ধি? অজরামরত্ব

বর্ধমান সেই বর্ষাবাস রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন।

॥ ১৩ ॥

শ্রেণিকের মৃত্যুর পর কুণিক মগধের রাজধানী রাজগৃহ হতে চম্পায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাই অধিকাংশ রাজপুরুষেরা এখন চম্পায় বাস করে।

বর্ধমান রাজগৃহ হতে চম্পায় পূর্ণভদ্র চৈত্যে এসে অবস্থান করলেন। তারপর সেখান হতে চলে গেলেন বিদেহভূমির দিকে। কাকন্দীতে কিছু কাল অবস্থান করে তিনি এলেন মিথিলায়। সেই বর্ষাবাস তিনি মিথিলায় ব্যতীত করলেন।

॥ ১৪ ॥

মিথিলা হতে তিনি আবার অঙ্গদেশে ফিরে এলেন। কারণ বৈশালী তখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। একদিকে মগধাধিপতি কুণিক ও তার বৈমাত্রেয় ভাইগণ, অন্যদিকে বৈশালী গণতন্ত্রের মুখ্যাধিনায়ক চেটক ও কাশী ও কোশলের আঠারো গণরাজ। যুদ্ধে কুণিকের বৈমাত্রেয় ভাইদের সকলে নিহত হলেও কুণিকের হাতে বৈশালী গণতন্ত্রের পতন হল। কুণিক বৈশালীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে চম্পায় ফিরে এলেন।

বর্ধমান কিছুকাল চম্পায় অবস্থান করে আবার মিথিলায় ফিরে গেলেন। সেই বছরের বর্ষাবাসও তিনি মিথিলায় ব্যতীত করলেন।

॥ ১৫ ॥

বর্ষাবাস শেষ হলে বৈশালীর নিকট দিয়ে তিনি শ্রাবস্তীর দিকে গমন করলেন ও শ্রাবস্তীতে এসে ঈশান কোণস্থিত কোষ্ঠক চৈত্যে অবস্থান করলেন।

মংখলীপুত্র গোশালকও সেই সময় শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। বস্তুতঃ বর্ধমানের সঙ্গ ত্যাগ করবার পর অধিকাংশ সময়ই তিনি

শ্রাবস্তীতে ব্যতীত করেছিলেন। এই শ্রাবস্তীতেই তিনি তেজোলেশ্যা লাভ করেন ও নিমিত্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নিজেকে তীর্থংকর বলে প্রচারিত করে দেন।

শ্রাবস্তীতে গোশালকের দু'জন ভক্ত ছিলেন। এক, কুমোর পত্নী হালাহলা, দুই গাথাপতি অয়ংপুল। গোশালক সাধারণতঃ হালাহলার ভাণ্ডশালাতেই অবস্থান করতেন।

বর্ধমানের দীক্ষা গ্রহণের প্রায় দু'বছর পর গোশালক বর্ধমানের সঙ্গ নেন ও প্রায় ছয় বছর তাঁর সঙ্গে থাকেন। তারপর বর্ধমান হতে পৃথক স্বতন্ত্র আজীবিক মতের প্রতিষ্ঠা করেন।

গোশালক যতদিন বর্ধমানের সঙ্গে ছিলেন ততদিন তিনি তাঁর প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন ছিলেন। অন্যে বর্ধমানের সম্বন্ধে কিছু বললে তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু এখন আর তিনি সেই গোশালক নন তাঁর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন তিনি আজীবিক সম্প্রদায়ের নেতা ও তীর্থংকর। তাই বর্ধমানের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী।

ইন্দ্রভূতি সেদিন ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে শুনে এলেন শ্রাবস্তীতে এখন দুই জন তীর্থংকর বিচরণ করছেন। এক, শ্রমণ বর্ধমান, দুই আজীবিক গোশালক। তিনি এসেই সে কথা বর্ধমানকে বললেন। বললেন, ভগবন্, গোশালক কি সত্যই সর্বজ্ঞ তীর্থংকর?

না, গৌতম। গোশালক নিজেকে সর্বজ্ঞ তীর্থংকর বলে বলে বেড়ালেও সে তীর্থংকর নয়। প্রথম দিকে সে আমার সঙ্গে ছিল। পরে স্বতন্ত্র হয়ে স্বচ্ছন্দ বিহার করছে।

বর্ধমানের সেই প্রত্যুত্তর সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা শুনলেন। তাঁরা ঘরে ফেরার পথে সে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন। ক্রমে সে কথা গোশালকের কানে গিয়ে উঠল। বর্ধমান বলেছেন, গোশালক সর্বজ্ঞ তীর্থংকর নয়।

বর্ধমান শিষ্য আনন্দ সেদিন ভিক্ষাচর্যায় হালাহলার বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর হতে তাঁকে দেখতে পেয়ে গোশালক ডাক দিয়ে বললেন, শোনো আনন্দ, তোমায় একটা কথা বলি।

আনন্দ সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গোশালক বললেন, আনন্দ তোমায় একটি গল্প বলি শোন। সে অনেক কাল আগের কথা। একদল বণিক গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই করে বিদেশে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিল। বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় এক সময় তাদের পথ হারিয়ে গেল। তারা বন হতে মহাবনে গিয়ে পড়ল। সেই মহাবনের যেন আর শেষ নেই। তারপর মহাবনে অনেক দিন ব্যতীত হওয়ায় তাদের সঙ্গে যে খাবার জল ছিল সেই জলও ফুরিয়ে গেল। তখন তারা সেই মহাবনে জলের সন্ধান করতে লাগল। সন্ধান করতে করতে তারা এক নিম্নভূমিতে গিয়ে পড়ল। সেখানে জল ছিল না তবে চারটি জলার্দ্র বল্মীক ছিল। বল্মীক জলার্দ্র থাকায় জল পাওয়া যেতে পারে ভেবে তারা প্রথম বল্মীক ভেঙে ফেলল। ভাঙতেই তার নীচে স্বচ্ছ জল পাওয়া গেল। সেই জল তারা আঁজলা ভরে পান করল ও সেই জলে তাদের জলপাত্রগুলোও ভরে নিল। বণিকেরা তখন ভাবতে লাগল যে প্রথম বল্মীকের নীচে যখন জল পাওয়া গেছে তখন অন্য বল্মীকের নীচে না জানি কি পাওয়া যেতে পারে। তখন তারা দ্বিতীয় বল্মীক ভাঙতে গেল। বণিকদের মধ্যে সুবুদ্ধি নামে এক বণিক ছিল। সে কিন্তু সেই লোভী বণিকদের নিরস্ত করবার জন্য বলল, আমাদের কাজ যখন হয়ে গেছে তখন অন্য বল্মীক ভাঙার কি প্রয়োজন? কিন্তু লোভী বণিকেরা তার কথা শুনল না। দ্বিতীয় বল্মীকটিও ভেঙে ফেলল। বল্মীকটি ভাঙতেই তার নীচে সোনা পাওয়া গেল। তখন তাদের লোভ আরও বেড়ে গেল। দ্বিতীয়টিতে যখন সোনা পাওয়া গেছে তখন তৃতীয়টিতে নিশ্চয়ই মণি-রত্ন পাওয়া যাবে। সুবুদ্ধি আবারও নিষেধ করল কিন্তু তার কথা কেউ কানে নিল না। তৃতীয় বল্মীকটি ভাঙতেই সত্যি মণি-রত্ন বেরিয়ে এল। তখন তারা চতুর্থ বল্মীকটি ভাঙতে গেল। ভাবল, এতে হীরে-পান্না পাওয়া যাবে। সুবুদ্ধি আবারও নিষেধ করল। বলল, অতি লোভ ভালো নয়, যা পেয়েছ তাইতেই সন্তুষ্ট থাক। কে জানে এ হতে হীরে-পান্নার পরিবর্তে যদি সাপ বেরিয়ে

যায়! কিন্তু তার কথা কে শুনবে? তার কথা শুনলে কি তারা সোনা ও মণি-রত্ন পেত? তাই তারা চতুর্থ বল্মীকটিও ভেঙে ফেলল। ভেঙে ফেলতেই সেই বল্মীক হতে দৃষ্টিবিষ সাপ বেরিয়ে এল ও লোভী বণিকদের ভস্ম করে দিল।

আনন্দ, এই উপমা তোমার ধর্মাচার্যের জন্য। তিনি ধর্মাচার্যের যা পাবার তা সবই পেয়েছেন। নিজেকে তীর্থংকরও ঘোষিত করে দিয়েছেন। কিন্তু এতেও তাঁর সন্তোষ নেই। কিন্তু সংসারে তিনিই কি একমাত্র জিন, তার্থংকর ও সর্বজ্ঞ? অন্য কেউ কি জিন, তীর্থংকর ও সর্বজ্ঞ হতে পারে না? তবে কেন তিনি আমার সম্বন্ধে যেখানে সেখানে বলে বেড়াচ্ছেন, গোশালক মংখলীপুত্র, তীর্থংকর নয়। আনন্দ, তুমি যাও। গিয়ে তোমার গুরুকে সাবধান করে দাও যে আমি এখুনি আসছি ও তাঁর অবস্থা দুর্বুদ্ধি বণিকদের মত করছি।

আনন্দের আর ভিক্ষাচর্যায় যাওয়া হল না। তাড়াতাড়ি বর্ধমান যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে ফিরে এলেন ও সমস্ত বিষয় তাঁকে নিবেদন করে বললেন, ভগবন্, গোশালক কি তপস্তেজে অন্যকে ভস্মীভূত করতে সমর্থ? ভস্মীভূত করা কি তাঁর শক্তির অন্তর্গত?

বর্ধমান বললেন, হ্যাঁ, আনন্দ, গোশালক তেজোলেশ্যায় অন্যকে ভস্মীভূত করতে সমর্থ, ভস্মীভূত করা তার শক্তির অন্তর্গত। কিন্তু তবুও সেই তেজোলেশ্যায় তীর্থংকরকে ভস্মীভূত করা যায় না। যত তপোবল গোশালকে আছে তার অনন্ত গুণ তপোবল নির্গ্রন্থ শ্রমণে আছে। কিন্তু নিগ্রন্থ শ্রমণ ক্ষমাশীল হন, তাঁরা সেই তপোবলের ব্যবহার করেন না। যত তপোবল নির্গ্রন্থ শ্রমণে আছে তার অনন্তগুণ তপোবল নির্গ্রন্থ স্থবিরে আছে। কিন্তু স্থবিরেরা ক্ষমাশীল হন, সেই তপোবলের ব্যবহার করেন না। যত তপোবল নির্গ্রন্থ স্থবিরে আছে তার অনন্তগুণ তপোবল নির্গ্রন্থ তীর্থংকরে আছে। কিন্তু নির্গ্রন্থ তীর্থংকরেরা ক্ষমাশীল হন, সেই তপোবলের ব্যবহার করেন না। আনন্দ, তুমি গৌতমাদি স্থবিরদের গিয়ে একথা জানিয়ে দাও যে গোশালক এখন ক্রুদ্ধ ও দ্বেষভাব নিয়ে এখানে আসছে।

তাই সে যাই বলুক, যাই করুক, কেউ যেন তার প্রতিবাদ না করে। এমন কি কেউ যেন তার সঙ্গে শাস্ত্রার্থেও প্রবৃত্ত না হয়।

আনন্দ সেকথা তাড়াতাড়ি সবাইকে গিয়ে জানিয়ে দিল।

কিন্তু সে ফিরে আসবার আগেই গোশালক আজীবিক শ্রমণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বর্ধমান যেখানে বসেছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ও তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, কাশ্যপ, তুমি ত খুব বলে বেড়াচ্ছ, আমি গোশালক মংখলীপুত্র, তোমার ধর্মশিষ্য। কিন্তু কি অজ্ঞান! আয়ুষ্মন্, তুমি কি জান, তোমার ধর্মশিষ্য মংখলীপুত্র গোশালকের কবে মৃত্যু হয়েছে? শোনো কাশ্যপ, আমি তোমার শিষ্য মংখলীপুত্র গোশালক নই, আমি এক ভিন্ন আত্মা। গোশালকের শরীর উপসর্গ সহ্যক্ষম দেখে তাতে প্রবেশ করেছি মাত্র। আমি উদায়ী কুণ্ডিয়ান নামক ধর্ম প্রবর্তক। এই আমার সপ্তম শরীর প্রবেশ। তুমি জিজ্ঞেস করবে, আমি এভাবে অন্যের শরীরে প্রবেশ করি কেন? তার প্রত্যুত্তর আমাদের ধর্মশাস্ত্রানুসারে তোমায় দিচ্ছি। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে রয়েছে চৌরাসী লক্ষ মহাকল্পের পর সাত দিব্য সংযুথিক ও সাত সংনিগর্ভক জীবন যাপন করে সাত শরীরান্তর প্রবেশের ভিতর দিয়ে সমস্ত জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। কাশ্যপ, আমি সাত দিব্য সাংযুথিক ও সাত সংনিগর্ভক জীবন যাপনের পর সপ্তম মনুষ্যভবে সাত শরীরান্তর গ্রহণ করেছি। সপ্তম মনুষ্যভবে আমি উদায়ী কুণ্ডিয়ান হয়ে জন্মগ্রহণ করি। রাজগৃহের বাইরে মণ্ডিতকুক্ষি চৈত্যে আমি উদায়ী কুণ্ডিয়ানের শরীর পরিত্যাগ করে ঐণেয়কের শরীরে প্রবেশ করি এবং সেই শরীরে বাইশ বছর বাস করি। উদ্দণ্ডপুর নগরে চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে আমি ঐণেয়কের শরীর পরিত্যাগ করে মল্লরামের শরীরে প্রবেশ করি ও সেই শরীরে একুশ বছর বাস করি। চম্পা নগরীর অঙ্গমন্দির চৈত্যে মল্লরামের শরীর পরিত্যাগ করে মাল্যমণ্ডিতের শরীরে প্রবেশ করি ও সেই শরীরে কুড়ি বছর বাস করি। বারাণসীর কাম মহাবনে মাল্যমণ্ডিতের শরীর পরিত্যাগ করে রোহের শরীরে প্রবেশ করি ও সেই শরীরে উনিশ বছর বাস

করি। আলম্ভিকার পত্তকালয় চৈত্যে রোহের শরীর পরিত্যাগ করে ভারদ্বাজের শরীরে প্রবেশ করি ও সেখানে আঠারো বছর বাস করি। বৈশালীতে কোণ্ডিয়ায়ন চৈত্যে ভারদ্বাজের শরীর পরিত্যাগ করে গৌতমপুত্র অর্জুনের শরীরে প্রবেশ করি ও সতেরো বছর সেখানে বাস করি। শ্রাবস্তীর হালাহলার ভাণ্ডশালায় অর্জুনের শরীর পরিত্যাগ করে স্থির, দৃঢ় ও কষ্টক্ষম গোশালকের শরীরে প্রবেশ করি। এই শরীরে ষোল বছর থাকবার পর আমি মোক্ষপদ লাভ করব। আর্য কাশ্যপ, এখন তুমি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছ, আমি কে? তুমি যদিও আমাকে গোশালক বলে অভিহিত করছ তবু আমি বাস্তবে গোশালক নই, গোশালকের শরীরধারী উদায়ী কুণ্ডিয়ান।

গোশালক একটুখানি থামতেই বর্ধমান তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, গোশালক, চোর যেমন নিজেকে গোপন করবার জন্য অন্য পরিচয় দেয়, নিজেকে তেমনি তুমিও অন্য লোক বলে প্রমাণিত করতে চাইছ। কিন্তু মহানুভব, এভাবে নিজেকে ভিন্ন আত্মা বলে প্রমাণিত করা যায় না। এবং তার জন্য তুমি বৃথাই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করছ। তুমিই সেই মংখলীপুত্র গোশালক যে কিছুকাল আমার সঙ্গে ছিল। আর্য, তোমাতে এই মিথ্যাচরণ শোভা পায় না।

গোশালক এতে বিনীত হওয়া ত দূরের কথা, আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। রূঢ় স্বরে বর্ধমানের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, শোন ধৃষ্ট কাশ্যপ, তোমার বিনাশকাল এখন সমুপস্থিত। তুমি এখন নষ্ট হতে বসেছ। মনে করো তুমি যেন পৃথিবীতে কোনো কালেই জন্মগ্রহণ করোনি। আমি তোমাকে সহজে অব্যাহতি দেব না।

বর্ধমানের প্রতি এই কটূক্তি, এই হীন শব্দ প্রয়োগ, বর্ধমান শিষ্য সর্বানুভূতি সহ্য করতে পারল না। সে গোশালকের কাছে গিয়ে বলল, শোনো মহানুভব গোশালক, যদি কেউ ধর্ম প্রবক্তার কাছে ধর্ম প্রবচন শোনে সে তবে তাকে বন্দনা ও নমস্কার করে। আর ইনি ত তোমার ধর্মগুরু। এঁর প্রতি এত হীন কটূক্তি! মহানুভব, এ তোমার শোভা পায় না। এ তোমার উচিত নয়।

সর্বানুভূতির সেই হিতবাক্য গোশালকের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করল। শান্ত হবার পরিবর্তে তিনি আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন ও সর্বানুভূতির ওপর তেজোলেশ্যার প্রয়োগ করে বসলেন। সর্বানুভূতি সেই তেজোলেশ্যার প্রচণ্ড জ্বালায় দগ্ধ হয়ে সেইখানেই মৃত্যুবরণ করল।

গোশালক তখন বর্ধমানকে আরও কটূক্তি করে বলতে লাগলেন, অক্ষম! অপারগ! কোথায় তোমার সেই শীতলেশ্যা, যে শীতলেশ্যায় তুমি গোশালককে এক সময় রক্ষা করেছিলে? তুমি ভুয়ো তীর্থংকর! জনসাধারণকে বৃথাই তুমি প্রতারিত করছ। কই চুপ করে বসে রয়েছ কেন? অনুতাপ হচ্ছে না নিজের শিষ্যকে এ ভাবে বিনষ্ট হতে দেখেও? ধিক্ তোমাকে!

শান্ত হও গোশালক, শান্ত হও—বলে এগিয়ে এল শ্রমণ সুনক্ষত্র। তার ধর্মগুরুর অপমান সেও সহ্য করতে পারছিল না। সে গোশালককে শান্ত করতে গেল।

সহ্য হচ্ছে না বুঝি তোমার ধর্মগুরুর অপমান? আচ্ছা, তার জ্বালা হতে তোমারও আমি মুক্তি দিচ্ছি বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন গোশালক। তারপর দেখতে দেখতে সর্বানুভূতির মত সুনক্ষত্রও সেইখানে তেজোলেশ্যার প্রচণ্ড জ্বালায় দগ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

গোশালক তখন আত্ম পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বর্ধমানের দিকে চেয়ে বললেন, দেখলে কাশ্যপ, দেখলে আমার তপঃপ্রভাব। তোমার দু' দু'জন শিষ্য কি ভাবে আমার তেজোলেশ্যায় মৃত্যুবরণ করল! এর পরও কি তুমি বলবে আমি মংখলীপুত্র গোশালক, আমি তোমার শিষ্য?

যা সত্য তা বলতেই হবে গোশালক! তুমি নিজেই আমাকে তোমার ধর্মাচার্যরূপে বরণ করেছিলে। আমি তোমাকে স্বীকার করেছিলাম। তাই আমি তোমার ধর্মগুরু। গোশালক, তুমি এখন ক্রোধের আবেশে রয়েছ তাই যথার্থ বিবেচনা শক্তি হারিয়ে ফেলেছ। তুমি যা করেছ তা গর্হিত, তা অনুচিত।

তোমার দু'জন শিষ্যকে মৃত্যুবরণ করতে দেখেও এখনো তোমার দম্ভ গেল না, কাশ্যপ। আমি তোমার শিষ্য? কখনো না। আমি উদায়ী কুণ্ডিয়ান। চরম তীর্থংকর।···কাশ্যপ, তুমি নির্বীর্য। যদি তোমার মধ্যে এতটুকু শক্তি ও মনুষ্যত্ব থাকত তবে তুমি এদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে। না, তা তোমার মধ্যে নেই···তবে চির জীবনের এই অনুশোচনার হাত হতে তোমাকেও আমি মুক্তি দেব। তোমার উপর আমি আমার তেজোলেশ্যার প্রয়োগ করব, যদি ক্ষমতা থাকে তবে প্রতিরোধ কর।

তীর্থংকর যেমন রক্ষাও করেন না তেমনি প্রতিরোধও করেন না, গোশালক। তবে তেজোলেশ্যা তীর্থংকরকে দগ্ধ করে না। মেরুপর্বতে প্রতিহত বাতাসের মত তা ফিরে যায় এবং যে তার প্রয়োগ করে তার শরীরে প্রবেশ ক'রে তাকে দগ্ধ করে। তোমার প্রযুক্ত তেজোলেশ্যা আমার এখান হতে প্রতিহত হয়ে তোমার কাছেই ফিরে গেছে। তার জ্বালায় তুমিই এখন দগ্ধ হচ্ছ।

তার জ্বালায় সত্যি তখন দগ্ধ হচ্ছিলেন গোশালক কিন্তু সেকথা প্রকাশ্যে স্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি জ্বালায় পীড়িত হয়েও উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠলেন, মিথ্যে কথা বলছ, কাশ্যপ, আমার তেজোলেশ্যা আমার শরীরে প্রবেশ করেনি। তোমার শরীরেই প্রবেশ করেছে। এর প্রভাবে ছ'মাসের মধ্যে তুমি পিত্ত ও দাহ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ছদ্মস্থ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে।

না, গোশালক। ছ'মাসের মধ্যে পিত্ত ও দাহ জ্বরে আমার মৃত্যু হবে না। আমি এখনো ষোল বছর আরও বেঁচে থাকব। আর তুমি তোমার নিজের তেজোলেশ্যায় দগ্ধ হয়ে সাতদিনের মধ্যে ছদ্মস্থ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে। গোশালক, তুমি ভালো করোনি। এখনো সময় রয়েছে। পশ্চাত্তাপ করো, প্রতিক্রমণ করো যাতে ঊর্ধ্বগতি লাভ করতে পার।

তোমার উপদেশ দিতে হবে না, কাশ্যপ। তুমি তোমার নিজের

কথা চিন্তা কর, আমার কিসে ভালো হবে সে আমি নিজেই স্থির করে নেব।

সে তো ভালো কথা, বলে বর্ধমান একটু হাসলেন, তারপর নিজের শ্রমণ সঙ্ঘের দিকে চেয়ে বললেন, এবারে তোমরা ওর সঙ্গে কথা বলতে পার, ওর সঙ্গে বাদ-বিবাদ করতে পার। গোশালকের তেজোলেশ্যা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়ে গেছে।

কিন্তু আর কথা বলবার বা বাদ-বিবাদ করবার মত অবস্থা তখন গোশালকের ছিল না। তেজোলেশ্যার জ্বালায় তাঁর সমস্ত শরীর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তাই তার প্রয়োজন নেই, বলে তিনি সশিষ্য সেই স্থান পরিত্যাগ করে হালাহলার ভাণ্ডশালায় ফিরে গেলেন।

গোশালক হালাহলার ভাণ্ডশালায় ফিরে গেলেন কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বর্ধমানের কথাই সত্যি হল। গোশালক দাহজ্বরে আক্রান্ত হয়ে সাত দিনের দিন হালাহলার ভাণ্ডশালায় শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন।

গোশালক প্রযুক্ত তেজোলেশ্যা বর্ধমানের তাৎকালিক কোনো ক্ষতি না করলেও পরে তার প্রভাবে তাঁর দেহ পিত্তজ্বরে আক্রান্ত হল।

বর্ধমান তখন মেঁঢ়িয় গ্রামে অবস্থান করছিলেন এবং সেই ঘটনারও ছ'মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তবু তাঁকে দুর্বল ও ক্ষীণ হতে দেখে গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করতে লাগল: বর্ধমান দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাঁর সম্পর্কে গোশালকের ভবিষ্যদ্বাণী যেন না সত্যি হয়ে যায়।

সালকোষ্ঠক চৈত্যের কাছে মালুকাকচ্ছে ধ্যান করতে করতে বর্ধমান শিষ্য সিংহ সেই কথা শুনল। সেই কথা তার কানে যেতে তার ধ্যানভঙ্গ হল। সে ভাবতে লাগল, তবে কি সত্যি ভগবান বর্ধমান সম্বন্ধে গোশালকের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হবে? তাহলে লোকে কি বলবে?

তখন সিংহ সেখানে আর থাকতে পারল না। সেখান হতে বেরিয়ে বর্ধমানের কাছে যাবার জন্য কচ্ছের মধ্যভাগ দিয়ে মেঁঢ়ির গ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু বেশীদূর সে যেতে পারল না। আবেগ ও দুশ্চিন্তায় তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

মেঁঢ়ির গ্রামে বসে বর্ধমান সিংহের মনোভাব জানতে পারলেন। তিনি তখন শ্রমণদের সম্বোধন করে বললেন, আয়ুষ্মন্, শ্রমণ সিংহ আমার ব্যাধির জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মালুকাকচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তোমরা যাও ও তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

শ্রমণেরা তখন সিংহের কাছে গেল। বলল, সিংহ তোমায় দেবার্য ডাকছেন।

সিংহ তখন শ্রমণদের সঙ্গে সালকোষ্ঠক চৈত্যে বর্ধমান যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে এল ও তাঁকে প্রদক্ষিণা ও বন্দনা করে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

বর্ধমান তখন সস্নেহ সুস্মিত হাসি হেসে বললেন, সিংহ, তুমি আমার ভাবী অনিষ্ট চিন্তা করে কেঁদে ফেলেছিলে ?

সিংহ বলল, হ্যাঁ, ভগবন্। আজ যখন ছ'মাস পূর্ণ হতে চলেছে তখন গোশালকের কথা মনে করে আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম।

বর্ধমান বললেন, সিংহ, এ বিষয়ে তোমার কোনো চিন্তা করা উচিত নয়। এখনো আমি সাড়ে পনেরো বছর এই সংসারে সুখে বিচরণ করব।

আপনার কথা যেন সত্যি হয়—আবেগে সিংহ বলে উঠল। তবে আপনাকে রোগগ্রস্ত দেখলে আমাদের কষ্ট হয়। আপনার এই ব্যাধি দূর করবার কি কোনো উপায় নেই ?

বর্ধমান বললেন, কেন থাকবে না। বৎস, তোমার যদি তাই ইচ্ছা তবে মেঁঢ়িরগ্রামে গাথাপত্নী রেবতীর কাছে যাও। সে কুমড়ো ও বাতাবি লেবু দিয়ে দুটো ওষুধ তৈরী করেছে তার প্রথমটি আমার জন্য, দ্বিতীয়টি অন্য প্রয়োজনে। প্রথমটির আমার

জমালির মুখে আত্মশ্লাঘাকর সেই উক্তি শুনে বর্ধমানের প্রথম ও প্রধান শিষ্য গৌতম জমালিকে সম্বোধন করে বললেন, জমালি, কেবল-জ্ঞান ও দর্শনকে তুমি কি ভেবে রেখেছ? সে সেই জ্যোতি যা লোক ও অলোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়, সমুদ্র নদী পর্বত কিছুতেই যা ব্যাহত হয় না। মহানুভব, যার মধ্যে সেই দিব্য জ্যোতির প্রাদুর্ভাব হয় সেই আত্মা কখনো গোপন থাকে না। কিন্তু এ নিয়ে অধিক কথা বলে কি লাভ? আমি তোমায় দুটি প্রশ্ন করছি তুমি তার প্রত্যুত্তর দাও। লোক শাশ্বত না অশাশ্বত? জীব শাশ্বত না অশাশ্বত?

জমালি এর প্রত্যুত্তর দিতে পারলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বর্ধমান তখন তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, জমালি, আমার এমন অনেক শিষ্য রয়েছে যারা ছদ্মস্থ হয়েও এর উত্তর দিতে পারে কিন্তু তারা কেবলী হবার দাবি করে না। দেবানুপ্রিয়, কেবল-জ্ঞান এমন কোনো বস্তু নয় যার অস্তিত্ব বোঝাবার জন্য কেবলীকে নিজের মুখে সে কথা বলতে হয়।

জমালি, লোক শাশ্বত কারণ তা অনন্তকাল পূর্বেও ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও অনন্তকাল থাকবে।

অন্য অপেক্ষায় লোক অশাশ্বত। কাল রূপে উৎসর্পিণী চলে যায়, অবসর্পিণী আসে, অবসর্পিণী চলে যায় উৎসর্পিণী আসে। এভাবে অন্য যে লোকাত্মক দ্রব্য রয়েছে তাতে অথবা তার অবয়বে পর্যায়ের পরিবর্তিত হতে থাকে, তাই লোক অশাশ্বত।

এভাবে জীব শাশ্বত আবার অশাশ্বতও। শাশ্বত কারণ তা ত্রিকালবর্তী, অশাশ্বত কারণ পর্যায়রূপে তা নিত্য পরিবর্তনশীল। অনেক পর্যায়ের উৎপাদ ও ব্যয়ের অপেক্ষায় জীব অশাশ্বত।

এভাবে বর্ধমান জমালিকে অনেক বোঝালেন কিন্তু জমালি নিজের আগ্রহ পরিত্যাগ করলেন না। শেষে তিনি বর্ধমানের সঙ্ঘ হতে নিজেকে পৃথক করে নিলেন।

জমালি যখন কতিপয় সাধুসহ নিজেকে সঙ্ঘ হতে পৃথক করে নিলেন তখন বর্ধমান কন্যা প্রিয়দর্শনাও কতিপয় সাধ্বীসহ স্বামীর অনুগমন করলেন। তারপর বিভিন্ন স্থানে প্রব্রজন করতে করতে একসময় শ্রাবস্তীতে এসে ঢংক কুমোরের ভাণ্ডশালায় অবস্থান করলেন।

ঢংক বর্ধমানের অনুযায়ী শ্রাবক ছিল। জমালির সঙ্গেও সে পূর্ব হতে পরিচিত ছিল। প্রিয়দর্শনা যে জমালির মতানুবর্তিনী সেকথাও সে জানত। জমালির অনুবর্তীদের ভ্রম কিভাবে ভাঙিয়ে তাদের আবার মূল সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত করা যায় সে ইচ্ছাও তার প্রবল ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই সে একদিন প্রিয়দর্শনার সংঘাটির (চাদর) ওপর এক কণা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ফেলে দিল।

তাই দেখে প্রিয়দর্শনা বলে উঠলেন, আর্য, এ তুমি কি করলে, আমার সংঘাটিকে জ্বালিয়ে দিলে।

ঢংক উত্তর দিল, সংঘাটি ত এখনো জ্বলে নি, জ্বলছে।

ঢংকের এই প্রত্যুত্তরে প্রিয়দর্শনা বুঝতে পারলেন বর্ধমানের 'করেমাণে কড়ে'র সার্থকতা। তিনি তাঁর অনুবর্তী সাধ্বী সঙ্ঘ সহ বর্ধমানের মূল সঙ্ঘে আবার ফিরে এলেন।

জমালির অনুবর্তী শ্রমণেরাও একে একে বর্ধমানের মূল সঙ্ঘে যোগ দিল কিন্তু জমালি তাঁর নূতন মতবাদ পরিত্যাগ করলেন না। যেখানে যেতেন সেখানে সেই মতবাদ প্রচার করতেন।

জমালিকৃত সঙ্ঘ ভেদই জৈন সঙ্ঘের প্রথম নিহ্নব।

ওদিকে বর্ধমান মেঁঢিয়গ্রাম হতে মিথিলায় গেলেন। সেবারের চাতুর্মাস্য সেখানেই ব্যতীত করলেন। তারপর চাতুর্মাস্য শেষ হলে মিথিলা হতে কোশলের দিকে প্রস্থান করলেন।

॥ ১৬ ॥

বর্ধমান যখন কোশলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ইন্দ্রভূতি গৌতম নিজের শিষ্যসহ আরও একটু এগিয়ে শ্রাবস্তীতে গিয়ে

উপস্থিত হলেন। সেখানে কোষ্ঠক চৈত্যে অবস্থান করতে লাগলেন।

সেই সময় পার্শ্বাপত্য কেশীকুমারও নিজের শিষ্যসহ শ্রাবস্তীর তিন্দুকোদ্যানে অবস্থান করছিলেন।

কেশীকুমার ও গৌতমের শিষ্যরা দুই সম্প্রদায়ের আচারের ভিন্নতা দেখে ভাবতে লাগলেন: এই ধর্মই বা কি রকম? ওই ধর্মই বা কি রকম? মহামুনি পার্শ্বনাথের ধর্ম চতুর্যাম, মহাতপস্বী বর্ধমানের ধর্ম পঞ্চযামিক। এক ধর্ম সচেলক, অন্য ধর্ম অচেলক। মোক্ষের সাধনায় প্রবৃত্ত ধর্মের মধ্যে আচারে এই পার্থক্য কেন?

শিষ্যদের মধ্যের এই আলোচনা গৌতম ও কেশীকুমার উভয়েই শুনলেন। এর সমাধানের জন্য উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য ইচ্ছুক হলেন।

ব্যবহারজ্ঞাতা গৌতম কুমার-শ্রমণ কেশী প্রাচীন কুলের বলে শিষ্যসহ একদিন নিজেই তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

গৌতমকে আসতে দেখে কেশী উঠে দাঁড়ালেন ও তাঁকে যথোচিত সমাদরে আসনে নিয়ে এসে বসালেন। অন্যান্য শ্রমণেরাও যথোচিত আসন গ্রহণ করল।

তীর্থংকর পার্শ্বনাথ ও বর্ধমানের শ্রমণ সম্প্রদায়ের এই একত্র সমবেশ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তাই এই সম্মিলনের খবর পেয়ে অন্য তীর্থিক সাধু ও গৃহস্থরাও তা দেখবার ও তাঁদের আলোচনা শুনবার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হল।

সকলে আসন গ্রহণ করলে বিনয় বিনম্র কণ্ঠে কেশী বললেন, মহাভাগ গৌতম, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি।

গৌতম বললেন, পূজ্য কুমার শ্রমণ, আপনার যা জিজ্ঞাস্য তা আপনি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

কেশী বললেন, আর্য, মহামুনি পার্শ্বনাথ চতুর্যাম ধর্মের নিরূপণ করেছিলেন আর ভগবান বর্ধমান পঞ্চযাম ধর্মের। এই মতভেদের কারণ কী, যখন উভয়েই একই মোক্ষমার্গের অনুযায়ী? গৌতম, এই

মতভেদ দেখে আপনার মনে কি কোনো সংশয় বা শঙ্কার উদয় হয় না?

চতুর্যাম ধর্মে অহিংসা, সত্য, অচৌর্য ও অপরিগ্রহ পালনীয়। পঞ্চযাম ধর্মে এই চারিটির সঙ্গে ব্রহ্মচর্যও।

গৌতম বললেন, পূজ্য কুমার-শ্রমণ, ধর্মতত্ত্বের উপদেশ মানুষের বুদ্ধি ও সামর্থ্যানুযায়ী হয়ে থাকে। তাই যে সময়ে যে ধরনের মানুষ জন্মায় সেই সময় তাদের বুদ্ধি ও সামর্থ্যানুযায়ী ধর্মতত্ত্বের উপদেশ হয়। প্রথম তীর্থংকরের সময় মানুষ সরল ছিল কিন্তু জড়বুদ্ধি তাই তাদের পক্ষে আচারমার্গ শুদ্ধ রাখা কঠিন ছিল। আবার আজ শেষ তীর্থংকরের সময় মানুষ কুটিল ও জড়বুদ্ধি। তাই তাদের পক্ষেও আচারমার্গ শুদ্ধ রাখা কঠিন। এই জন্যই প্রথম ও শেষ তীর্থংকর পঞ্চযাম ধর্মের উপদেশ দেন যাতে সমস্ত কিছু তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ের মানুষের এর প্রয়োজন হয় না। তারা সরল ও চতুর হয় বলে সহজেই ধর্মতত্ত্বের উপদেশ বুঝতে পারে ও তা পালন করতে সমর্থ হয় এজন্য মধ্যবর্তী তীর্থংকরেরা চতুর্যাম ধর্মের উপদেশ দেন। ব্রহ্মচর্য যে অপরিগ্রহ পালন করে তার অবশ্যই পালনীয় তা পৃথক করে বলতে হয় না।

কেশী বললেন, গৌতম, আপনাকে ধন্যবাদ। আমার সংশয় দূর হয়েছে, আমার দ্বিতীয় সংশয় এখন উপস্থিত করি। ভগবান বর্ধমান অচেলক থাকেন ও তাঁর বহু শিষ্যও অচেলক থাকে। কিন্তু মহাযশস্বী পার্শ্বনাথ সচেলক ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন। এই প্রভেদের কারণ কি?

গৌতম বললেন, কেশী, ধর্মের সাধনা জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত, বাহ্যবেশ বা চিহ্নের ওপর নয়। বাহ্য বেশ ও চিহ্ন ত পরিচয় ও সংযম নির্বাহের জন্য। তাই কেউ যদি নির্বস্ত্র থাকে কি তাতে কিছু যায় আসে না। নির্বস্ত্র হলেই মোক্ষ হবে সবস্ত্র হলে হবে না এমনও নয়। তবু ভগবান বর্ধমান যে অচেলক থাকেন বা তাঁর শ্রমণ সম্প্রদায়ের একটা অংশ অচেলক থাকে তার কারণ এ কালের মানুষ জড়বুদ্ধি বলে

অপরিগ্রহ বলতে যে সর্বত্যাগ তা বোঝাবার জন্য। তিনি কি আবার বলেন নি, বস্ত্রাদি স্থূল পদার্থ রাখা পরিগ্রহ নয়, পরিগ্রহ তাতে আসক্তি। সংযমী পুরুষের বস্ত্রাদি উপকরণ নেওয়া বা রাখায় মমত্ব নেই। সে ত দূরের নিজের শরীরে পর্যন্ত তাঁদের মমত্ব থাকে না।

কেশী বললেন, সাধু! সাধু! আমার এ সংশয়ও দূর হয়েছে। কিন্তু আমি আপনাকে আরও কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি।

গৌতম বললেন, কেশী, আপনি তা স্বচ্ছন্দে করতে পারেন।

কেশী বললেন, গৌতম, আপনি হাজার হাজার শত্রুর মধ্যে বাস করেন। এবং তারা সর্বদাই আপনাকে অভিভূত করবার চেষ্টা করছে। আপনি তাদের কিভাবে নির্জিত করে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেন?

গৌতম বললেন, কেশী, আমি প্রথমে একজন শত্রুকে নির্জিত করি। একজন শত্রুকে নির্জিত করলে পাঁচজন শত্রু নির্জিত হয়। পাঁচজন শত্রু নির্জিত হলে দশজন শত্রু নির্জিত হয়। দশজন শত্রু নির্জিত হলে সমস্ত শত্রুই নির্জিত হয়।

কেশী বললেন, সেই শত্রু কারা?

গৌতম বললেন, কেশী, মনই প্রথম ও প্রধান শত্রু। তাকে জয় করলে ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই পাঁচ শত্রু জিত হয়। এই পাঁচ শত্রু জিত হলে এই পাঁচ ও পাঁচ ইন্দ্রিয় সহ দশ শত্রু জিত হয়। দশ শত্রু জিত হলে সমস্ত শত্রুই জিত হয়। এভাবে সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করে আমি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করি।

এভাবে কেশী গৌতমকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন আর গৌতম তার প্রত্যুত্তর দিতে লাগলেন। সমস্ত দিন ধরে প্রশ্নোত্তর চলল।

এক সময় কেশী বললেন, গৌতম, সংসারে সমস্ত জীবই যখন গাঢ় অন্ধকারে মগ্ন তখন কে তাদের পথ দেখাবে, আলো দেবে?

গৌতম বললেন, কেশী, সমস্ত সংসারকে আলো প্রদানকারী সূর্য উদিত হয়েছে। সেই সূর্যই সমস্ত প্রাণীকে পথ দেখাবে, আলো দেবে।

গৌতম, কে সেই সূর্য ?

কেশী, বিগত-তৃষ্ণ সর্বজ্ঞ তীর্থংকরই সেই সূর্য। সেই সূর্য উদিত হয়েছে।

ভগবান বর্ধমানই সেই সূর্য।

গৌতম ও কেশীকুমারের এই বার্তালাপের প্রভাব পড়ল সকলের মনে। পার্শ্বাপত্য ও বর্ধমানের অনুযায়ী শ্রমণদের মনের সংশয় ও শঙ্কা গলে গলে গেল। তারা পরস্পরের আরও নিকটে এল। তারপর এক সময় এই দুই সম্প্রদায় এক হয়ে গেল।

বর্ধমানও ওদিকে ততদিনে নানাস্থানে প্রব্রজন করে শ্রাবস্তী এসে উপস্থিত হলেন তারপর সেখানে কিছুকাল বাস করে পাঞ্চালের দিকে চলে গেলেন। পাঞ্চাল হতে এলেন কুরুতে। কুরুদেশের রাজধানী হস্তিনাপুরের সহস্রাম্রবন উদ্যানে তিনি অবস্থান করলেন।

গৌতম একদিন ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে শিব রাজর্ষির কথা শুনে এলেন যিনি কিছুদিন আগে রাজ্য পরিত্যাগ করে তাপস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এখন তাঁর বিভঙ্গ জ্ঞান হওয়ায় সাত দ্বীপ ও সাত সমুদ্র পর্যন্ত তিনি দেখতে পান। সেই বিভঙ্গ জ্ঞানে তিনি এখন বলতে আরম্ভ করলেন সংসারে মাত্র সাতটি দ্বীপ ও সাতটি সমুদ্রই রয়েছে।

গৌতম সেকথা শুনে এসে বর্ধমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, শিব রাজর্ষির কথা কি সত্য ?

বর্ধমান বললেন, শিব রাজর্ষির কথা সত্য নয়। সংসারে অসংখ্য দ্বীপ ও সমুদ্র রয়েছে।

লোক মুখে বর্ধমানের উক্তি শিব রাজর্ষির কানে গিয়ে পৌঁছল। বর্ধমান সর্বজ্ঞ তীর্থংকর সেকথা তিনি জানতেন। তাঁর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল। তাই নিজের জ্ঞান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে হস্তিনাপুরের মধ্যে দিয়ে সহস্রাম্রবনে বর্ধমান যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বর্ধমান তাঁর সংশয় নিরসন করে নির্গ্রন্থ ধর্মের উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে শিব রাজর্ষি বর্ধমানের কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

বর্ধমান হস্তিনাপুর হতে গেলেন মোকায়। মোকা হতে আবার ফিরে গেলেন বাণিজ্যগ্রামে। সেই বছরের চাতুর্মাস্য বাণিজ্যগ্রামেই ব্যতীত করলেন।

॥ ১৭ ॥

চাতুর্মাস্য শেষে বাণিজ্যগ্রাম হতে বর্ধমান গেলেন রাজগৃহে।

রাজগৃহে গুণশীল চৈত্যে অবস্থান করলেন।

রাজগৃহে নির্গ্রন্থ শ্রাবক সংখ্যা অধিক হলেও অন্যতীর্থিক শ্রাবকেরাও থাকে। তারা সময়ে সময়ে এমন সব প্রশ্ন উপস্থিত করে যাতে অন্য সম্প্রদায়কে নীচু হতে হয়। একবার আজীবিক সম্প্রদায়ের শ্রমণোপাশকেরা গৌতমকে প্রশ্ন করল, ভগবন্, আপনাদের শ্রাবক যখন সামায়িক করে তখন যদি তার বাসন-কোসন ঘটি-বাটি কেউ চুরি করে নিয়ে যায় তবে কি সামায়িক শেষে সে তাদের খোঁজ করবে? যদি করে তবে কি সে তার নিজের দ্রব্যের খোঁজ করে না অন্যের দ্রব্যের?

তাৎপর্য এই যে সামায়িক নেবার সময় প্রত্যাখ্যানে সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করে সমভাবী হয়ে সে অবস্থান করে। সেই সময় তার জিনিস তার থাকে না। তাই সেই সময় যদি কেউ চুরি করে তবে তার জিনিস চুরি করেছে সেকথা বলা যায় না।

প্রশ্নটি কূট। কিন্তু বর্ধমান তার এভাবে সমাধান দিলেন। ব্রতী দশায় সে প্রত্যাখ্যান করলেও সেই বিষয়ে তার সম্পূর্ণ মমত্ব যায় না। সেই জন্য সেই বিষয়ও অন্যের হয়ে যায় না। তাই সামায়িক শেষে যদি সে সেই বিষয়ের তবে সে নিজের বিষয়েরই খোঁজ করে, অন্যের নয়।

আজীবিক সম্প্রদায়ের শ্রাবকেরা সে উত্তর শুনে নিরুত্তর হয়ে গেল। বর্ধমান সেই বর্ষাবাস রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন।

॥ ১৮ ॥

তারপর পৃষ্ঠচম্পা হয়ে চম্পায় এলেন। চম্পা হতে দশার্ণপুর হয়ে তিনি আবার বাণিজ্যগ্রামে ফিরে গেলেন।

বাণিজ্যগ্রামে সোমিল নামে এক ব্রাহ্মণ থাকেন। তিনি যেমন ধনী ছিলেন তেমনি বেদাদি শাস্ত্রে পারগত।

বর্ধমানের আসার সংবাদ পেয়ে তিনি মনে মনে ভাবলেন, যাই, ওঁর কাছে গিয়ে কিছু শাস্ত্রার্থ করি। তিনি যদি যথাযথ প্রত্যুত্তর দিতে পারেন তবে তাঁর পর্যুপাসনা করব। নইলে তাঁকে নিরুত্তর করে দিয়ে ফিরে আসব।

সোমিল তাই তাঁর ৫০০ জন শিষ্যের মধ্য হতে ১০০ জন বাছা বাছা শিষ্য নিয়ে বর্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও তাঁকে বন্দনা করে তাঁর হতে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, আপনার সিদ্ধান্তে কি যাত্রা, যাপনীয়, অব্যাবাধ ও প্রাসুক বিহার আছে?

বর্ধমান বললেন, হ্যাঁ সোমিল, আমার সিদ্ধান্তে যাত্রা, যাপনীয়, ও প্রাসুক বিহার আছে।

সোমিল বললেন, ভগবন্, আপনার যাত্রা কি?

বর্ধমান বললেন, তপ, নিয়ম, সংযম, স্বাধ্যায়, ধ্যান ও আবশ্যকাদি যোগে উদ্যম আমার যাত্রা।

ভগবন্, আপনার যাপনীয় কি?

সোমিল, যাপনীয় দুইপ্রকার, এক ইন্দ্রিয় যাপনীয়, দুই ন-ইন্দ্রিয় যাপনীয়। চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক এই পাঁচ ইন্দ্রিয়কে আমি বশীভূত রাখি। এই আমার ইন্দ্রিয় যাপনীয়। আর ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ আমার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের প্রাদুর্ভাব হয় না। তা আমার ন-ইন্দ্রিয় যাপনীয়।

ভগবন্, আপনার অব্যাবাধ কি ?

সোমিল, আমার শরীরে বাত, পিত্ত, কফ আদি শরীর সম্বন্ধীয় যে দোষ তা উপশান্ত হয়েছে তাই আমার অব্যাবাধ।

ভগবন্, আপনার প্রাসুক বিহার কি ?

সোমিল, আমি দেবালয় চৈত্য, স্ত্রী, পশু ও নপুংসকহীন বসতি আদিতে নির্দোষ ও এষণীয় পীঠ ফলক, শয্যাদি প্রাপ্ত হয়ে বিচরণ করি। তাই আমার প্রাসুক বিহার।

বর্ধমানের এই প্রত্যুত্তরে সোমিল সন্তুষ্ট হলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে নানাবিধ প্রশ্ন করলেন। শেষে জিজ্ঞেস করলেন, ভগবন্, আপনি এক না দুই ? আপনি অক্ষয়, অব্যয়, সৎ না ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে অনেক রূপধারী ?

বর্ধমান বললেন, সোমিল, আমি এক, আবার দুইও। আমি অক্ষয়, অব্যয়, সৎ, আবার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে বহুরূপধারীও ?

ভগবন্, সে কি রকম ?

সোমিল, আত্মদ্রব্যরূপে আমি এক, কিন্তু জ্ঞান ও দর্শন রূপে আমি দুই। আত্মপ্রদেশের অপেক্ষায় আমি অক্ষয়, অব্যয় ও সৎ কিন্তু পর্যায়ের দৃষ্টিতে আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে নানারূপধারী।

এ সেই অনেকান্তবাদের কথা। দ্রব্যরূপে নিত্য, পর্যায়রূপে অনিত্য। এবং বাস্তবে সত্যও তাই।

সোমিল তত্ত্বোপদেশ পেয়ে শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করলেন।

বর্ধমান সেই বছরের চাতুর্মাস্য সেখানেই ব্যতীত করলেন।

॥ ১৯ ॥

বর্ষাশেষে বাণিজ্যগ্রাম হতে প্রব্রজন করে কোশলের সাকেত, শ্রাবস্তী আদি নগর হয়ে পাঞ্চালের কাম্পিল্যপুরে এসে উপস্থিত হলেন ও নগরপ্রান্তের সহস্রাম্রবন উদ্যানে অবস্থান করলেন।

কাম্পিল্যপুরে অম্মড় নামে এক ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক থাকেন। তাঁর সাত শ' জন শিষ্য ছিল।

কাম্পিল্যপুরে ইন্দ্রভূতি গৌতম একদিন শুনে এলেন যে অম্মড় একই সময়ে এক শ' ঘরে আহার গ্রহণ করেন। সেকথা শুনে তাঁর মনে শঙ্কা উৎপন্ন হল। তিনি বর্ধমানের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবন্, অম্মড় সম্বন্ধে লোকে যা বলে তাকি সত্যি? অম্মড় কি একই সময়ে কাম্পিল্যপুরের একশ' ঘরে অবস্থান ও একশ' ঘরে আহার গ্রহণ করতে পারে?

বর্ধমান বললেন, হ্যাঁ, গৌতম, পারে।

ভগবন্, সে কি রকম?

গৌতম, অম্মড় বিনীত ও তপঃপরায়ণ। সেই তপস্যার প্রভাবে সে বীর্যলব্ধি, বৈক্রিয়লব্ধি ও অবধিজ্ঞানলব্ধি লাভ করেছে। এই সব লব্ধির প্রভাবে সে একশ' রূপ ধারণ করে একশ' ঘরে আহার করে লোকদের চমৎকৃত করছে।

ভগবন্, সে কি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার যোগ্যতা রাখে? সে কি নির্গ্রন্থ ধর্ম গ্রহণ করবে?

না, গৌতম, সে আমার শ্রমণ শিষ্য হবার যোগ্যতা রাখে না।

কাম্পিল্যপুর হতে প্রব্রজন করে বর্ধমান আবার বিদেহ ভূমিতে ফিরে এলেন। সেই বছরের বর্ষাবাসও তিনি বাণিজ্যগ্রামে ব্যতীত করলেন।

॥ ২০ ॥

বর্ষাকাল শেষ হলে তিনি কাশী ও কোশলের দিকে প্রস্থান করলেন কিন্তু বর্ষার আগে আবার বাণিজ্যগ্রামে ফিরে এলেন ও বাণিজ্যগ্রামের বাইরের দূতিপলাশ চৈত্যে অবস্থান করলেন।

একদিন দূতিপলাশ চৈত্যে পার্শ্বাপত্য শ্রমণ গাঙ্গেয় এলেন। এসে নারক, তীর্যক, মনুষ্য ও দেবতা এই চতুর্বিধ জীব সম্পর্কে নানা-

বিধ প্রশ্ন করতে লাগলেন। এক সময় প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, সৎ নারক উৎপন্ন হয়, না অসৎ? সৎ তীর্যক উৎপন্ন হয়, না অসৎ? সৎ মনুষ্য উৎপন্ন হয় না অসৎ? সৎ দেবতা উৎপন্ন হয়, না অসৎ?

বর্ধমান বললেন, গাঙ্গেয় সকলেই সৎ উৎপন্ন হয়, অসৎ কেউ উৎপন্ন হয় না।

ভগবন্, নারক, তীর্যক, মনুষ্য ও দেব সৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হন, না অসৎ?

গাঙ্গেয়, সকলে সৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অসৎ মৃত্যু কেউ প্রাপ্ত হয় না।

ভগবন্, সে কি রকম? সৎ কি ভাবে উৎপন্ন হয়? এবং যা মরে তার সত্তা কি রকম?

গাঙ্গেয়, পুরুষ শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব এই লোককে শাশ্বত বলেছেন। এই লোকে তাই যা 'সর্বথা অসৎ' তার উৎপত্তি হয় না। আর যা 'সৎ' তার সর্বথা বিনাশ হয় না।

ভগবন্, এই সত্য কি আপনার আত্মপ্রত্যক্ষ না অনুমান বা আগমমূলক?

গাঙ্গেয়, এই সত্য আমার আত্মপ্রত্যক্ষ। অনুমান বা আগম-মূলক নয়।

ভগবন্, সে কি রকম? অনুমান ও আগম ছাড়া তত্ত্ব কিভাবে জানা যায়?

গাঙ্গেয়, যিনি কেবল-জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি পূর্ব হতেও জানেন, পশ্চিম হতেও জানেন, দক্ষিণ হতেও জানেন, উত্তর হতেও জানেন, পরিমিতও জানেন, অপরিমিতও জানেন। তাঁর জ্ঞান প্রত্যক্ষ হওয়ায় সমস্ত তত্ত্ব প্রতিভাসিত হয়।

ভগবন্, নারক, তীর্যক, মনুষ্য ও দেবতা নিজে উৎপন্ন হয়, না কারু প্রেরণায়? নিজে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, না কারু প্রেরণায়?

গাঙ্গেয়, সমস্ত জীব নিজ নিজ শুভাশুভ কর্মানুসারে শুভাশুভ গতিতে উৎপন্ন ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অন্য কারু প্রেরণায় নয়।

এই তত্ত্বালোচনায় গাঙ্গেয় সন্তুষ্ট হলেন। তিনি ভগবান পার্শ্বের চতুর্যাম ধর্ম পরিত্যাগ করে বর্ধমানের পঞ্চযাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

বর্ধমান বাণিজ্যগ্রাম হতে বৈশালী এলেন, সেই বছরের বর্ষাবাস তিনি বৈশালীতেই ব্যতীত করলেন।

॥ ২১ ॥

বৈশালী হতে প্রব্রজন করে বর্ধমান মগধভূমি ও নানাস্থানে ধর্মোপদেশ দিতে দিতে রাজগৃহের গুণশীল চৈত্যে এসে অবস্থান করলেন।

গুণশীল চৈত্যে অন্যতীর্থিক সাধু ও শ্রমণেরা থাকেন। তাঁরা পরস্পর বার্তালাপ করেন, পরস্পরের মত খণ্ডন ও মণ্ডন করেন। গৌতম তাঁদের সেই খণ্ডন মণ্ডন বার্তালাপ শুনে বর্ধমানকে এসে একদিন প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, অন্যতীর্থিক শ্রমণদের কেউ বলেন শীল (সদাচার) শ্রেষ্ঠ, কেউ বলেন শ্রুত (জ্ঞান) শ্রেষ্ঠ। আবার অন্যরা বলেন শীল ও শ্রুত দুই-ই শ্রেষ্ঠ। সে কি রকম ?

বর্ধমান বললেন, গৌতম, অন্যতীর্থিকদের কথা ঠিক নয়। এই বিষয়ে আমার মত এই : সংসারে পুরুষ চার রকম—কেউ শীলসম্পন্ন, শ্রুতসম্পন্ন নয় ; কেউ শ্রুতসম্পন্ন, শীলসম্পন্ন নয় ; কেউ শীল সম্পন্ন, শ্রুত সম্পন্নও ; কেউ শীল সম্পন্নও নয়, শ্রুত সম্পন্নও নয়। গৌতম যে শীলবান কিন্তু শ্রুতবান নয় অর্থাৎ যে পাপ প্রবৃত্তি হতে দূরে থাকে কিন্তু ধর্মের জ্ঞাতা নয় তাকে আমি দেশারাধক (ধর্মের একাংশের আরাধক) বলি। যে শীলবান নয় কিন্তু শ্রুতবান অর্থাৎ পাপ প্রবৃত্তি হতে যে দূরে নয়, অথচ যে ধর্মের জ্ঞাতা তাকে আমি দেশ-বিরাধক বলি। যে শীলবান ও শ্রুতবান অর্থাৎ পাপ হতে নিবৃত্ত ও ধর্মের জ্ঞাতা তাকে আমি সর্বারাধক বলি। যে শীলবানও নয়, শ্রুতবানও নয় অর্থাৎ যে পাপ হতে দূরে থাকে না ও ধর্মতত্ত্বের জ্ঞাতাও নয়, তাকে আমি সর্ববিরাধক বলি।

গৌতম বললেন, ভগবন্‌, অন্যতীর্থিকেরা বলেন, প্রাণী হিংসা, মিথ্যা, চুরি, সংগ্রহেচ্ছা, ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ আদি দুষ্ট ভাবে প্রবৃত্তিকারী প্রাণীর জীব ও তার জীবাত্মা পৃথক। এইভাবে এর বিপরীত শুভভাবে প্রবৃত্তিকারী প্রাণীর জীব ও তার জীবাত্মা পৃথক। ভগবন্‌, অন্যতীর্থিকদের এই মান্যতা সত্য, না মিথ্যা ?

বর্ধমান বললেন, গৌতম অন্য তীর্থিকদের এই মান্যতা মিথ্যা। এই বিষয়ে আমার মত এই যে শুভ অশুভ প্রবৃত্তিকারী প্রাণীর জীব ও জীবাত্মা একই। যা জীব, তাই জীবাত্মা।

ভগবন্‌, অন্যতীর্থিকেরা বলেন, যক্ষ ভর করলে কেবলীও মিথ্যা বা সত্য-মিথ্যা বলেন, সে কি রকম ?

গৌতম, অন্যতীর্থিকদের এই উক্তিও মিথ্যা। এই বিষয়ে আমার মত এই যে কেবলীর ওপর কখনো যক্ষের ভর হয় না বা তিনি , মিথ্যা বা সত্য-মিথ্যা বলেন না। তিনি যা নির্দোষ সত্য তাই বলেন।

রাজগৃহ হতে বর্ধমান চম্পার দিকে গেলেন। তারপর নানাস্থানে প্রব্রজন করে আবার রাজগৃহের গুণশীল চৈত্যে ফিরে এলেন।

সেই সময় গুণশীল চৈত্যের নিকটে কালোদায়ি, শৈলোদায়ি, শৈবালোদায়ি, উদক আদি অনেক অন্যতীর্থিক সাধু ও শ্রমণেরা বাস করতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা বর্ধমানোক্ত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনাও করতেন। একবার তাঁরা বর্ধমান নিরূপিত পঞ্চাস্তিকায় বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। বলছিলেন, শ্রমণ জ্ঞাতপুত্র বলেন ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, জীবাস্তিকায় ও পুদ্গলাস্তিকায় এই পাঁচ রকমের অস্তিকায় আছে। এই পাঁচটির মধ্যে জীবাস্তিকায়কে জীবকায় বলেন অন্য চারটিকে অজীবকায় বলেন। আবার ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায় ও জীবাস্তিকায়কে অরূপীকায় ও পুদ্গলাস্তিকায়কে রূপীকায় বলেন। একি সত্য ?

ঠিক সেই সময় গুণশীল চৈত্যে অবস্থিত বর্ধমানকে বন্দনা ও নমস্কার করবার জন্য সেই পথ দিয়ে শ্রমণোপাসক মুদ্দক যাচ্ছিলেন। তাঁকে দূর হতে দেখতে পেয়ে কালোদায়ি বললেন, দেবানুপ্রিয়,

শ্রমণোপাসক মুদ্দক ওই যাচ্ছে। আমরা ওর কাছে গিয়ে আমাদের সন্দেহের নিরসন করি।

তখন তাঁরা সকলে মুদ্দকের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও বললেন, মুদ্দক, নিগণ্ঠ নাতপুত্ত পাঁচ অস্তিকায়ের কথা বলেন। তিনি কাউকে জীব বলেন, কাউকে অজীব, কাউকে রূপী, কাউকে অরূপী। তোমার এ বিষয়ে কি মত? তুমি কি ধর্মাস্তিকায়াদিকে জান বা দেখ?

মুদ্দক বললেন, কালোদায়ি এদের কাজ হতে এদের অনুমান করাই যায়, অরূপী হবার জন্য ধর্মাস্তিকায়াদিকে জানা বা দেখা যায় না।

মুদ্দক, তুমি কেমন শ্রমণোপাসক যে তোমার আচার্যোপদিষ্ট ধর্মাস্তিকায়াদিকে তুমি দেখ না বা জান না?

আর্যগণ, বাতাস বইছে একথা কি সত্য?

হ্যাঁ, সত্য। কিন্তু তাতে কি?

আর্যগণ, আপনারা কি বাতাসের রঙ ও রূপ দেখতে পান?

না, বাতাসের রঙ বা রূপ দেখা যায় না।

আর্যগণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শকারী গন্ধ পরমাণু কি আছে?

হ্যাঁ, আছে।

আর্যগণ, আপনারা কি সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শকারী গন্ধ পরমাণু দেখতে পান?

না, গন্ধপরমাণু দেখা যায় না।

আর্যগণ, অরণির মধ্যে কি অগ্নি অবস্থান করে?

হ্যাঁ, করে।

আপনারা কি অরণির অন্তর্গত সেই অগ্নি দেখতে পান?

না, দেখতে পাই না।

আর্যগণ, সমুদ্রের ওই পারের কি কোনো রূপ আছে?

হ্যাঁ, আছে।

আর্যগণ, সমুদ্রের ওই পারের রূপ কি আপনারা দেখতে পান?

না, পাই না।

আর্যগণ, দেবলোকগত রূপ কি আপনারা দেখতে পান ?

না, পাই না।

সেই রকম, আর্যগণ, আপনারা, আমরা বা অন্য কেউ যে বস্তু দেখতে পায় না তা নেই তা বলা যায় না। তা হলে এমন অনেক বস্তু রয়েছে যাদের নিষেধ করতে হয়। এবং তা করলে আপনাদের লোকের এক বৃহৎ অংশকেই অস্বীকার করতে হয়।

মৃদ্দক এভাবে অন্যতীর্থিকদের নিরুত্তর করে বর্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মৃদ্দক অন্যতীর্থিকদের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তা অনুমোদন করে বর্ধমান বললেন, মৃদ্দক, অন্যতীর্থিকদের প্রশ্নের তুমি যথার্থ উত্তর দিয়েছ। কোনো প্রশ্ন বা উত্তর না বুঝে শুনে করা বা দেওয়া উচিত নয়। যে না বুঝে শুনে তর্ক করে বা কোনো বস্তু প্রতিপাদন করতে চায়, সে অর্হৎ ও কেবলী নিরূপিত ধর্মের অমর্যাদা করে। মৃদ্দক, তুমি ঠিক, উচিত ও যথার্থ উত্তর দিয়েছ।

মৃদ্দক আরও কিছুক্ষণ সেখানে বসে ধর্মচর্চা করলেন। তারপর ঘরে ফিরে গেলেন।

সেই বছরের বর্ষাবাস বর্ধমান রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন।

॥ ২২ ॥

বর্ষাশেষে রাজগৃহ হতে প্রব্রজন করে বর্ধমান নানা স্থানে পর্যটন করলেন। তারপর বর্ষার আগে আবার রাজগৃহে ফিরে এলেন।

ইন্দ্রভূতি গৌতম একদিন ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে গুণশীল চৈত্যে ফিরে আসছিলেন। ঐ সময় কালোদায়ি, শৈলোদায়ি প্রভৃতি অন্যতীর্থিকদের কয়েকজন বর্ধমানের পঞ্চাস্তিকায়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। গত বছর মৃদ্দক তাঁদের নিরুত্তর করে দিলেও তাঁদের মনের সংশয় সমস্তটা এখনো যায় নি। তাই গৌতমকে তাঁরা দেখতে পেয়ে

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, ধর্মাস্তিকায় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। ভালই হল জ্ঞাতপুত্রের শিষ্য গৌতমও এসে গেলেন। চল, এঁকেই আমরা আমাদের সংশয়ের কথা বলি।

তখন তাঁরা গৌতমের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও বললেন, আর্য, আপনার ধর্মাচার্য জ্ঞাতপুত্র ধর্মাস্তিকায় আদি যে পঞ্চাস্তিকায়ের কথা বলেন তার মধ্যে চারটিকে অজীবকায় ও একটিকে জীবকায় বলেন। এ বিষয়ে আমরা কি বুঝব? এর রহস্য আমাদের বলুন।

প্রত্যুত্তরে গৌতম বললেন, দেবানুপ্রিয়, আমরা অস্তিত্বে নাস্তিত্ব বা নাস্তিত্বে অস্তিত্ব বলি না, আমরা অস্তিত্বকে অস্তি এবং নাস্তিত্বকে নাস্তি বলি। হে দেবানুপ্রিয়, এ বিষয়ে তোমরা নিজেরাই বিচার কর যাতে এর রহস্য বুঝতে পার।

এই বলে পঞ্চাস্তিকায়ের রহস্যকে আরও রহস্যময় করে দিয়ে গৌতম গুণশীল চৈত্যে ফিরে গেলেন।

অন্যতীর্থিকেরা গৌতমের কথার কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁরা তখন গৌতমকে অনুসরণ করে বর্ধমান যেখানে বসেছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

বর্ধমান তখন ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। প্রসঙ্গ আসতেই তিনি কালোদায়িকে সম্বোধন করে বললেন, কালোদায়ি, তোমরা কি পঞ্চাস্তিকায়ের বিষয়ে আলোচনা করছিলে?

হ্যাঁ, দেবার্য, আপনি পঞ্চাস্তিকায় নিরূপণ করেছেন তা যেদিন হতে জানতে পারি সেদিন হতে তাই নিয়ে সময়ে সময়ে আলোচনা করি।

বর্ধমান বললেন, কালোদায়ি, একথা সত্য যে আমি পঞ্চাস্তিকায় নিরূপণ করেছি। এবং এও সত্য যে আমি চার অস্তিকায়কে অজীবকায় এবং এক অস্তিকায়কে জীবকায়, চার অস্তিকায়কে অরূপীকায় ও এক অস্তিকায়কে রূপীকায় বলি।

ভগবন্, আপনার নিরূপিত এই ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায় বা জীবাস্তিকায়ের ওপর কেউ কি শুতে, বসতে বা দাঁড়াতে পারে?

না, কালোদায়ি, তা পারে না। শোয়া, বসা বা দাঁড়ানো কেবল পুদ্গলাস্তিকায়ের ওপরই হতে পারে যা রূপী ও অজীবকায়, অন্যত্র নয়।

ভগবন্, পুদ্গলাস্তিকায়ে জীবের দুষ্টবিপাক পাপ কর্ম কি হয়ে থাকে ?

না, কালোদায়ি, তা হয় না।

ভগবন্, তবে কি জীবাস্তিকায়ে জীবের দুষ্ট বিপাক পাপ কর্ম হয়ে থাকে ?

হ্যাঁ, কালোদায়ি, কোনো প্রকার কর্ম কেবল জীবাস্তিকায়েই সম্ভব।

বর্ধমান তখন পঞ্চাস্তিকায়ের বিষয়টি তার কাছে সুস্পষ্ট করে বিবৃত করলেন। শুনে কালোদায়ির নির্গ্রন্থ প্রবচনে শ্রদ্ধা হল। সে নির্গ্রন্থ প্রবচন গ্রহণ করে বর্ধমানের কাছে দীক্ষিত হল।

রাজগৃহের ঈশান কোণে ধনাঢ্যদের প্রাসাদমালায় সুশোভিত নালন্দা নামে এক উপনগর ছিল। সেই উপনগরে লেব নামে এক ধনাঢ্য শ্রমণোপাসক বাস করত। নালন্দার উত্তর-পূর্ব দিকে লেবর .শষ দ্রবিকা নামে এক উদকশালা ছিল। এই উদকশালার নিকটে হস্তিযাম নামে এক উদ্যান ছিল।

একসময় ভগবান বর্ধমান হস্তিযামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় একদিন শেষদ্রবিকার কাছে ইন্দ্রভূতি গৌতমের সঙ্গে পার্শ্বাপত্য শ্রমণ মেতার্য গোত্রীয় উদকের দেখা হল। উদক গৌতমকে দেখতে পেয়ে বললেন, গৌতম, আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি। উপপত্তি পূর্বক উত্তর দিন।

গৌতম বললেন, আয়ুষ্মন্, স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করুন।

উদক বললেন, গৌতম, আপনার ধর্মাচার্য শ্রমণোপাসককে এই বলে প্রত্যাখ্যান করান রাজাজ্ঞা আদি কারণে কোন গৃহস্থ বা চোরকে ধরা বা, ছাড়ার অতিরিক্ত আমি ত্রস জীবের হিংসা করব না। আর্য এই প্রকার প্রত্যাখ্যান অতিচার দোষে দুষ্ট। এতে যে প্রত্যাখ্যান করায় বা করে উভয়েই দোষী হয়। কারণ মৃত্যুর পর ত্রস জীব

স্থাবর রূপে উৎপন্ন হতে পারে। এজন্য ত্রস রূপে যে অঘাত্য ছিল স্থাবর রূপে সে ঘাত্য হয়ে যায়। তাই প্রত্যাখ্যানে 'ত্রস জীবের' স্থানে 'ত্রসভূত জীবের' হওয়া উচিত। ভূত শব্দের ব্যবহারে সেই দোষ পরিহার করা যায়। গৌতম, আমার কথা কি আপনার ঠিক মনে হচ্ছে না?

গৌতম বললেন, আয়ুষ্মন্ উদক, আমার কিন্তু আপনার কথা ঠিক মনে হচ্ছে না। কারণ এতে বক্তব্যকে আরও জটিল করাই হয়। কারণ সংসারে সংসারী জীব কর্মানুসারে ত্রস হতে স্থাবর, স্থাবর হতে ত্রস রূপে জন্মগ্রহণ করেই। কিন্তু যখন ওই প্রত্যাখ্যান করান হয় তখন সেই সময় যারা ত্রসকায়রূপে উৎপন্ন হয়েছে তাদেরই প্রত্যাখ্যান করান হয়, এইমাত্র। তাই ভূত বিশেষণ দেবার প্রয়োজন করে না।

গৌতম, 'ত্রস'-র আপনি কি অর্থ করেন? ত্রসপ্রাণ সো ত্রস বা অন্য।

আয়ুষ্মন্ উদক, আপনি যাদের ত্রসভূত প্রাণ বলেন আমরা তাদেরই ত্রস প্রাণ বলি। এ দুইই সমার্থক। আপনার বিচারে ত্রসভূতপ্রাণ ত্রস নির্দোষ, ত্রসপ্রাণ ত্রস সদোষ। কিন্তু আয়ুষ্মন্, যাতে বাস্তবিক কোনো ভেদ নেই, এরকম বাক্যের একটির খণ্ডন ও অন্যের মণ্ডন করা বৃথাই নয়, মানুষকে আরও বিভ্রান্ত করা। আর্য উদক, ত্রস মরে স্থাবর হয় তাই ত্রস হিংসা প্রত্যাখ্যানকারীর হাতে সেই রকম স্থাবর হত্যায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় আপনার সে কথাও ঠিক নয়, কারণ ত্রস নাম কর্মের উদয়েই জীবকে ত্রস বলা হয়। আর যখন ত্রস গতির আয়ুষ্য ক্ষয় হওয়ায় ত্রসকায়িক শরীর পরিত্যাগ করে স্থাবর-কায়িক শরীর গ্রহণ করে তখন স্থাবরকায়িক নাম কর্মের জন্য তাদের স্থাবরকায়িকই বলা হবে।

আয়ুষ্মন্ গৌতম, তবে ত এমন কোনো পর্যায়ই পাওয়া যাবে না যা ত্যাজ্য হিংসার বিষয় হয় আর যখন হিংসার কোনো বিষয়ই থাকে না তখন কার হিংসার প্রত্যাখ্যান করবে। যদি সহসাই সমস্ত ত্রস

মরে স্থাবর হয়ে যায় বা স্থাবর ত্রস তাহলে ত্রস হিংসা প্রত্যাখ্যান সে কিভাবে পালন করবে ?

আয়ুষ্মন্ উদক, এমন কখনো হয় না যে সহসাই সব ত্রস স্থাবর, ও সব স্থাবর ত্রস হয়ে যায় কিন্তু যদি তর্কের জন্য আপনার কথা স্বীকারও করি তবু বলব যে তাতে ত্রস হিংসার প্রত্যাখ্যানে বাধা হয় না। কারণ স্থাবর পর্যায়ের হিংসায় তার ব্রত খণ্ডিত হয় না এবং সে অধিক ত্রস পর্যায়ের জীবের রক্ষা করে। আর্য উদক, যে সমস্ত শ্রমণোপাসক ত্রস জীবের হিংসা হতে নিবৃত্ত হয় তাদের জন্য কোনো পর্যায়ের হিংসার প্রত্যাখ্যান নয় বলা কি উচিত ? এভাবে নির্গ্রন্থ প্রবচনে মতভেদ উপস্থিত করা কি ভালো ?

গৌতম ও উদকের আলোচনায় আকৃষ্ট হয়ে সেখানে আরও কিছু পার্শ্বাপত্য শ্রমণেরা এসে উপস্থিত হলেন। তাই দেখে গৌতম বললেন, আর্য উদক, এই বিষয়ে আপনার স্থবির নির্গ্রন্থদেরই আমি জিজ্ঞাসা করছি, আয়ুষ্মন্, এই সংসারে এমন অনেকের প্রতিজ্ঞা আছে : জীবন কাল পর্যন্ত শ্রমণের হিংসা করব না। শ্রমণদের কেউ যদি শ্রামণ্য পরিত্যাগ করে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে যায়, সেই অবস্থায় সাধু হিংসা পরিত্যাগকারী সেই গৃহস্থ যদি সেই গৃহস্থরূপী সাধুর হিংসা করে তবে কি তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে ?

না, গৌতম না। তাতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না।

নির্গ্রন্থগণ, এই রকমই ত্রস জীব হিংসা পরিত্যাগকারী শ্রমণোপাসক যদি স্থাবরকায়ের হিংসাও করে ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না।

নির্গ্রন্থগণ, কোন গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র ধর্মশ্রবণ করে সর্বত্যাগী শ্রমণ হয়ে যায় তবে তাকে সর্বহিংসা পরিত্যাগী বলা যায় কিনা ?

হ্যাঁ, গৌতম, নিশ্চয়ই বলা যায়।

কিন্তু সেই শ্রমণ চার বা পাঁচ বছর বা তার কিছু অধিক বা কিছু কম সময় পর্যন্ত শ্রমণ ধর্ম পালন করে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে আসে তবে কি তাকে সর্বহিংসা পরিত্যাগী বলা যাবে ?

না, গৌতম না।

কিন্তু এ সেই জীবই যে প্রথমে সর্বহিংসা পরিত্যাগী ছিল কিন্তু এখন নয়। প্রথমে সংযত ছিল এখন নয়। এই রকমই ত্রসকায় হতে স্থাবরকায়ে উৎপন্ন জীব ত্রস নয়, স্থাবরই।

নিগ্রন্থগণ, কোনো পরিব্রাজক বা পরিব্রাজিকা স্বীয় মত পরিত্যাগ করে নিগ্রন্থ মত গ্রহণ করে তবে নিগ্রন্থ শ্রমণ তার সঙ্গে আহারাদি করবে কি করবে না?

করবে, অবশ্য করবে।

সেই শ্রমণ যদি পুনরায় গৃহস্থ হয়ে যায় তবে তার সঙ্গে শ্রমণেরা আহারাদি করবে কি করবে না?

না, করবে না।

শ্রমণগণ, এই সেই জীব যার সঙ্গে প্রথমে আহারাদি করা যেত কিন্তু এখন যায় না। কারণ প্রথমে সে শ্রমণ ছিল এখন নয়। এই রকমই ত্রসকায় স্থাবরকায়ে উৎপন্ন জীব ত্রস হিংসা প্রত্যাখ্যানকারীর বিষয় নয়।

এভাবে গৌতম অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে ত্রস জীব মরে স্থাবর জীব হয় ও তাদের যদি হিংসা হয় ত শ্রমণোপাসকের ব্রত ভঙ্গ হয় এই মান্যতার নিরসন করলেন।

সমস্ত জীব স্থাবর হয়ে গেলে ত্রস জীব হত্যা প্রত্যাখ্যানকারীর ব্রত নির্বিষয় হয়ে যায়—উদকের এই উক্তির খণ্ডন করতে গিয়ে বললেন, শ্রমণগণ, যে সব শ্রমণোপাসক দেশ বিরতি ধর্ম পালন করে শেষে অনশনে সমাধিমরণ প্রাপ্ত হয় ও যে সব শ্রমণোপাসক প্রথমে বিশেষ ব্রত প্রত্যাখ্যান পালন করতে না পেরে শেষে অনশনে সমাধিমরণ করে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাদের মৃত্যু কিরূপ?

তাদের মৃত্যু প্রশংসনীয়।

যে সব জীব এভাবে মৃত্যু বরণ করে তারা ত্রস প্রাণীরূপে উৎপন্ন হয়। তারাই ত্রস জীবহত্যা প্রত্যাখ্যানকারী শ্রমণোপাসকের ব্রতের বিষয়।

নিগ্রর্ন্থগণ, এমন কখনো হয় না যে সমস্ত ত্রস জীব স্থাবর হয়ে যাবে বা সমস্ত স্থাবর জীব ত্রস হয়ে যাবে। তখন কি একথা বলা উচিত যে এমন কোনো পর্যায় নেই যা শ্রমণোপাসকের ব্রতের বিষয়? আর এই নিয়ে যে মতভেদ উপস্থিত করে তা কি সমর্থন-যোগ্য?

উদক তখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন ও গৌতমের সঙ্গে বর্ধমানের কাছে এলেন। বর্ধমানের প্রবচন শুনে তাঁর কাছে তিনি পঞ্চযাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

এই বছরের চাতুর্মাস্য বর্ধমান নালন্দায় ব্যতীত করলেন।

॥ ২৩ ॥

বর্ষা ঋতু শেষ হলে নানা স্থানে প্রব্রজন করতে করতে বর্ধমান নালন্দা হতে বাণিজ্যগ্রামে এলেন। সেখানে দূতিপলাশ চৈত্যে অবস্থান করলেন।

একদিন ভিক্ষাচর্যা হতে ফিরে আসবার পথে কোল্লাগ সন্নিবেশের নিকট ইন্দ্রভূতি গৌতম শুনতে পেলেন যে বর্ধমানের গৃহস্থ শিষ্য শ্রমণোপাসক আনন্দ আমরণ অনশন নিয়ে দর্ভ শয্যায় শুয়ে রয়েছেন। তখন তিনি ভাবলেন যে আনন্দ হয় ত আর বেশী দিন বাঁচবে না। তাই তার সঙ্গে দেখা করে যাই। গৌতম তখন কোল্লাগে তাঁর পৌষধশালায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

গৌতমকে দেখেই আনন্দ তাঁকে নমস্কার করে বললেন, ভগবন্, আমি অনশনে থাকায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি। আপনি নিকটে এলে আপনাকে নতমস্তক হয়ে বন্দনা করি।

গৌতম তাঁর নিকটে গেলে তিনি গৌতমের বন্দনা করলেন। তারপর তাঁদের মধ্যে নানা কথা হল। এক সময় আনন্দ প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, ঘরে থেকে গৃহস্থধর্ম পালন করতে করতে কি গৃহস্থ শ্রাবকের অবধি জ্ঞান হতে পারে?

গৌতম বললেন, হ্যাঁ, আনন্দ, গৃহী শ্রমণোপাসকের অবধিজ্ঞান হতে পারে।

আনন্দ বললেন, ভগবন্, গৃহস্থধর্ম পালন করতে করতে আমারও অবধি জ্ঞান হয়েছে যাতে পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম লবণ সমুদ্রে পাঁচশ' যোজন, উত্তরে ক্ষুদ্র-হিমবৎ বর্ষধর, উর্ধ্বে সৌধর্ম কল্প ও অধোভাগে লোলচ্চুঅ নরকাবাস পর্যন্ত সমস্ত রূপী পদার্থ জানছি ও দেখছি।

গৌতম বললেন, আনন্দ, শ্রমণোপাসকের অবধি জ্ঞান হয় কিন্তু এত দূরগ্রাহী হয় না, যতটা তুমি বলছ। এই ভ্রান্ত কথনের জন্য তোমার আলোচনা করে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

আনন্দ বললেন, ভগবন্, জৈন প্রবচনে কি সত্য প্ররূপণের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে ?

না, আনন্দ, এমন নয়।

তবে ত ভগবন্, আপনিই প্রায়শ্চিত্ত করুন, কারণ আমার কথার প্রতিবাদ করে আপনি অসত্য প্ররূপণ করেছেন।

আনন্দের এই উক্তিতে গৌতমের মনে শঙ্কার উদ্ভব হল। তিনি দুতিপলাশ চৈত্যে ফিরে এসেই ভিক্ষা চর্যার আলোচনা করে বর্ধমানকে আনন্দের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, ভগবন্, এ ব্যাপারে আলোচনা প্রায়শ্চিত্ত আনন্দের করা উচিত না আমার।

বর্ধমান বললেন, গৌতম, এই বিষয়ে তোমারই আলোচনা প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত এবং আনন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা।

গৌতম তখনি আনন্দের কাছে ফিরে গেলেন ও আলোচনা প্রায়শ্চিত্ত করে আনন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

সে বছরের চাতুর্মাস্য বর্ধমান বৈশালীতে ব্যতীত করলেন।

॥ ২৪ ॥

চাতুর্মাস্য শেষ হলে তিনি কোশলভূমির দিকে প্রস্থান করলেন ও নানা নগর ও গ্রাম অতিক্রম করে সাকেতে এসে উপস্থিত হলেন।

সাকেতের এক বণিক জিনদেব সেই সময় কোটিবর্ষে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন। কোটিবর্ষ দিনাজপুরের নিকটস্থ বাণগড়। সেকালে কোটিবর্ষ অনার্য দেশ বলে পরিগণিত হত। সেখানে কিরাতরাজ রাজত্ব করতেন।

জিনদেব কিরাতরাজকে বাণিজ্যার্থ বস্ত্র, মণি, রত্নাদি উপহার দিলেন যে ধরনের রত্নাদি তাঁর কোষে ছিল না।

কিরাতরাজ সেই রত্নাদি পেয়ে আনন্দিত হলেন ও বললেন, কি সুন্দর এই রত্ন! এ রত্ন কোথায় উৎপন্ন হয়?

জিনদেব বললেন, এর চাইতেও ভালো মহার্ঘ রত্ন আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়।

কিরাতরাজ বললেন, ইচ্ছে ত করে তোমার দেশে যাই কিন্তু সাকেতরাজের কি অনুমতি পাওয়া যাবে?

কেন নয়? আমি সেই অনুমতিপত্র আনিয়ে নেব।

জিনদেব সাকেতরাজকে পত্র দিয়ে কিরাতরাজের সাকেতে যাবার অনুমতিপত্র আনিয়ে নিলেন। তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সাকেতে এসে উপস্থিত হলেন।

বর্ধমান তখন সাকেতে অবস্থান করছিলেন। দলে দলে সাকেতের অধিবাসীরা বর্ধমানের ধর্মসভায় যায়। তাই দেখে একদিন কিরাতরাজ জিনদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, ভদ্র, এরা সব কোথায় চলেছে?

জিনদেব তার প্রত্যুত্তর দিলেন, রাজন্, এখানে আজ এক রত্ন ব্যবসায়ী এসেছেন যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্নের অধিকারী।

কিরাতরাজ সেকথা শুনে বললেন, মিত্র, তা হলে ত খুব ভালোই হল! চল আমরা গিয়ে সেই শ্রেষ্ঠ রত্ন দেখে আসি।

কিরাতরাজ জিনদেবের সঙ্গে বর্ধমানের ধর্মসভায় এলেন।

বর্ধমান সেদিন রত্ন সম্বন্ধেই প্রবচন দিচ্ছিলেন। বলছিলেন—সংসারে রত্ন দুই রকমের: এক দ্রব্যরত্ন, অন্য ভাবরত্ন। হীরে, মণি, মাণিক্য যাদের বলি তারা দ্রব্যরত্ন। ভাবরত্ন তিনটি: সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র। তত্ত্বে শ্রদ্ধা, তত্ত্বের জ্ঞান ও তদনুযায়ী

জীবন যাপন। দ্রব্য রত্ন যতই মহার্ঘ হোক না কেন তার প্রভাব সীমিত। পরলোকে মানুষ তা সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারে না। কিন্তু ভাবরত্নের প্রভাব অসীম, শুধু ইহজীবনেই নয়, পরজন্মেও তা ফলদায়ী হয়।

ভাবরত্নের কথা কিরাতরাজের মনে ধরল। তিনি বর্ধমানের সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললেন, ভগবন্, আমায় ভাবরত্ন দিন।

বর্ধমান বললেন, তোমার যেমন অভিরুচি।

কিরাতরাজ তাঁর ধন, রত্ন, রাজ্য ও ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে বর্ধমানের শ্রমণ সঙ্ঘে প্রবেশ করলেন।

বর্ধমান সাকেত হতে পাঞ্চালের দিকে গমন করলেন। কাম্পিল্যে কিছুকাল অবস্থান করে সুরসেনের দিকে গেলেন ও মথুরা, শৌর্যপুর, নন্দীপুর আদি নগরে ভ্রমণ করে পুনরায় বিদেহ ভূমিতে ফিরে এলেন ও সেই বর্ষাবাস মিথিলায় ব্যতীত করলেন।

॥ ২৫ ॥

চাতুর্মাস্য শেষ হলে বর্ধমান আবার মগধে ফিরে এলেন ও গ্রামানুগ্রাম বিচরণ করতে করতে রাজগৃহের গুণশীল চৈত্যে এসে অবস্থান করলেন।

গুণশীল চৈত্যে অন্যতীর্থিক শ্রমণেরাও থাকেন। তাঁরা একদিন বর্ধমানের অনুযায়ী শ্রমণদের এসে বললেন, আর্যগণ, তোমরা তিন তিন ভাবে অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

সেকথা শুনে বর্ধমান শিষ্যরা বললেন, আর্যগণ, কি কারণে আমরা অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত?

অন্যতীর্থিকেরা বললেন, তোমাদের যা দেওয়া হয়নি তাই গ্রহণ কর, খাও, আস্বাদন কর। এইজন্য তোমরা অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

আর্যগণ, আমরা কিভাবে যা দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ করি, খাই, আস্বাদন করি।

আর্যগণ, আমাদের মতে দীয়মান অদত্ত, প্রতিগৃহ্যমান অপ্রতি-গৃহীত, নিসৃজ্যমান অনিসৃষ্ট। এইজন্য দাতার হাত হতে স্খলিত হয়ে যতক্ষণ না তা তোমার পাত্রে এসে পড়ে তার আগে তাকে যদি কেউ সরিয়ে নেয়, তবে তা তোমাদের যায় না, দাতার যায়। এর তাৎপর্য হল যে পদার্থ তোমাদের পাত্রে এসে পড়ে তা অদত্ত। কারণ যে পদার্থ দানকালে তোমাদের নয়, পরেও তা তোমাদের হতে পারে না। এরূপে তোমরা যা তোমাদের দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ করছ, খাচ্ছ ও আস্বাদন করছ। এখানে তোমরা অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

আর্যগণ, আমরা যা দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ করি না, খাই না বা আস্বাদন করি না। যা দেওয়া হয়েছে তাই গ্রহণ করি, খাই ও আস্বাদন করি। এভাবে ত্রিবিধ ত্রিবিধপ্রকারে আমরা সংযত, বিরত ও পণ্ডিত।

আর্যগণ, কি ভাবে তোমরা যা তোমাদের দেওয়া হয় তাই গ্রহণ কর, খাও, আস্বাদন কর আমাদের বোঝাও।

আর্যগণ, আমাদের মতে দীয়মান দত্ত, প্রতিগৃহ্যমান প্রতিগৃহীত ও নিসৃজ্যমান নিসৃষ্ট। গৃহপতির হাত হতে স্খলিত হবার পর যদি তা মাঝখান হতে কেউ উড়িয়ে নেয় তবে তা আমাদেরই যায়, গৃহ-পতির নয়। এজন্য কোন হেতু যুক্তিতে আমরা অদত্তগ্রাহী সিদ্ধ হই না। বরং আর্যগণ, তোমরাই ত্রিবিধ ত্রিবিধ ভাবে অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

কেন? আমরা কিভাবে অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত?

এইজন্য কি তোমরা অদত্ত দান গ্রহণ কর।

আমরা কিভাবে অদত্ত দান গ্রহণ করি?

আর্যগণ, তোমরা এভাবে অদত্ত দান গ্রহণ কর। তোমাদের মতে দীয়মান অদত্ত, প্রতিগৃহ্যমান অপ্রতিগৃহীত ও নিসৃজ্যমান অনিসৃষ্ট। এভাবে তোমরা ত্রিবিধ ত্রিবিধ ভাবে অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

না, আর্যগণ, তোমরাই ত্রিবিধ ত্রিবিধ ভাবে অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

কেন ? কিভাবে আমরা অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত ?

আর্যগণ, তোমরা হাঁটবার সময় পৃথিবীকায় জীবের ওপর আক্রমণ কর, প্রহার কর. পা দিয়ে ডল, ঘস, তাদের পীড়িত কর, তাদের হত্যা কর। এভাবে পৃথিবীকায় জীবের ওপর আক্রমণকারী তোমরা অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

আর্যগণ, আমরা চলবার সময় পৃথিবীকায় জীবের ওপর আক্রমণ করি না। শরীর রক্ষার জন্য, অসুস্থ সেবার জন্য অথবা বিহার চর্যার জন্য যখন আমরা মাটির ওপর চলি তখন বিবেকপূর্ণভাবে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করি। তাই আমরা পৃথিবীকে আক্রমণ করি না, পৃথিবীকায় জীব বিনাশ করি না। কিন্তু আর্যগণ, তোমরা নিজেরাই পৃথিবীকায় জীব আক্রমণ কর, নিহত কর ও অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত হও।

আর্যগণ, তোমাদের মত অগম্যমান অগত, ব্যতিক্রম্যমান অব্যতিক্রান্ত, সংপ্রাপ্তমান অসংপ্রাপ্ত ?

আর্যগণ, না, আমাদের মত এরূপ নয়। আমাদের মতে গম্যমান গত, ব্যতিক্রম্যমান ব্যতিক্রান্ত ও সংপ্রাপ্যমান সংপ্রাপ্ত।

অন্যতীর্থিকেরা এভাবে নিরুত্তর হয়ে ফিরে গেল।

গুণশীল চৈত্যে অন্তেবাসী কালোদায়ি একদিন বর্ধমানকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, দুষ্টফলদায়ক অশুভ কর্ম জীব নিজে করে সে কথা কি সত্য ?

বর্ধমান বললেন, হ্যাঁ কালোদায়ি, জীব দুষ্ট ফলদায়ক কর্ম নিজে করে সেকথা সত্য।

ভগবন্, জীব এরকম অশুভ ফলদায়ক কর্ম কিভাবে করে ?

কালোদায়ি, সরস বহুব্যঞ্জনযুক্ত বিষ মিশ্রিত অন্ন যখন কেউ ভোজন করে তখন তা তার ভালো লাগে। তার তৎকালিক স্বাদে লুব্ধ হয়ে সে তা খায় কিন্তু তার পরিণাম অনিষ্টকর। কালোদায়ি, সেইরকম কেউ যখন হিংসা করে, চুরি করে, কাম ক্রোধ লোভ ও মোহের বশবর্তী হয় তখন তা তার ভালো লাগে। কিন্তু তাতে যে পাপকর্মের বন্ধন হয় তা অনিষ্টকর। এবং সেই ফল তাকেই ভোগ করতে হয়।

কালোদায়ি আরও অনেক প্রশ্ন করলেন। বর্ধমান তার যথাযথ উত্তর দিলেন।

বর্ধমান সেই বর্ষাবাস রাজগৃহে ব্যতীত করলেন।

॥ ২৬ ॥

বর্ষা অতিক্রান্ত হলে তিনি মগধভূমিতেই বিচরণ করে নির্গ্রন্থ ধর্ম প্রচার করলেন। আবার বর্ষার আগে রাজগৃহে ফিরে এলেন।

রাজগৃহে তখন বহু অন্য তীর্থকেরা বাস করে। তত্ত্ব নিয়ে তারা আলোচনা করে, নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে। গৌতম সে সমস্ত আলোচনা শোনেন, অনুধাবন করেন। মনে প্রশ্ন জাগলে বর্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। তার নিরাকরণ করে নেন।

পরমাণু সম্পর্কে আলোচনা শুনে গৌতমের মনে প্রশ্ন জেগেছে। তার নিরাকরণের জন্য তিনি বর্ধমানের কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বন্দনা করে বললেন, ভগবন্, অন্য তীর্থিকেরা বলে দুই পরমাণু একত্র হয় না কারণ তাতে স্নিগ্ধতা নেই। তিন পরমাণু একত্র হয় কারণ তিন পরমাণুতে স্নিগ্ধতা আছে। এই একত্রিত তিন পরমাণুকে বিশ্লেষণ করলে তিন ভাগ হতে পারে, দুভাগ হতে পারে। দুভাগ হলে দেড় দেড় পরমাণুর এক এক ভাগ হবে। এভাবে চার পাঁচ পরমাণু একত্র মিলিত হতে পারে। ভগবন্, তাদের একথা কি সত্য ?

বর্ধমান বললেন, গৌতম, পরমাণু সম্পর্কে অন্যতীর্থিকদের এই মান্যতা আমার ঠিক মনে হয় না। এই বিষয়ে আমার মত এই যে দুই পরমাণুও একত্র হতে পারে কারণ তাদের মধ্যেও পরস্পরকে যুক্ত করার স্নিগ্ধতা আছে। মিলিত দুই পরমাণুকে ভাঙলে আবার তা এক এক পরমাণু হবে। এভাবে তিন পরমাণুও মিলিত হতে পারে। তবে মিলিত তিন পরমাণুকে দুভাগে ভাঙলে অন্যতীর্থিকেরা যেমন বলেন দেড় দেড় পরমাণুর দুই ভাগ হবে, তা হয় না। দুই ভাগের এক ভাগে এক পরমাণু থাকবে, অন্যভাগে দুই পরমাণু।

এভাবে গৌতম বর্ধমানকে অনেক প্রশ্ন করলেন। বর্ধমান তার প্রত্যেকটির নিরসন করলেন।

॥ ২৭ ॥

পরের বছরের বর্ষাবাস নালন্দায় ব্যতীত হল।

॥ ২৮ ॥

নালন্দা হতে বর্ধমান মিথিলার দিকে গমন করলেন। সেই বছরের বর্ষাবাস মিথিলায় ব্যতীত হল।

॥ ২৯ ॥

মিথিলা হতে তিনি রাজগৃহে আবার ফিরে এলেন।

রাজগৃহে তখন বর্ধমানের গৃহস্থ শিষ্য মহাশতক অনশন নিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। আনন্দের মত তাঁরও অবধিজ্ঞান হয়েছে। তিনিও বহুদূর অবধি দেখতে ও জানতে পান।

মহাশতক যখন একদিন রাত্রে ধর্মধ্যানে রাত্রি জাগরণ করছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী রেবতী মদিরা পান করে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও তাঁর সঙ্গ প্রার্থনা করলেন। মহাশতক প্রথমে নিরুত্তর রইলেন কিন্তু যখন রেবতী নানাভাবে তাঁকে প্রলুব্ধ করা হতে বিরত হলেন না তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, রেবতী, এত উন্মত্ত হয়ো না। আমি দেখতে পাচ্ছি সাত দিনের মধ্যে দুরারোগ্য রোগে তোমার মৃত্যু হবে ও তুমি নরকে যাবে।

রেবতী সে কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন ও প্রতিনিবৃত্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। ভাবলেন মহাশতক তাঁকে না জানি কিভাবে এখন হত্যা করবেন।

মহাশতকের কথামত রেবতী সাত দিনের মধ্যেই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

বর্ধমান মহাশতকের ক্রোধের কথা, রেবতীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগের কথা জানতে পেরেছেন। তিনি তাই গৌতমকে ডেকে বললেন, গৌতম, আমার অন্তেবাসী মহাশতক যেখানে অবস্থান করছে সেখানে যাও ও গিয়ে তাকে বল যে রেবতী তাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করলেও তার ক্রুদ্ধ হওয়া, রেবতীকে কটুবাক্য বলা উচিত হয়নি। সমভাবে অবস্থানকারী শ্রমণোপাসককে এসব উপেক্ষা করতে হয়। যথার্থ সত্য হলেও অপ্রিয় কঠোর শব্দ বলতে হয় না। দেবানুপ্রিয় রেবতীকে কটুবাক্য বলে তুমি ভাল করনি। তুমি তার আলোচনা করো, শুদ্ধ হও।

গৌতম মহাশতককে গিয়ে সেকথা বললেন। মহাশতক নিজের ভুল বুঝতে পারলেন ও আলোচনা করে পরিশুদ্ধ হলেন।

সেই বছরের বর্ষাবাস বর্ধমান রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন।

॥ ৩০ ॥

বর্ষাবাস অতীত হলেও বর্ধমান সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন।

সেই সময় একদিন গৌতম বর্ধমানের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবন্, এই অবসর্পিণীর ষষ্ঠ দুষম-দুষম কালে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ হবে জানতে ইচ্ছে করি।

বর্ধমান বললেন, গৌতম, সেই সময় চারদিক হাহাকার, আর্তনাদ ও কোলাহলময় হবে। বিষম অবস্থার জন্য কঠোর, ভয়ঙ্কর ও অসহ্য বাতাসের ঘূর্ণি ও আঁধি প্রবাহিত হবে, দিক সকল ধূমিল, ধুলোময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। কালের রুক্ষতার জন্য ঋতু বিকৃত হবে, চাঁদ অধিক শীতল হবে, সূর্য অধিক উষ্ণ।

সেই সময় জোরে জোরে বিদ্যুৎ চমকিত হবে, প্রবল বাতাসের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির জল অরস, বিরস, টক, তিতো,

বিষাক্ত ও ঝাঁঝালো হবার জন্য জীবজগৎ পোষণ না করে নানারূপ ব্যাধি ও বেদনার উদ্ভব করবে। সেই জলে মানুষ পশুপক্ষী গাছপালা বিনষ্ট হবে, বৈতাঢ্য পর্বত ব্যতীত অন্য পর্বত অহরহ বজ্রপাতে ছিন্নভিন্ন হবে, গঙ্গা ও সিন্ধুর অতিরিক্ত অন্য নদী, সরোবর, তড়াগাদি পরিশুষ্ক, শূন্য, সমতল হবে।

ভগবন্, সেই সময় ভারতবর্ষের মাটির অবস্থা কিরূপ হবে ?

গৌতম, সেই সময় মাটি অঙ্গার তুল্য হবে। আগুনের মত গরম, মরুভূমির মত বালুকাময়, শৈবালাচ্ছন্ন ঝিলের মত কঙ্করময়।

ভগবন্, সেই সময়ে মানুষের অবস্থা কিরূপ হবে ?

গৌতম, সেই সময় মানুষের অবস্থা অত্যন্ত দয়নীয় হবে। বিরূপ, বিবর্ণ, দুঃস্পর্শ, বিরস শরীর মানুষ নির্লজ্জ, কপট, ক্লেশপ্রিয়, হিংসক ও বৈরশীল হবে। তার নখ বড় হবে, চুল পিঙ্গল, বর্ণ শ্যাম, মাথা বিকৃত ও শরীর শিরাময়।

সে নির্বল হবে, বামনাকার হবে, ব্যাধিপীড়িত হবে, চর্মরোগগ্রস্ত হবে ও তার সমস্ত চেষ্টা নিন্দনীয় হবে।

সে উৎসাহহীন হবে, সত্বহীন হবে, তেজোহীন হবে। ষোল বছর হতে না হতে বার্ধক্য প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু লাভ করবে।

মানুষের সংখ্যা পরিমিত হবে। গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর নিকটস্থ বৈতাঢ্য পর্বতের কন্দরে তারা বাস করবে।

ভগবন্, সেই সময় মানুষ কি আহার করবে ?

গৌতম, সেই সময় গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর প্রবাহ রথমার্গের মত সঙ্কীর্ণ হবে। গভীরতা চক্রনাভির মত। সেই জল মৎস্য ও কচ্ছপাদিতে পূর্ণ থাকবে। মানুষ সকাল ও সন্ধ্যায় কন্দর হতে নির্গত হয়ে সেই কচ্ছপাদি ধরে ডাঙায় নিয়ে যাবে ও রোদে পুড়িয়ে তাদের মাংস আহার করবে।

বর্ধমান সেখান হতে বিহার করে অপাপা পুরীতে এলেন। সেই তাঁর জীবনের অন্তিম বর্ষাবাস।

এই সেই পাবা যে পাবায় তাঁর তীর্থংকর জীবনের প্রারম্ভ। পাবায় মহাসেন উদ্যানেই না তিনি তাঁর গণধরদের প্রথম দীক্ষিত করেছিলেন। এই পাবা হতে তিনি যে ধর্মতীর্থের প্রবর্তন করেছিলেন তা আজ সমতট হতে সিন্ধু সৌবীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

পাবার মহাসেন উদ্যানেই তাই আবার তাঁর অন্তিম বছরের সমবসরণ হল। এই সমবসরণে আরও অনেকের সঙ্গে পাবার রাজা পুণ্যপালও উপস্থিত ছিলেন।

পুণ্যপাল সেদিন রাত্রে স্বপ্নে হস্তী, মর্কট, ক্ষীরবৃক্ষ, কাকপক্ষী, সিংহ, কমল, বীজ ও কলস দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন দেখা অবধি অমঙ্গল আশঙ্কায় পুণ্যপালের মন অস্থির ছিল। তাই বর্ধমানের প্রবচন শেষ হতেই তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা বর্ধমানের কাছে নিবেদন করলেন। বললেন, ভগবন্, আমি এই স্বপ্ন দর্শনের ফল জানতে ইচ্ছা করি।

বর্ধমান সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে বললেন, পুণ্যপাল, তোমার স্বপ্ন ত স্বপ্ন নয়, আগামিক যুগের ছায়া। সামনে যে বিষম সময় আসছে তারই পূর্বাভাস। তুমি যে হস্তী দেখেছ তার তাৎপর্য এই যে আগামিক যুগের আমার গৃহী শিষ্য বা শ্রাবকেরা পার্থিব ঐশ্বর্যে লুব্ধ হয়ে হস্তীর মত গৃহেই অবস্থান করবে, শ্রামণ্য অঙ্গীকার করবে না, যদিও বা করে তবে অসৎ-সংসর্গে তা পরিত্যাগ করবে।

মর্কটেরা যেমন চপলমতি হয় তেমনি আমার শ্রমণ সঙ্ঘের গণ, গচ্ছ বা শাখাধিপতিরা চপলমতি, অল্পজ্ঞানী ও ব্রতপালনে প্রমাদী হবে। ধর্মে শিথিলাচার হয়ে তারা অন্যকে ধর্মের উপদেশ দেবে ও ধর্মের কদর্থ করবে।

গৃহী শিষ্য বা শ্রাবকেরা দান ও শাসন সেবায় জন্য ক্ষীরবৃক্ষ স্বরূপ হবে। এরূপ ধনী গৃহী শিষ্যদের অহঙ্কারী বেশমাত্রধারী আচার্যেরা কণ্টকবৃক্ষের মত চারিদিক হতে ঘিরে রইবে ও পরস্পর পরস্পরকে অভিবর্ধিত করবে কিন্তু জিন শাসনের প্রসার করবে না।

কাকপক্ষী যেমন স্বচ্ছ জল বাপী হতে জল পান করে না তেমনি উদ্ধত স্বভাব শ্রমণেরা স্বীয় আচার্যদের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ

করবে না। তারা ভিন্ন-তীর্থিক আচার্যদের বহুমান করবে ও তাদের নিকট গমনাগমন করবে।

সিংহকে যেমন অন্য প্রাণী পরাভূত করতে পারে না, কিন্তু স্বীয় শরীরে উৎপন্ন কীটাদিই তাকে কষ্ট দিতে সমর্থ সেইরূপ জিনপ্রবর্তিত ধর্ম অন্যের দ্বারা বিনষ্ট হবে না কিন্তু স্বীয় অনুযায়ীদের কলহে দুর্বল ও অবনতিপ্রাপ্ত হবে।

কমল যেমন পঙ্কে উৎপন্ন হয়, সেইরকম সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি ম্লেচ্ছ দেশ বা হীনকূলে উৎপন্ন হতে দেখা যাবে।

ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করলে তা যেমন ফলদায়ী হয় না তেমনি উপদেশ অপাত্রে দেবার জন্য ফলদায়ী হবে না।

শ্রমণ সঙ্ঘে ক্ষমাদি গুণ রূপ কমলে চিত্রিত ও সুচারিত্ররূপ জলপূর্ণ কলসের মত মহর্ষি আর দেখা যাবে না। শূন্যকুম্ভ চারিত্র-হীন আচার্যেরা মহর্ষিরূপে পূজিত হবে।

ভগবন্, জিন শাসনের এই অধোগতি রোধের কি কোনো উপায় নেই ?

আছে বৈকি। পুণ্যপাল, আমি তার প্রতিই ইঙ্গিত করেছি। শ্রাবকেরা যদি ধর্মে তৎপর হয় ও শ্রমণেরা চারিত্রবান, গণ গচ্ছ ও শাখাধিপতিরা যদি নিজেদের অভিবর্ধিত না করে জিন শাসনকে অভিবর্ধিত করে ও কলহ হতে বিরত হয় তবেই তা সম্ভব। কিন্তু পুণ্যপাল, তা হওয়া দুষ্কর।

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পুণ্যপাল বর্ধমানের কাছে প্রব্রজিত হলেন।

গৌতম তখন আগামী পঞ্চম ও ষষ্ঠকাল সম্পর্কে বর্ধমানকে বহুবিধ প্রশ্ন করলেন। বর্ধমান তার প্রত্যুত্তর দিয়ে বললেন, গৌতম আমার নির্বাণের তিন বছর সাড়ে আট মাস পরে পঞ্চম কাল শুরু হবে। সেইকালে ভরত ক্ষেত্রে কোনো তীর্থংকর বা কেবলী জন্মগ্রহণ করবে না। আমার অন্তেবাসী সুধর্মের জম্বু নামে এক শিষ্য হবে—এই অবসর্পিণীর সেই অন্তিম কেবলী। এই বলে বর্ধমান সমবসরণ হতে

উঠে রাজা হস্তীপালের যে প্রাচীন ভগ্ন শুল্কশালা ছিল সেই শুল্কশালায় গমন করলেন। বর্ষার চারমাস তিনি সেইখানেই ব্যতীত করবেন।

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাস ব্যতীত হল। কার্তিক মাসের কৃষ্ণ-পক্ষও ব্যতীত হতে চলল। আজ তার শেষ দিন। তাঁর জীবনেরও। আজ তিনি মুক্ত হবেন।

সহসা তাঁর গৌতমের কথা মনে হল। তাঁর প্রিয় শিষ্য গৌতম— যে আজও কেবল-জ্ঞান লাভ করতে পারে নি। কেন পারে নি?— পারে নি সে তাঁর প্রতি তার অনুরাগের জন্য। তাঁর অন্য প্রধান শিষ্যরা যখন কেবল-জ্ঞান লাভ করেছে, গৌতম ও সুধর্ম ছাড়া যখন সকলেই মুক্ত হয়ে গেছে, তখন—না এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে তাঁর প্রতি গৌতমের অনুরাগ বিনষ্ট হয়ে যায়। বর্ধমান তখন গৌতমকে ডেকে পাঠালেন। গৌতম নিকটে এসে দাঁড়াতেই বললেন, গৌতম, পাবার পার্শ্ববর্তী গ্রামে দেবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করে। সে তোমার দ্বারাই কেবল প্রতিবুদ্ধ হবে, অন্যের দ্বারা নয়। তুমি যাও, গিয়ে তাকে প্রতিবোধ দিয়ে এস।

গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে গৌতম পার্শ্ববর্তী গ্রামে চলে গেলেন।

গৌতম চলে যেতে তিনি তাঁর অন্য শ্রমণ ও গৃহী শিষ্যদের ডাক দিলেন। বললেন, আজ আমি তোমাদের অন্তিম উপদেশ দেব। তারপর তাঁর অন্তিম প্রবচন আরম্ভ হল—অখণ্ড, ধারাপ্রবাহী।

তারপর মধ্যদিন কখন সন্ধ্যায়, সন্ধ্যা কখন মধ্যরাত্রে পরিবর্তিত হল কেউ জানল না। একে একে রাত্রির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ যাম উত্তীর্ণ হতে চলল। কিন্তু বর্ধমান অক্লান্ত, শ্রোতারা চিত্রার্পিত, স্থির। কি এক ভাবাবেশ তাদের যেন পেয়ে বসেছে। সময়ের বোধ তারা হারিয়ে ফেলেছে।

সৌধর্ম দেবলোকে সহসা ইন্দ্রের আসন কম্পিত হল। তিনি তখন চোখ মেলে জম্বু দ্বীপের ভারতবর্ষের মগধান্তর্গত পাবার দিকে চেয়ে দেখলেন। দেখলেন তীর্থংকরের নির্বাণ সময় সমুপস্থিত।

চোখের পলক ফেলতে যতটুকু সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে

সনিকায় ইন্দ্র তখন মর্ত্যলোকে নেমে এলেন। বর্ধমানের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেন ও তাঁকে সাশ্রুনেত্রে বন্দনা করে বললেন, ভগবন্, আপনার নির্বাণ সময় সমাগত জেনে আপনাকে বন্দনা করতে এসেছি ও সেই সঙ্গে একটি নিবেদন জানাতে। আসবার সময় আপনার জন্মনক্ষত্র উত্তরা ফাল্গুনীতে ভস্মক গ্রহ সঞ্চারিত হতে দেখলাম। আপনার দেহাবসানের পর সেই গ্রহ যদি উত্তরা ফাল্গুনীতে সঞ্চারিত হয় তবে তা জিন শাসনের পক্ষে কল্যাণকর হবে না। তাই ততক্ষণ দেহরক্ষা হতে বিরত থাকুন যতক্ষণ না তা স্বাতী নক্ষত্র অতিক্রম করে উত্তরা ফাল্গুনীতে প্রবেশ করে।

বর্ধমানের প্রবচন ততক্ষণে শেষ হয়েছে। উষার আলোয় স্বর্ণিম রেখা পূব আকাশকে তখন অভিষিঞ্চিত করছে।

বর্ধমান বললেন, দেবরাজ, তুমি ত একথা ভালো ভাবেই জান আয়ু বর্ধিত করবার ক্ষমতা তীর্থংকরের নেই। তবু তোমার যে এই আগ্রহ সে জিন শাসনে তোমার অনুরাগের জন্য। কিন্তু বীতরাগীর সেরূপ কোনো আগ্রহ থাকে না। তাছাড়া কালচক্রের পরিবর্তনে জিন শাসনের এমনিতেই অবনতি হবে। ভস্মক গ্রহ যদি তার নিমিত্ত কারণ হয় ত তীর্থংকর তার পরিবর্তন করবেন না।

ভগবন্, তবে তাই হোক।

বর্ধমান তখন তাঁর সমস্ত চেতনা গুটিয়ে নিলেন, কেন্দ্রিত করলেন। তারপর ধ্যানের গভীরতায় ডুবে যেতে লাগলেন। শেষে শৈলেশী-করণে আযতি কর্মক্ষয় করে লোকের ঊর্ধ্বভাগস্থিত সিদ্ধলোকে গমন করলেন।

কল্পসূত্র সেই মহা নির্বাণের কথা লিখতে গিয়ে লিখলেন—সেই চাতুর্মাস্যের চতুর্থ মাসে সপ্তম পক্ষে কার্তিক কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশী তিথিতে যে রাত্রি তাঁর চরমরাত্রি সেই রাত্রিতে শ্রমণ ভগবান বর্ধমান কালগত হলেন, সংসার হতে ব্যতিক্রান্ত হলেন, অপুনরাবর্তরূপে ঊর্ধ্বে গমন করলেন, জন্ম, জরা, মরণ বন্ধন ছিন্ন করে সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অন্তকৃৎ, পরিনিবৃত, সর্বদুঃখহীন হলেন।

সমগ্র পাবা এক গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত হল।

গৌতম পার্শ্ববর্তী গ্রাম হতে ফেরার পথে সেই খবর পেলেন—ভগবান কালগত হয়েছেন। শুনে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, বিশ্বাস হয় না যে আমি দীর্ঘ তিরিশ বছর তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছি, তিনি তাঁর নির্বাণ সময়ে আমায় দূরে সরিয়ে দেবেন! আমার কী দুর্ভাগ্য যে সেই সময় আমি তাঁর কাছে থাকতে পারলাম না। আমার হৃদয় বজ্র দিয়ে তৈরি তাই তা এখনো বিদীর্ণ হচ্ছে না। তারাই ভাগ্যবান যারা সেই সময় তাঁর কাছে ছিল। জানি না তিনি কেন আমায় পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু না ··

সহসা তাঁর বর্ধমানের সেই কথা মনে পড়ল, গৌতম, তোমার আমার সম্পর্কে ত আজকের নয়, জন্ম জন্মান্তরের। এক সঙ্গে ছিলাম, এক সঙ্গে আছি, সিদ্ধশীলায় একসঙ্গে অনন্তকাল থাকব।

তবে? তবে তিনি কেন শেষ সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করলেন···না না না, তাঁতে পরিত্যাগের প্রশ্ন কোথায়? তিনি বীতরাগ। বীতরাগ তাই এত সহজে তিনি আমায় দূরে সরিয়ে দিতে পারলেন·· তাই ত! সেই বীতরাগে আমার অনুরাগ? না না, আমায় তাই হতে হবে। আমায় বীতরাগ হতে হবে।··

তাই হবে ভগবন্, তাই হবে। আমি এই মুহূর্তে তোমার প্রতি আমার সমস্ত অনুরাগ পরিত্যাগ করলাম···

একি—একি আলোর বন্যা! একি চেতনার পরিপ্লাবন! এ আমি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি···আকাশ বাতাস আজ সব নির্বন্ধ হয়ে গেছে, অজস্র আলোর পরমাণু আমাকে ব্যাপাদিত করে চলেছে।

গৌতম, তুমি আমি একসঙ্গে ছিলাম, 'একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গে থাকব।

সেই অনন্ত জীবন।

সেই অনন্ত জীবনের স্মরণে, শ্রদ্ধায় সেই হতে প্রজ্জ্বলিত হয় কার্তিকী অমাবস্যায় দীপাবলীর দীপমালা।

অন্ধকার হতে আমায় প্রকাশের দিকে নিয়ে চল।